লৌকিক ঐতিহ্য : লোকায়ত মানস
ও
আধুনিক বাংলাকাব্য

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইম্প্রেসন হাউস
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
পি. আর. এস.
দি সরস্বতী প্রিন্টিং. ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন

আমার জীবনে যাঁদের অবদান সীমাহীন।

নিবেদন

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূমিতে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বহুবিধ প্রভাব। এই প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে অনেকে বলেছেন—একদিকে সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য অন্যদিকে নবাগত পাশ্চাত্য সাহিত্যের হাত ধরেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই তাঁরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর অন্য সাহিত্যের প্রভাবকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব। ইতিপূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে বহু গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এখনও রচিত হচ্ছে। কিন্তু এই দুই প্রভাবের আড়ালে আর একটি সক্রিয় প্রভাব যে বাংলা সাহিত্যকে চিরকাল প্রেরণা দিয়ে এসেছে সেটি লক্ষ্য করা হয়নি, তা হচ্ছে মৌখিক ঐতিহ্য বা লৌকিক প্রভাব।

পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্যের দুটি ধারা, একটি লিখিত এবং অপরটি অলিখিত। সংস্কৃতিরও দুটি রূপ, একটি শাস্ত্রীয় রূপ অপরটি লৌকিক রূপ। সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই দুটি রূপ যে ভিন্ন নয়, পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত, সে বিষয়ে এতদিন লক্ষ্য করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোক সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে। এইরূপ নিম্ন সাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে একটি বরাবর ভিতরকার যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে থাকে তাহার ফুল ও ডাল পালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড় গুলোর তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।"

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যটিকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করে বর্তমান আলোচনায় দেখাতে চেয়েছি যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'প্রোডাক্ট' নয়, বা সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের অনুকরণেই এই সাহিত্য গড়ে ওঠে নি, এর পিছনে আছে একটি লৌকিক ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা। লোক সাহিত্য ও লৌকিক সংস্কৃতির বহু উপাদানে (বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক গত) সমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে একান্তভাবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাদেশের সাহিত্য তা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করেছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের সুবিস্তৃত পটভূমিকায় একদিকে যেমন পাশ্চাত্য নানা কবিদের বিচিত্র প্রভাব বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে, ঠিক তেমনি লোকায়ত সংস্কৃতির ভিত্তিমূল থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে বাংলাকাব্য তার প্রতিদিনের ফসলকে সজীব ও সতেজ করে রেখেছে। আসলে ব্যাপারটা হলো প্রতি দেশের প্রতিটি কবি-সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব দেশীয় লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা থেকে কোনদিন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না, আর বিচ্ছিন্ন থাকলে তাঁদের কাব্যে শ্রী ও সমৃদ্ধি পূর্ণতর রূপে সজীব ফসলে রূপান্তরিত

হতে পারে না। তাই অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ঈশ্বরগুপ্ত থেকে সুরু করে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলালের মধ্য দিয়ে যে আধুনিক কাব্য চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে পাশ্চাত্য আঙ্গিক ও প্রকরণের অতিরিক্ত সচেতনতার মধ্য দিয়েও লোকায়ত সংস্কৃতির অনুষঙ্গগুলি বারবার নবতররূপে প্রকাশিত হয়েছে। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই লোকায়ত সংস্কৃতির সর্বাধিক ও সার্থক প্রকাশ ঘটেছে -- উপনিষদ ও বাউল সাধনাকে একসূত্রে গাঁথতে পেরেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তী অতি-আধুনিক তথা সমসাময়িক বাংলা কাব্যধারায় এই লৌকিক ঐতিহ্যে এবং লোকায়ত মানসিকতায় এত উজ্জ্বল এবং সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে তা এককথায় যেমন বিস্ময়কর তেমন অতি স্বাভাবিক। কবি জীবনানন্দ থেকে সুরু করে অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্তর মধ্য দিয়ে সুকান্ত, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনীন্দ্র রায়, রাম বসু এবং আরও সমসাময়িক শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গাঙ্গুলী পর্যন্ত কাব্য দেহের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে লোক সংস্কৃতির ও লোকায়ত ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ। অতি আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় যারা কেবল পাশ্চাত্য প্রভাবের শুধু অনুসন্ধান করেন, তাদের এই গ্রন্থটি এইটি সত্যের সম্মুখীন করিয়ে দেবে যে, কোন কবিই তাঁর দেশজ লোকায়ত সংস্কৃতির যোগসূত্রকে অস্বীকার করতে পারেন নি। আসলে সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থটিকে এককথায় বলা চলে 'ইন সার্চ অব রুটস্' অর্থাৎ মূলের অনুসন্ধান—আমাদের উৎস কোথায় তারই অনুসন্ধান। বাংলা উপন্যাসের লৌকিক উপাদানের অনুসন্ধানে যে যাত্রার সুরু হয়েছিল, বাংলা নাটকে লোক সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে যার ব্যাপ্তি ঘটেছিল আধুনিক কাব্যে লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান সেই 'ইন সার্চ অব রুটস'-এর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। এতদিন তো প্রভুর চোখ দিয়ে গোলামের দেখা হয়েছে—এখন সুরু হোক্ নিজের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখা—নিজের স্বরূপ নিজেকে দিয়েই অনুসন্ধান। আসলে তখনই হবে প্রকৃত আত্ম অনুসন্ধান রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গাছের শিকড় মাটির কত গভীরে আছে তাকে আবিষ্কার করা। শ্রীশ্রীঠাকুরের অমেয় কৃপায় এটি সম্ভবপর হয়েছে তাই তাঁকে আমার শত কোটি প্রণাম জানাই।

আমার এই সামান্য প্রয়াসে যে অসামান্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন এবং আশীর্বাদে আমাকে ধন্য করেছেন আচার্যদেব শ্রীশ্রীবড়দা ও পূজ্যপাদ দাদা শ্রীঅশোক চক্রবর্তী—তাঁদের জানাই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এই গ্রন্থটি প্রকাশের সুযোগ পেত না, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়, ডঃ দীপঙ্কর রায়, শ্রীদেবাশিস মিত্র, শ্রীস্বাধীন ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট সুহৃদ্‌জন। তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ঋণের পরিমাপ বৃদ্ধি করবো না, বরং প্রীতি ও শুভেচ্ছার সাথে আমার হার্দিক অভিনন্দন জানাই।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
	ভূমিকা—	এক
।। সূচনা ।।	ঊনবিংশ শতকে লৌকিক কাব্যের ঐতিহ্য	একুশ
	লোককাব্য ও আধুনিক বাংলা কবিতা	
।। এক ।।	ছড়া ও আধুনিক বাংলা কাব্য	পৃ - ১
।। দুই ।।	লোকগীতি ও আধুনিক বাংলা কাব্য	পৃ— ১৩
।। তিন ।।	উপভাষা—প্রবাদ ও বাংলা কাব্য	পৃ— ২০
।। চার ।।	আধুনিক বাংলা কাব্যে লৌকিক উপাদান	পৃ— ৩৪
	ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিহারীলাল	
।। পাঁচ ।।	রবীন্দ্র কাব্য ও লৌকিক ঐতিহ্য	পৃ— ৬১
।। ছয় ।।	রবীন্দ্র পরবর্তী ও সমসাময়িক বাংলাকাব্য ও লৌকিক ঐতিহ্য	পৃ— ৮৬
	কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	
	অতি আধুনিক বাংলা কাব্য	পৃ— ৮৯
	জীবনানন্দ দাশ	পৃ— ৮৯
	অজিত দত্ত	পৃ ৯০
	বিষ্ণু দে	পৃ - ৯৬
	প্রেমেন্দ্র মিত্র	পৃ ১০১
।। সাত ।।	আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় লোকায়ত অনুষঙ্গ	পৃ—১০৩
	জাদুবিদ্যা—ডাকিনী বিশ্বাস—লোকসংস্কার	পৃ—১০৪
	লোক বিশ্বাস—ভৌতিক বিশ্বাস—অলৌকিকতা	পৃ—১১২
।। আট ।।	রূপকথা ঃ উপকথা ঃ কিম্বদন্তী ঃ পরীকাহিনী	পৃ—১২৫
।। নয় ।।	লোকায়ত বাংলা ঃ বাংলাদেশের কবিতা ও লৌকিক ঐতিহ্য	পৃ—১৩৭

ভূমিকা

আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে পাঁজি মিলিয়ে 'মডার্ণে'র' সীমানা নির্ধারণ করা যায় না—কারণ এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা। তারপরই তিনি একটি অসাধারণ মন্তব্যে উপনীত হয়ে বলেছিলেন যে নদী সামনের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সে বাঁকটাকেই বলতে হবে 'মডার্ণ'—বাংলায় যাকে বলা হয় আধুনিক।[১] তাই রবীন্দ্রনাথের মতে এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়ে তিনি আধুনিকতার স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে আরও বলেছিলেন যে তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার দৌড় ছিল ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ডস্বার্থ বিশ্ব প্রকৃতিতে যে আনন্দ ময় সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্মগত সর্বপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপ সৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীটসের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সিদ্ধান্ত দিলেন ঐ যুগে ব্যাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিরেছিল। বিচার করে দেখা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূচনা এই 'বাঁক নেওয়ার' ব্যাপারটা, 'মর্জি পরিবর্তনের' রূপটা 'ব্যক্তিগত খুশি'র দৌড়টা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তার স্বরূপ লক্ষণ নিয়ে কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন ধারার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কবি এবং আধুনিক ধারার সেই অর্থে প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হলো এবং নবধারার সার্থক স্রষ্টা মধুসূদনের আবির্ভাব হলো। জীবদ্দশায় ঈশ্বর গুপ্ত নানা বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ লঘু-চপল রঙ্গ রসের ছড়া-পদ্য রচনা করে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য, দেবনির্ভর আত্ম বিলোপন বাংলা সাহিত্যে কে বস্তুনির্ভর বিষয় কেন্দ্রীক কঠিন বাস্তব জগতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য মানেই যে কেবল দেবতা বা দেবপ্রতিম মানব চরিত্র অথবা নিসর্গ জগতের শুভ্রতা, কমনীয়তা, রমনীয়তাই যে একমাত্র বিষয়বস্তু নয়; রহস্যময়তা ও মায়াময়, মোহময় জগতের বাইরেও যে-কবিতায় অস্তিত্ব আছে তা আমরা ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে তার প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছি। সেখানে আনারস থেকে তপসে মাছ, পাঁঠা থেকে নবান্ন, পুলি পিঠে– সমস্ত কিছু কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আধুনিকতা হচ্ছে যে লালিত্য ছন্দ-মাধুর্য এগুলিকেই কেবল কাব্য সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু রূপে না-দেখে, ভাবের জগতে একটু বাঁক ফিরিয়ে কঠিন,

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সাহিত্যের পথে ঃ পৃ ৮৯

কর্কশ, রূঢ়, অপাংক্তেয় ইত্যাদির মধ্যেও জীবনকে অনুসন্ধান করা—গভীর ভাবে খুঁটিয়ে অন্বেষণ করা। রবীন্দ্রনাথ এটাকেই ব্যাখ্যা করতে গিতে নন্দন তত্ত্ব এস্থেটিকেসের সম্বন্ধে এজরা পাউণ্ডের একটি কবিতার উদাহরণ উপস্থিত করেছেন—বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোট ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে—সে থাকতে পারল না, বলে উঠল, "দেখ্ চেয়ে রে, কী সুন্দর।" এই ঘটনার তিন বছর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড় বড় কাঠের বাক্সে ওর দাদা খুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেসিচয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, স্থির হয়ে বোস্। তখন সে সেই সাজানো মাছ গুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, "কী সুন্দর।" কবি বলেছেন, শুনে I was mildly abashed।

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ডিন মাছকেও, একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না কী সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের মতে এ দেখা নৈব্যক্তিক—নিছক দেখা, এর পংক্তিতে চটি জুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না। আধুনিকতার সূচনায় ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় এই নব-মানসিকতার পরিচয় পেয়েছিলাম ক্ষণিক আলোর দীপ্তির মতো। আর তার পিছনে ছিল ঈশ্বর গুপ্তের গ্রামীণ তথা লোকায়ত জীবন চেতনার স্পর্শ যেখানে তিনি লোক সংস্কৃতির জীবন ধারা থেকে তুলে আনতে পেরেছিলেন নানা উপাদান। তাই বহুক্ষেত্রেই তার কবিতার উক্তি গুলিই প্রবাদ-প্রবচনের আকারে মানুষের মনে লোক সংস্কৃতির চেতনার গভীর প্রদেশে বাঁধা পড়ে আছে। যেমন—'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গে ভরা,' শয্যার ভার্যার গায় ছারপোকা ওঠে প্রায়,' 'ছুড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে' (বিধবা বিবাহ-সংক্রান্ত), 'কসাই অনেক ভালো গোঁসাইয়ের চেয়ে', 'এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা, নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা', 'এই কালোর ভিতর আলো আছে ভালো করে দেখ জেনলে', 'বাপ পুজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে', 'ধর্মতলা ধর্মহীন গো-হত্যার ধাম', 'সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে দস্যি ভেড়ে নস্যি কর তারে' (সিপাহী বিদ্রোহের নানাসাহেব)।—ঈশ্বর গুপ্তই সেদিন তাই বলতে পেরেছিলেন স্বদেশ প্রেমের অনুপ্রেরণায়—

জননী ভারত ভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে।
তোমার কুমার যত জ্ঞানাহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে ?

কিংবা

মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে।

অথবা বহু প্রচলিত পংক্তি

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশ বাসিগনে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপে স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

এই স্বাদেশিক চেতনা ও চিন্তার মধ্যে দেশভাষা, মাতৃভাষা, জননী, ভারতভূমি' ভ্রাতৃভাব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার ঈশ্বর গুপ্তকে দেশ ও মাটির প্রতি ভক্তিতে যত বেশী স্বাদেশিক করে তুলেছে তার চেয়ে অনেক বেশী লোকায়ত জীবন সংস্কৃতির কাছাকাছি নিয়ে এসে আধুনিক বাস্তবতা ও বিষয় কেন্দ্রিকতার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং সেখানেই ঈশ্বরগুপ্ত পুরাতন ধারার শেষ কবি হয়েও আধুনিক ধারার বাঁক পরিবর্তনের সূচনাকার হয়ে উঠেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর মধুসূদন তাঁর একটি চতুর্দশপদী কবিতায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন—

আছিলে রাখালরাজ কাব্য ব্রজধামে
জীবে তুমি, নানা খেলা খেলিলা হরষে।
যমুনা হয়েছে পার, তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিলা তোমা!

—সেখানেই 'রাখলরাজ' রূপে 'কাব্য ব্রজধামে' তিনি কবিকে বিরাজিত দেখেছিলেন। কেবল তাই নয় কবিতার কল্প এবং বাস্তব লোকে নানা খেলায় তিন সকলকে মাতিয়েছিলেন, এই রাখালরাজাকে তার 'গোপগ্রাম' অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের জগতে কেউ কি মনে রেখেছে। মধুসূদনের এই ক্ষেদোক্তিতে গুপ্ত কবির কাব্যে লোকায়ত ঐতিহ্য যে কত গভীর ছিল তাও যেমন প্রকাশিত হয়েছে ঠিক তেমনি তিনি তাঁদের মতো আধুনিক কবিদেরও যে উৎসাহ দাতাও প্রেরণা দাতা একথাও স্বীকার করতে কুণ্ঠা হননি।

ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে সেদিন বাংলার মনোজগতে যে কল্পনাপক্ষী ডানা মেলেছিল নবাগত পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও জীবনাদর্শনকে উপলব্ধি করার জন্য তার মধ্যে ছিল সেকালের কাব্য আত্মার আত্মপ্রকাশ ও আত্মসম্প্রসারণের আকুতি। তাই সেদিন রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কেবল দিক পরিবর্তনও একটা মর্জি পরিবর্তনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

ঊনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই সব কবিদের মধ্যেদিয়েই আধুনিক জীবন উল্লাসের উদ্বোধন ঘটলো। তাঁরা কেউ কেউ ইতিহাসের বীররস, প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতির প্রাণরস আহরণ করে— কেউ কেউ লিখলেন ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য, আবার কেউ কেউ লিখলেন পুরাদস্তুর মহাকাব্য। তখন এককথা সমস্ত বাংলা সাহিত্য জুড়ে পাশ্চাত্যের নতুন নতুন ভাব ও ভাবনা, বিষয় ও বিষয়বস্তু, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার, প্রকাশভঙ্গীর নবনব বৈচিত্র্যে আঙ্গিকে রূপে এবং রূপায়ণে, যজ্ঞভূমিতে সৃষ্টির নব নব উল্লাস। আলোড়ন ও বন্যার জলোচ্ছ্বাসের যুগ পার হতে দেখা গেল সে যুগের কবিরা যতই

পাশ্চাত্যের ভাব এবং ভাবনা, আঙ্গিক ও শৈলীর নানা বৈচিত্র্যে নিজেদের যতই জড়িত করে ফেলুক না কেন ভারত সংস্কৃতির মৃত্তিকার গভীরে তাদের মূল বা শিকড় প্রোথিত হয়ে আছে। সেখানে একদিকে আছে যেমন—পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের ঐতিহ্যচারিতা, অপরদিকে ভারত ইতিহাসের নানা বর্ণ সঙ্কুল অধ্যায়ের অতীতচারিতা আর তারই সঙ্গে মিলেমিশে আছে সহস্র সহস্র বছরের লোকায়ত মৌখিক সংস্কৃতির বিচিত্র কথা, কাহিনী, কিম্বদন্তী প্রবাদ, প্রবর্চন, নৃত্য গীতি, উৎসব, পর্ব-পার্বণ ইত্যাদি নিয়ে বিচিত্র লোকসংস্কৃতির জীবনধারা। আসলে সেদিন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে সেযুগের কবিরা যে নব আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন, যে নতুন যুগের ভাব প্রকাশে নব-নব চিন্তা-চেতনা, দার্শনিক অনুভূতি, নবলব্ধ জীবনবোধের আকৃতি প্রকাশে—তা কিন্তু একেবারেই ঐতিহ্যবোধ বর্জিত ছিল না। পৌরাণিক এবং লোকায়ত ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করেই সেদিনের কাব্য যজ্ঞ ভূমিতে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার তাই বললেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিদের দ্বারাই আধুনিক জীবন উল্লাসের উদ্বোধন হলো। এতদিন যে জীবনরস নানা বাধা নিষেধের পঙ্ককুণ্ডে স্থবির হয়েছিল—এই সমস্ত কবিদের রচনায় সেই প্রবাহ পঙ্কশয্যা ত্যাগ করে সাগরগামী হলো। এককথায় উনিশশতকী বাঙালী রেঁনেসাসের নান্দীপাঠ করলেন রঙ্গলাল—মধুসূদন—হেমচন্দ্র – নবীনচন্দ্র।[২] এখন বিচার করার সময় এসেছে উনিশশতকী বাঙালী রেঁনেসাসের স্বরূপটি কী তা নতুন করে বিচার করা এবং সেখানে এইসব কবিদের নান্দীপাঠের ভূমিকাটি কী তা স্পষ্ট করে জানা।

রেঁনেসাস কথাটির অর্থ যদি নবজাগরণ হয়ে থাকে তাহলে বিচার করে দেখা দরকার এই জাগরণটি কিধরনের জাগরণ এবং সেই জাগরণের ফলে আমাদের চেহারা-চরিত্র-মানসিকতার কি মর্জিবদল ঘটেছিল। আমরা বহুদিন ধরে শুনে আসছি যে ইউরোপের ঝোড়ো-হাওয়া আমাদের এমনভাবে আঘাত করেছিল, আমাদের এতো নাড়া দিয়েছিল যে দেব-নির্ভর বাংলা সাহিত্য দৈবী-সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত বাঙালী চেতনাটি বদলে গিয়ে মানব নির্ভর যুক্তি কেন্দ্রিক সাহিত্যে পালাবদল ঘটিয়ে দিয়েছিল। অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথও 'কালান্তরে'—এই পালা বদলটিকে এইভাবে বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে ইউরোপের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের ওপর আঘাত হেনেছিল, আমরা ঘুম ভেঙে চলতে সুরু করেছিলাম।' এই চলাটাই ছিল সেই যুগের মর্জিবদল এবং ঐতিহাসিকদের কাছে নবজাগরণ। কিন্তু আজকে ভেবে দেখার সময় এসেছে, হাজার হাজার বছরের লিখিত ও শাস্ত্রীয়ধারার যে ঐতিহ্য এবং তারই পাশাপাশি মৌখিক সূত্রে প্রবাহিত অলিখিত ধারার যে লোকায়ত সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই ভারতবর্ষের চলিষ্ণুতা নষ্ট হয়ে স্থবিরত্বে পর্যবসিত হয়েছিল কি না? ভারতবর্ষের বেদ-বেদান্ত-গীতা-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারতে, নানা-পুরাণ কাহিনীর মধ্যে, লোকায়ত

২। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : পৃ—৪৭০ ; সং ১৩৭৩

গল্প-গাঁথা-কিম্বদন্তীর পরিমণ্ডলে, প্রবাদে-প্রবচনে-গীতে-নৃত্যে-উৎসবে-অনুষ্ঠানে-পূজা-পার্বণে, মন্দিরে-ভাস্কর্যে-চিত্রপটে-পটুয়ার ছবিতে-আলপনা ও দেওয়াল-চিত্রের চিত্রহারে, নক্সায়-সূচীশিল্পে-ধাতুপাত্রের বিভিন্নরূপে ও গড়নে, যাত্রায়-কথকথায়-নাটকে-অভিনয়ে—যে বিশাল বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষ তা কোনদিনই স্থবির, অচল, অটল, স্থানু হতে পারে না। সহস্র বৎসরের জীবনধারার নির্যাসবাহী সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সে চিরকালই প্রবাহমান, পরিবর্তনশীল , পরিবর্তন পরিবর্ধন ও রূপান্তরে নিত্য তীর্থ যাত্রী। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে নিয়ে এই ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ধারা শত প্রবাহমান ও বেগবতী। দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে দিয়ে, মিশে যাওয়া মিলে যাওয়ার সঞ্জীবনী সুধায় ভারতবর্ষের সংস্কৃতি চিরকালই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। তবে বারবার নানা আঘাত এসেছে তার জীবনে ও সংস্কৃতিতে—হয়তো কখনও সে থমকে দাঁড়িয়েছে কয়েক মুহূর্তের জন্য, কিন্তু তার পরেই আবার সে প্রবাহমান তার ধারাকে চলিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করে নিয়ে গেছে চিরকালীন ও সনাতন ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে। শক-হূন-দল-পাঠান-মোগল একই ভারতবর্ষীয় দেহে যেমন লীন হয়ে গেছে, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে, পাশ্চাত্যের প্রাণবেগকে আত্মসাৎ করে সেদিন নতুনতর ভাষায়, নবতর ভাব ব্যঞ্জনায় সেদিনকার কবিরা বলে উঠতে পেরেছিলেন "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় / দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে প্যরিবে পায় হে, কে পারিবে পায়।" —রঙ্গলালের এই আত্মসচেতনতা এবং আত্ম-মর্যাদাবোধ মধুসূদনের মেঘনাদকে কি প্ররোচিত করেছিল একথা বলতে 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরপর সদা'। সেদিন নতুন যুগের, নতুন ভাষায় কাব্যরচনা হলেও রঙ্গলালের কাহিনীর সূত্র ছিল রাজস্থানের লোকায়ত জীবনধারা থেকে আহৃত লোক কবি 'ভাট' ও চারণদের মৌখিক গীত, যা রাজপুতানার শৌর্য-বীর্যমূলক গাঁথা সাহিত্য থেকে আহরণ করেছিলেন আর মধুসূদন ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের উপাদান গ্রহণ করে ভারতীয় জীবন-বোধ সংস্কৃতির রসে নতুন করে জারিত করে সেদিনের নবতর ভাব-ভাষা-আঙ্গিককে প্রকাশ করেছিলেন। তাই সীতা-সরমার চিত্রকল্প সৃষ্টিতে তার কলম থেকে নির্গত হয়েছিল বাঙালী লোকায়ত জীবন ধারার একটি পরিপূর্ণ চিত্ররূপ—'আহা সুবর্ণ দেউটি ,যেন জ্বলিল তুলসীর মূলে' —যিনি হোমার, ভার্জিল-দান্তে বড় জোর সেক্সপীয়রের বাইরে কাব্যরচনার কোন চেষ্টা করার কথা চিন্তাও করেননি, তিনি ফ্রান্সের সুদূরতম প্রদেশ ভার্সাই-এ বসে কেন ঈশ্বরগুপ্ত, কৃত্তিবাসকে শ্রদ্ধা জানান সনেট রচনা করে, কেন তার মনে পড়ে যায় কপোতাক্ষ নদ, ভাঙ্গা মন্দির, বটবৃক্ষের ঝুরি, কোকিল, দোয়েল, পাপিয়ার কথা। কেন রাধা-কৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে গৌড়ীয় মহাজন পদাবলীর চেয়ে পুরুলিয়ার লোকায়ত ঝুমুর গান তাকে বেশী আকৃষ্ট করে? আসলে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেকটি বড় মাপের কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আছে একদিকে শাস্ত্রীয় লিখিত সংস্কৃতির ঐতিহ্য, অপরদিকে আছে লোকায়ত মৌখিক ধারার অনুপ্রেরণা। মূল ব্যাপারটি হচ্ছে সেই মাটি এবং শিকড়ের সম্পর্ক। তাই সেদিন যে বাঙালী রেঁনেসাসের মধ্য

দিয়ে কবিদের মধ্যে সৃষ্টির উল্লাস ধ্বনিত হয়েছিল তা ছিল এই দুই ধারার মিলিত প্রয়াসে• মাটির গভীরে শিকড়কে প্রোথিত করার প্রয়াস, আবার ইউরোপের নব-নব ভাব প্রবাহ ও আঙ্গিকের ধারাকে আত্মসাৎ করার একটি অসাধারণ আকুতি – যা দেখা গিয়েছিল কয়েক'শ বছর আগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে।

বিহারীলালের আত্মচেতনার-পথ ধরে এলেন রবীন্দ্রনাথ। যিনি শৈশবে কাব্য জগতে পদ চারণা সুরু করেছেন ছড়া দিয়ে—'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি' / তাহাতে কদলী দলি' / সন্দেশ মাখিয়াদি তাতে / হাপুস হুপুস শব্দ / চারিদিকে নিস্তব্ধ / পিঁপিঁড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' —তিনি পৃথিবীর কাব্য জগতে সম্রাটের মতো দীর্ঘদিন রাজত্ব করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ছাপার অক্ষরে তাঁর যে কাব্যগ্রন্থ জীবিতকালে শেষ প্রকাশিত হচ্ছে তা হচ্ছে 'খাপছাড়া' ছড়ার গ্রন্থ। রাজ-রাজ্যেশ্বর রবীন্দ্রনাথ কাব্যজগতের যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে তা এককথায় অভিনব। সেখানে তিনি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অভিনব মেল বন্ধন ঘটিয়ে ছিলেন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বারে বারে। তাঁর কাব্যে, গানে, নাটকে সর্বত্রই লোকায়ত ও শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন বারবার—এ সম্পর্কে তাঁর ধারনা ছিল একদিকে তা যেমন বৈজ্ঞানিক চেতনা সমৃদ্ধ অন্যদিকে রসসৃজন এবং সার্থক শিল্প সৃষ্টির পরিপূর্ণ প্রকাশ। বাঙ্গালীর লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাটিকে তিনি এই ভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন একেবারে লোক সংস্কৃতির গভীরে গিয়ে ঃ

সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহন করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়,—তাহারাই ইহার ভাঙাছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে সেই জন্যেই বাঙালীর কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে। বৈষ্ণবী যখন "জয় রাধে" বলিয়া ভিক্ষা করিতে অন্তঃপুরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন কুতুহলী গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিত বধূগণ তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসেন, প্রবীণা পিতামহী, গল্পে গানে ছড়ায় যিনি আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, কত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় ও কৃষ্ণপক্ষের তারার আলোকে তাঁহাকে উতান্ত করিয়া তুলিয়া গৃহের বালক-বালিকা যুবক-যুবতী একাগ্রমনে বহুশত বৎসর ধরিয়া যাহা শুনিয়া আসিতেছে বাঙালি পাঠকের নিকট তাহার রস গভীর এবং অক্ষয়।[৩]

লোকায়ত মৌখিক সংস্কৃতির ধারা লোকশ্রুতির মধ্যে যে প্রবাহিত হয়ে আসছে আবহমানকাল ধরে, রবীন্দ্রনাথ তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সার্থক ভাবে। উপরে উদ্ধৃতিটির মধ্যে তার পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত। কিন্তু এরই সঙ্গে লিখিত তথা শাস্ত্রীয় ধারার যে গভীরতম সম্পর্ক সেটি রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দেশে তাঁর অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর ভাষাতেই বলা চলে যে

৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ লোকসাহিত্য ঃ পৃ-৫৭ [২য় সং ১৩৪৫]

এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের যে সম্পর্ক তার রসগভীর এবং অক্ষয়। তাই ওপরের সঙ্গে নীচের, শেকড়ের সঙ্গে কাণ্ড-ফুল-লতাপাতার সম্পর্ক চিরকালের। তাঁরই ভাষায় –

"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে—তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপে নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে একটি বরাবর ভিতরকার যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল ফল ডাল-পালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলোর তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।"[৪]

তাই রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে আমাদের দেশে ভারতচন্দ্র. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম ইত্যাদি কবিরা যদিও রাজসভা এবং ধনীসভার কবি, যদিও তাঁরা উভয়েই পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে বিশারদ তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশীদূরে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। 'এই দেশীয় প্রচলিত সাহিত্য বলতে তিনি লোকায়ত সংস্কৃতি ধারার অন্তর্ভুক্ত মৌখিক সূত্রে প্রচলিত লোক সাহিত্যের ধারাকেই বুঝিয়েছেন। আমরা এই সূত্র ধরেই বলতে পারি যে বাংলার কোন শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিকই, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'দেশীয় মৌখিক সাহিত্য' অর্থাৎ লোকসাহিত্যকে ছাড়িয়ে বেশীদূরে যেতে পারেন নি। মূল অর্থাৎ শেকড়ের সঙ্গে যোগসূত্র থেকেই গেছে। তাই একালের কবি জীবনানন্দ যখন বলেন –

> "ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
> পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
> এইসব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর
> ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ কেমন নিবিড়।
> ওইখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হত কতো কতো দিন,
> হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ।
> শান্ত তবু ঃ গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
> আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।"
>
> জীবনানন্দ দাশ ঃ ধান কাটা হয়ে গেছে।

—এই ধান কাটা ক্ষেত-মাঠ-খড়-পাতা-কুটো-ভাঙাডিম-সাপের খোলস-নীড়শীত-গভীর সবুজ ঘাস—এইসব নিয়ে জীবনানন্দের কবিতা একেবারে মাটির গভীর থেকে শিকড় চালিয়ে যে রসে তার কবিতাকে সঞ্জীবিত করেছে তা হচ্ছে পরিপূর্ণ লোকায়ত ঐতিহ্যের নির্যাস। হয়তো বা এর সুরুই হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে। তার কারণ তিনি যখন আমাদের সামনে বৃষ্টি পড়া টাপুর

৪। রবীন্দ্রনাথ ঃ লোকসাহিত্য ঃ পৃঃ ৫৮ [২য় সং ১৩৪৫]

টুপুর ছন্দে জানিয়ে দেন—'মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা, মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যাথা',—তার মনেই বা কেন সেদিন ভীড় করে এসেছিল সেই পুরণো দিনের স্মৃতিকথা বা কেন মনে ভীড় করে এসেছিল—মনে পড়ে ঘরটি আলো, মায়ের হাসি-মুখ / মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরু গুরু বুক। / বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা, / মায়ের কোলে দৌরাত্মি সে না যায় লেখা জোখা। / — তাইতো তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি - মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলাম গান—' বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান। /, — কড়ি ও কোমলের যুগ থেকে সুরু করে কবি সারাজীবন ধরে রূপকথা-উপকথা-কিম্বদন্তী-বিশ্বাস-সংস্কার-ছড়া-প্রবাদ-প্রবচন-লোক গীতি-উৎসব-পর্বপার্বণের মধ্য দিয়ে বারবার আবর্তন করেছেন। যতই পালাবদল ঘটেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেজাজের রং গেছে বদলে। কবি নিত্য-নতুন আধুনিকতার মোড়কে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছেন বারবার কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি লোকায়ত জীবনধারা থেকে সরে আসেননি বরং অক্সফোর্ডের মতো গুণী সভায় মানুষের ধর্ম বোঝাতে গিয়ে তিনি যখন উপনিষদের মানব সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে যান তখন তিনি লোকায়ত সংস্কৃতির অন্তঃস্থল থেকে সংগ্রহ করা জীবন উপলব্ধির সত্যরূপ, বাউলের মর্মকথা 'মনের মানুষ'কেও উপস্থাপিত করেন।

মধুসূদন থেকে সুরু করে আধুনিকতম সাম্প্রতিক কালে বাংলা কবিতায় যে বিচিত্র জগৎ সেখানে বহুবার 'মর্জি বদল' ঘটেছে। মধুসূদন থেকে হেমচন্দ, নবীনচন্দ্র, থেকে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে আমরা যখন বাংলা কাব্য জগতে পেঁছাই তখন আমরা দেখতে পাই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দুটো ধারা রবীন্দ্র পরবর্তী ক্ষেত্রে কাজ করেছে – তা হচ্ছে রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠী এবং আর একদল রবীন্দ্র অনুরাগী স্বতন্ত্র কল্পনাবিশিষ্ট কবিগোষ্ঠী। এই যুগের কবিদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তাদের ভাব এবং ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক বলেছিলেন

যতীন্দ্রমোহন বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক পল্লীকবি না হলেও লোকায়ত কাব্যসংস্কার রক্ষা করেছেন, বিশেষত বাঙলা ভাষার নিজস্ব বাগ্‌বিধির ব্যবহারে। প্রত্যেক ভাষা যেমন অনুবাদ-অনুকরণের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধিলাভ করে, তেমনি দেশজ শব্দভাণ্ডার ও প্রয়োগ বিধিকে রক্ষা ও পরিপুষ্ট করে। এখানেও কবির শিল্পবোধ কাজ করে, কারণ ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করা কবিরই কাজ। যতীন্দ্রমোহন কেবল বিষয় বৈচিত্রের জন্য জেলের ছেলে, জেলের মেয়ে, চাষীর মেয়ে, মালোর মেয়ে, অন্ধবধূ বা কাজলাদিদিকে নিয়ে কবিতা লেখেন নি, নিজস্ব কবিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনেই এখানে পল্লী-ঘেঁষা বিষয় কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে 'পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি! / আস্তে একটু চল্‌ না, ঠাকুরঝি— / ওমা, এ যে ঝরাবকুল / —নয়?' কিংবা 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই— / মা গো আমার শোলোক-বলা কাজলা-দিদি কই?' —এমন ভাষা ও ভঙ্গি কারো অনুকরণ নয়, অথচ-এর অভিনবত্ব চট করে ধরাও যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ডিত-কবি, এই খ্যাতি তথ্য-ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও লক্ষনীয়, বাংলা ভাষার দেশজ শব্দভাণ্ডার ও বাগ্‌বিধির ব্যবহারেও তিনি নিপুণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য চর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি লোকায়ত কাব্য ঐতিহ্য সম্বন্ধে সমান সচেনত ছিলেন। ফলে পুরানো কাব্যধারার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যথার্থ বিচ্ছেদ ঘটেনি, বরং পুরানো কাব্যধারার সঙ্গে যোগেই তা নতুন তাৎপর্য লাভে সক্ষম হয়েছে। শুধু ভাষা ব্যবহারে নয়, লাচাড়ি ছন্দের আধুনিক রূপান্তরেও তাঁর সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। 'বাউলের সুরে' তিনি কখনো লেখেন 'কোথাও ডাকে দোয়েল শ্যামা- / নাচে ফিঙে গাছে গাছে ?' কিংবা 'পাল্কীর গান' খুব সহজেই ব্যবহার করেন 'আদুল গায়ে" 'উঠছে কতক ভনভনিয়ে', 'গরুর বাথান—গোয়ালখানা', 'মট্‌কা থেকে', 'ন্যাংটা খোকা', 'মাথার পুটে', 'দিচ্ছে চালে পোয়াল গুছি', 'ফ্যান্‌সা ভাতে'র মতো শব্দ।[৫]

এ ভাবেই রূপান্তর ঘটেছে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বারবার। বুদ্ধদেব বসু এই প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন আমার হাতে এলো দীনেশচন্দ্র সেনের অবদান 'পূর্ববঙ্গ' 'ময়মন সিংহ' গীতিকা, নিজেকে জপাতে চাইলাম এগুলো 'মাটির গন্ধে খুব খাঁটি' । (তোমার যৌবন পৃঃ ২৬) 'কল্লোলে'র কাল থেকেই যে নতুন যুগের সূচনা হলো সেখানে অনেকেই চাইলেন মাটির গন্ধ, বিশেষ করে বাস্তব জীবন বোধের প্রকাশ তাদের কাব্যে আনলো নতুন তরঙ্গ। বিষ্ণু দে বললেন—জল দাও আমার শেকড়, কিংবা জীবনানন্দ বললেন—'মাটি, পৃথিবীর টানে, মানব জন্মের ঘরে কখন এসেছি, / না এলেই ভাল হতো অনুভব করে, / এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি / শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল করে। / কিংবা যখন তিনি বলেন—'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোন—নিবিড় ঘাস-মাতার / শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। / —তখন মাটির গভীরে, পৃথিবীর টানে, জল দাও শেকড়ে, ঘাসের ভেতরে ঘাস হয়ে জন্মান, নিবিড় ঘাস-মাতার শরীরের সুস্বাদ ইত্যাদির মধ্য থেকে মূলের গভীরে ফিরে যাওয়ার একটা টান বা আবেগ কবিদের মধ্যে বারবার লক্ষ্য করা গেছে। —তাই অতি আধুনিক কালের কাব্যেও এই লোক জীবনের অনুষঙ্গগুলি এসেছে বারবার। বিষ্ণু দে 'আমাদের মেয়েরা' কবিতায় যে জীবনধারা ফুটিয়ে তোলেন তা একান্তভাবেই লোক জীবন কেন্দ্রিক ও প্রাত্যহিক জীবনচর্যার কথা। —'বাসরের বাসি অঙ্গ মেজে সদ্য স্নাত / চুলে গিঁট সংসারের কাজকর্ম সারা / চায়ের যোগান দেওয়া কাঁদা নয় / ধুঁয়ার ছলনে রাঁধা তিন-চার পদ, / তারপরে ছেলে মেয়ে খাওয়ানো / পুরানো অসুখ বিসুখ, সেবা পথ্য / দেওয়া, তারপরে বাকি কাজ শেষ / করে খাওয়া কিংবা উপবাস-ব্রত / পুজো মানতের দু-চার মিনিট রৌদ্রে / চুল মেলা' সরাসরি জীবন বর্ণনার সার্থক প্রকাশে লোকজীবন মূর্ত হয়ে উঠলো এদের কাব্য।

অতি আধুনিক বাংলা কবিতায় যে নাগরিক জীবন বৃত্তান্তের কথাই প্রকাশিত হয়েছে তাই নয় বরং বেশী পরিমাণে পল্লীজীবনের লোকায়ত প্রকৃতি এবং মানুষ—লোক সংস্কৃতির অনুসঙ্গ নিয়ে তাদের কাব্যে বারবার প্রকাশিত হয়েছে। যখন সমর সেন খাঁটি নগরজীবন নিয়ে তুখোড় সব কবিতা লিখছেন তখন জীবনানন্দের কবিতার

৫। ডঃ অলোক রায় 'সন্ধিক্ষণের কবিতা'—আধুনিক কবিতার ইতিহাস (সম্পাদনা)

বিষয়বস্তু হচ্ছে ঘাস, হওয়ার-রাত, শঙ্খমালা ইত্যাদি। নিতান্ত শেষ কয়েক বছর ছাড়া জীবনানন্দের সব কবিতাতেই তীক্ষ্ণ এবং প্রগাঢ় প্রত্যক্ষতা নিয়ে গ্রাম-বাংলা উপস্থিত। এই গ্রাম-বাংলার লোকায়ত পরিবেশকে তিনি চিনেছিলেন বরিশালের গ্রামীণ পরিবেশে এবং আসামে আরণ্যক পটভূমিতে। তাই বাংলার গাছ-পালা, ফল-পাখী, জীব-জন্তুর এত নাম খুব কম কবির কবিতাতে প্রকাশিত হয়েছে। —নিবিড় বটের নিচে লাল লাল ফল পড়ে থাকে জীবনানন্দের কবিতায়। হিজলের জানলার আলো আর বুলবুলি খেলা করে, হলুদ পাতার ভিড়ে বসে শিশিরে পালক ঘসে পাখি, সোনার বলের মতো সূর্য আর রুপোর ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ পিপুলের গাছে বসে একা পেঁচা দেখে, জলপাই অরণ্যের পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা ; জোনাকিতে ভরে যায় অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল ; এ-সব 'তুমুল গাঢ় সমাচার' আমরা ইতিপূর্বে আর কারো কবিতাতেই পাইনি। অনেক শিরীষের ডালে, অশত্থের চূড়া, সুন্দরীর অর্জুনের বন, বাবলার গলির অন্ধকার, শাল-পামের নিবিড় মাথা উঁচু উঁচু হরিতকি গাছ, আম-নিম-জাম-ঝাউ পিয়াল পিয়াশাল আমলকি পিপুল দেবদারু— ভিড় করে আছে ; তলায়—ফণিমনসার কাঁটা, জামিরের বন, শরকাশ, হোগলা আর মধুকুপী ঘাস। কান পাতলেই কবিতার অন্তহীন এক অরণ্যের মর্মর শুনতে পাই যেন, ঝরঝর করে গায়ে মাথায় রাশি রাশি হলুদ হেমন্তের পাতা ঝরে পড়ে। আর এই জীবনানন্দীয় অরণ্য প্রকৃতি অসংখ্য প্রাণী পাখী কীট পতঙ্গের আসা-যাওয়ার সতত চঞ্চল প্রাণের নিছক উল্লাসে, অপচয়ে, আলস্যে স্পন্দিত হচ্ছে ; থুরথুরে অন্ধ পেঁচা, একা পায়রা, অবিচল শালিখ, সোনালি চিল, কাকাতুয়া, মাছরাঙা, জলপিপি, কিংবা দুরন্ত শকুন। সন্ধ্যার আঁধারে ঘুমের ঘ্রাণ পাওয়া হাঁস পুকুর পাড়ে ; স্ফটিক-পাখনা মেলা বোলতা—নীলিমায় ; শাদা বক-নীল হাওয়ার সমুদ্রে।[৬]

জীবনানন্দ যে লোকায়ত গ্রাম-বাংলার অবহেলিত অবজ্ঞাত-অনাবিষ্কৃত নিসর্গ জগৎকে আধুনিক বাংলা কবিতার স্থায়ী আসন দেবার চেষ্টা সুরু করেছিলেন সেটি বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভৃতি প্রখ্যাত কবিদের কাব্যধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অতি আধুনিক কাব্যজগতে বিস্তার লাভ করেছিল। কবি মনীন্দ্ররায়ের 'এই জন্ম, জন্মভূমি' কাব্যগ্রন্থে লোক জীবনের স্তরে-স্তরে যে নিসর্গ জীবন ও মানব প্রকৃতির চলমান জীবনধারা, তাকে বারবার অতি আধুনিকতার প্রগাঢ় পাশ্চাত্য মনো ধর্মিতার বস্তু তান্ত্রিকতার মাঝখানেও লোকায়ত স্বপ্নে আমাদের বিভোর করেছেন—

ঐ তার আকাশ, ঐ মাইল মাইল মাঠ, / হটাৎ অশথ, তাল সবুজের পুঞ্জ, খড়ো চালা, / উঠোনে গৃহস্থ নিম, যুবতী ডালিম, ঝিঙেলতা ; / ওদিকে পুকুর, নাকি দিঘি, ঐ গলুইয়ে কাছিম ; কলমির বেগুন ফুলে সোনালি ফড়িং ; / আর পায়ে চলা পথ, বাঁশঝাড়, আগাছার ঝোপ, / পাতার মখমলে তার সোনালী শিশির; / এবং বাগান ঐ জঙ্গলে জটিল / আমি লিচু বকুলের গুলঞ্চের গলাভিড়ে। যাওনা শবজির খেতে

৬। নরেশ গুহ ঃ জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥ কবিতা-পৌষ ১৩৬১

নিড়ানির শিরাওঠা হাতে ; / যাওনা আমন মাঠে লাঙলের পাকে পাকে ; যাও / বোড়োর কাদায়, হাঁটু জলে পাট ধোওয়া বিলে ; / ওঠো না হাটের নৌকা, গুন টানে ; যাও / চষো নদী জাল খোলে, রাতে / ঘোরাও কুমোর চাকা, ঝুড়ি বাঁধো, বাঁটালি চালাও ; সেখানে কবি ডাক দিয়েছেন ও বউ কোথায় গেলি ! ধান ভানা, শাকতোলা শেষে। জিজ্ঞাসা করেছেন পুকুরে জলের তলে এলোচুলে একি ঘুম তোর ! এমন কি 'ভিয়েত নাম' কবিতাতেও তিনি টোকা পরে লাঙ্গল নিয়ে বীজধান বোনা দেখেছেন, তারই পাশে জাল ফেলে মাছধরা এবং বাঁক কাঁধে নিজে বাজারে যাওয়ার ছবি এঁকেছেন, কারণ তার চারপাশে আছে লোকায়ত নিসর্গ জগৎ, যেখানে কলা ঝোপ, বাঁশঝাড়, বেত নারিকেলে সাজানো দিগন্তে নদীর চর, সেখানে দেখেছেন মহিষের পিঠে উদাসী রাখাল। আবার সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় রূপকথার অনুষঙ্গ এসেছে বারবার। কবি 'মীমাংসা' কবিতায় বলেছেন—আর আমি বুঝি দৈত্য দলনে সাগর / পার হলাম ; যেখানে দানবের পায়ে / সব আঁধার। মর্ত্য যেখানে দৈত্যে / দৈত্যে বিবাদ ভারি ঃ হানাহানি / নিয়ে সুন্দরী এক রাজকুমারী —আবার লোকজীবনের জীবন চর্যার রূপটি সযতনে অঙ্কন করেছেন 'ঘুমনেই' কাব্যগ্রন্থের 'চিরদিনের কবিতায়'—কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে / প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে / রাত্রি হলেও দাওয়ায় অন্ধকারে / ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে। —খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাংলার লোকায়ত জীবন চর্যার রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি সুকান্ত। তাই সাম্যবাদী সুকান্তই হোক আর দীর্ঘকালের আমেরিকা প্রবাসী অমিয় চক্রবর্তীই হোক সকলেরই কাব্যে লোক সংস্কৃতির অনুষঙ্গগুলি এসেছে বারবার আর সেখানেই কবিতা পাশ্চাত্যের প্রভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে না উঠে সহজ ও জীবন্ত চলমান জীবন ধারার লোকয়েত পরিবেশকে সজীব করে তুলেছে। — সেখানে 'মাটির দেয়াল' কাব্যগ্রন্থে 'প্রবাসী' কবিতায় লোকায়ত বাংলার জীবন নিসর্গ এ সংস্কৃতির এক অপরূপ রেখাচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

> নদী শাখানদী, পুকুর কচুবন
> কলাবাগান, মাদার দোপাটি,
> ছোলা ক্ষেত, শর্ষে দূরে মাটির
> দেয়াল কুমড়ো লতানো চাল
> ঝিঁ ঝিঁ সন্ধ্যে, ঘুটে পোড়ানো,
> …পূর্ণিমার চাঁদ, নিঃঝুম রাত
> দূরে ডাকবে শেয়াল।' গাঙে স্রোত,
> ভাটিয়ালি, কীর্তন, দেউল, মুর্সিদ্যার
> বাড়ি

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিতার বহু জায়গার তুলসী মণ্ডপে, নদীর পোড়ো-দেউলে, ধানের মড়াই, কলাগাছ, পুকুর খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া রূপ যেমন দেখেছেন, তেমনি দু-পাশে ডোবা, সবুজপানার ডোবা তার মধ্যে সুন্দর ফুল কচুরীপানার অঙ্কিত শোভায়, লোকজীবনের রূপকে জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত করে তুলেছেন বিদেশী বিশ্ববিদ্যা-

ময়ের ডাক সাইটে ইংরাজীর অধ্যাপক কবি। আবার তিনিই সহজ দেশজ ভাষায় শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে ছড়া রচনা করেছেন—জংলা বাগান, বুনো বাবলা, গিরগিটি তার ঘেঁচু, / শুকনো পেটে চ্যাঁচায় দাওয়ায় পুটলি, ভোতন, পেঁচু—এই যে ছড়ার রূপচিত্র এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলা, বুনো, ঘেঁচু, চ্যাচায়, দাওয়ায়, পুটলি, ভোতন দেশজ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে লোক সংস্কৃতির একটি গ্রামীণ পরিবেশ সেখানে ফুটে উঠেছে। আমার 'অভিজ্ঞান বসন্ত' কাব্যগ্রন্থের 'বসুধা' কবিতায় কবি যখন বলেন—

পুকুর-ধারে, হোক হাটের পাশে
পাড়ার জামতলায়, বাড়ির পিছনের
ঘাসে জিইয়ে তুলবে বর্ষার
নতুন কলমিশাক, লাউডগা, কচি শসা,
কাঁচা আমড়া, তাজা লঙ্কা,
মেয়ে দুটি পুতুল নিয়ে ব্যস্ত
হালে বলদ জুৎচে, ঝাঁপি মাথায়
চাষী বৃষ্টিতে চারা পুঁতছে :

—তখন একথাটি মনে হয়না উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি মধুসূদন বিদেশে ভার্সাই-এ বসে যে ভাঙ্গা মন্দির, কপোতাক্ষ নদ ও বটবৃক্ষের ছবি এঁকেছিলেন, পরবর্তী যুগের কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে আধুনিক তম কালের তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ এমন কি ষাটের দশকের কবিরাও যে লোক জীবন ও সংস্কৃতির পরতে-পরতে মাটির সুঘ্রানকে, পাকা ধানের লাবণ্যকে, জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দকে নতুন ভাবে দেখা ও চেনার চেষ্টা করেছেন। সেখানে পুকুর ধারে, পাড়ার জামতলায়, বাড়ীর পিছনে ঘাসে ভরা উঠনে লতিয়ে-লতিয়ে উঠবে লাউডগা, কচি-শশা, জিইয়ে তুলবে বর্ষার নতুন কলমিশাক কাঁচা-আমড়া, তাজা-লঙ্কার সমারোহ দেখতে হয়েছে সেই কবিকে যিনি আগা গোড়াই পাশ্চাত্য রসের জারকে জারিত স্বয়ং কবি অমিয় চক্রবর্তীকে। বাংলা কাব্যে লোক সংস্কৃতির প্রভাবের বৈশিষ্ট্যটি এখানে। তাই লোকায়ত জীবন ধারাকে কবি অস্বীকার করতে পারেন না। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই জীবনের সুখ পর্যবেক্ষণ করেছেন : শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠনে / বসে আরামে কাঁথা গায়ে, ঝুমকো / লতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে / বসে আরামে কাঁথা গায়ে, ঝুমকো / লতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে / ভরে।

আবার পঞ্চাশের দশকের কবি সুনীল গাঙ্গূলী লৌকিক ছড়ার অনুষঙ্গে মন্ত্র রচনা করেছেন লোকায়ত ভৌতিক ধারণার প্রেক্ষাপটে—বিলি বিলি গান্ডাগুলু; বুম / চাক ডবাং ডবাং ভুলু হুড়মুড় / তা ধিন্ না উসুখুসু সাকি না / খিনা—এই ভাবে দেখা যায় বাংলা কাব্যের আধুনিকতার ক্ষেত্রে যেমন বারবার পালাবদল ঘটেছে ঠিক তেমুনি এইসব অতি-আধুনিক কবিতায় লোকায়ত জীবন চেতনার স্পর্শ এসেছে বারবার। লোক সংস্কৃতির গভীর মর্মমূলে থেকে নানা উপাদান, ভাব ভাবনা, ভাষা-উপমা-

চিত্রকল্প সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে অধিকাংশক্ষেত্রে। ইংরেজি কবিতার আধুনিক ধারার সূচনা করেছিলেন কবি হপকিন্‌স্‌। উনিশশো আঠারোতে বিরাট ব্রিজেস হপকিন্‌সের প্রথম কাব্য সংগ্রহ প্রকাশের পর সকলে বুঝতে পারলো বাগ্‌রীতি, ভাষা-ব্যবহার বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে ভিক্টোরীয় যুগের রক্ষণ শীলতার পরিমন্ডল থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়। এরই তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ উনিশশো পনেরোতে 'ইমেজিস্ট' গ্রুপের অর্থাৎ লাওয়েল, এজরা পাউন্ড, টি. এস. এলিয়টের কবিতা প্রকাশের পর আধুনিক কবিতার রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র ভাব মন্ডলের মধ্যে থেকেও মোহিতলালের বলিষ্ঠ ভোগবাদ, যতীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যপীড়িত দুঃখবাদ, নজরুলের বিদ্রোহ-বানীতে আধুনিকতার সুর প্রতিধ্বনিত, রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যে-ভাষাও ছন্দে, গদ্য ও পদ্যে একটা নতুন রূপ ফুটে উঠলো। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' - কে আশ্রয় করে আধুনিক মর্জির কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী'—একই বছরে প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো তিরিশে। বিশ্ব কবিতার সম্বন্ধে যারা খবর রাখতেন উনিশশো তিরিশ সাল থেকেই তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে বুদ্ধদেব অজিত, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য ইত্যাদি কবিদের দল ইংরেজী কবিতার দিক্‌ পরিবর্তনের ধারাকে কেন্দ্র করেই বাংলা কবিতার মর্জি বদলের দিশারী হয়ে উঠবেন। পাশ্চাত্যের নতুন ভাব ও ব্যঞ্জনায় বিষ্ণু দে থেকে সুরু করে সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী নীরেন চক্রবর্তী, সুনীল, শক্তি, মনীন্দ্র ও রামবসুর দল আবার নতুনতর ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করছে। এই যে বারবার আধুনিক কবিতার পালা বদল ছন্দ-অলঙ্কার-চিত্রকল্প-ভাব-ভাষার নবতর ব্যঞ্জনার নিত্য নূতন প্রকাশ ভঙ্গী এ সমস্ত কিছুর পিছনে —একটি ধারা চিরকালই সজাগ থেকেছে, এইসব কবিদের মানস চিন্তাকে সজীব ও সরস করে রেখেছিল তা হচ্ছে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান গুলি। তাই সেখানে হিজল আর জারুলের বনে বনে বুলবুলির খেলা দেখেছেন কবি। হেমন্তের ঘ্রাণ ওঠা মাঠকে সে গর্ভবতী জননীর মতো দেখে। কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষরকে গুণীনের বানের মতো মনে হয়। বন্যার সোনার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী সাপ সে দেখে, জোনাকীর ছায়াগুলি পরীদের মতো মনে হয়। গাঙে স্রোত, ভাটিয়ালি কীর্তন-দেউল-মুর্সীদ্যার দিকে কবির মন ছুটে যায়, সবুজ পানার ডোবার কচুরীপানার ফুলকে কবি দেখেন সুন্দর। পাতাল থেকে উঠে আসা শতশত ডাইনীর মারণ বাণের কথা কবিরমনে পড়ে যায়। কবির কাছে প্রেমের মতো ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে বাড়ীটাও যেন প্রেতের পা হয়ে যায় সব জড়িয়ে এক অসাধারণ লৌকিক জগতে সকলের উত্তরণ সকলেই যেন খুঁজে পায় এই নাগরিক জীবন চর্যার মাঝখানে নিজেকে অর্থাৎ মূলের গভীরে নিজেদের অন্তরাত্মার শেকড়টিকে। কবি রামবসুর ভাষায় সেই লোকায়ত আরণ্যক আদিম আকূতি প্রকাশ ঃ এই তো চেয়েছি/আলিঙ্গনের উষ্ণতায় জড়িয়ে ধরতে শরীর/অরণ্যের আদিমতায় নগ্ন করে দিতে বজ্রের উল্লাস / পাহাড়ের রুক্ষমুখে মাখিয়ে দিতে সূর্যাস্তের ফাগ / মাটি থেকে সুপ্ত বীজের মুখখানি তুলে ধরতে হাওয়ার অসীম / (আমি সাক্ষ্যদিই)।

ওপার বাংলার কবিদের কাব্যে যে লোকায়ত বাংলার নিসর্গ জগৎ ও মানব প্রকৃতি বারবার নানারূপে দেখা দিয়েছে। মাটি-জল-আকাশ-বাতাস-শস্যক্ষেত-কর্মরত মানুষের দল সব নিয়েই তো জন্মভূমি। তাই কবি যখন বলেন

এ আমার জন্মভূমি। এই নদী গতির প্রতীক। / দুই ধারে শস্য ক্ষেত। পদ্ম-শপলা কলমির বন। / সেখানে বেঁধেছে বাসা ধানবনে কোড়াল কোড়ালী। / এ আমার জন্মভূমি। যুগ যুগ সাধনার ধন। / দুই তীরে জন স্রোত। কামার কুমোর খেত চাষী— ' কর্মের প্রবাহে মগ্ন। / (আশরফ সিদ্দিকী ঃ 'ঝড় তুফানে', কবিতা 'জন্মভূমি') কবি দেখেছেন আট পৌরে শাড়ী পড়া ঘরে ঘরে আছে তো কল্যানী, এই বট এই প্রাচীন অশ্বত্থ, আম-জাম-সুপারীস্নেহ সব কিছুকে নিয়েই লোকায়ত বাংলার লোকজীবন। তাই কবি 'সাত ভাই চম্পা'র রূপকের রূপকথার বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর সত্যকে তুলে ধরেন। সেখানে দুর্যোধনের দল, মা-বোনের সম্ভ্রম নিচ্ছে কেড়ে, কুচক্রীদের চক্রজালে মানুষের দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকে না। কবি তাই সাত ভাই চম্পাকে ঘুম থেকে ডাক দিয়েছেন, দেশের সোনার ছেলেদের জাগরণে উদ্বেল করতে চেয়েছেন—

সাত ভাই চম্পা জাগোরে ! / —কেন বোন পারুল ডাকোরে !! / ডাকছি—ডাকছি কেন শোনো ! / কেন যে ডাকছি ভাই—শোনো ! / দুয়ারে দাঁড়ায়ে দেখো দুষ্ট দুর্যোধন / সে আমায় টানছে দেখো লজ্জার বসন্ ! /

সাত ভাই চম্পা জাগোরে···

কেন যে ডাকছি ভাই শোনো— । মা আমার দুঃখী বড় দুঃখে কাটে কাল, / তাকে নিয়ে চক্রীদের চলছে চক্রজাল। / সোনায় রূপায়, / তাকে তারা বেচে দিতে চায় ! / ইজ্জত সম্ভ্রম রেখে পথে চলা দায়। / নগরে নগরপাল কেবল ঘুমায়।

তাই ডাকি—জাগোরে—জাগোরে— / সাত ভাই চম্পারা কোথা আছ সব / জাগো রে—জাগোরে— /

দেশের সোনার ছেলে যারা আছে ঘুমে / ডাকোরে ডাকোরে— /

সাত ভাই চম্পা জাগোরে··· /

—কবি সে প্রাচীনই হোক্ আর আধুনিকই হোক—মধ্যযুগীয়ই হোন্ আর সমকালীনই হোন্—তিনি সর্বদাই মাটির শেকড়ে নিজেকে খোঁজবার চেষ্টা করেন। কর্ষিত জমির শস্যে পলিমাটির সৌরভে, তারা সর্বদাই খোঁজবার চেষ্টা করেন নিজেদের অস্তিত্বকে, নিজেদের স্বরূপচিহ্নকে। তাই কবি যখন বলেন—

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি ।
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল।
তিনি অতি ক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন

পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন,
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।

* * *

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।

[আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি']

আবার বাংলা দেশের পরিচিত প্রাণী সাপকে বিষ তোলার জন্য মন্ত্র বলার ছন্দে রচিত আশরাফ সিদ্দিকীর 'সাপের মন্ত্র' কবিতায়—

'কু সডডীপের মাঝ আছে সুধা তরঙ্গিনী
রিনিঝিনি বত্রপানি ভেটিয়া উজানী //
তার মধ্যে বাঁশ ঝাড়টি তিন ঠাঁঞে তার বাঙকা /
ছিরকাল বৈসে তাই কুঁকুড়িয়া কাঙখা' //

* * *

আয়রে আয় সাপের দল সার বেঁধে আয়
আদার পাদার থেকে দল বেধে আয়
অঙ্গলা-জঙ্গলা থেকে দঙগল বেধে আয়···
আমার সুখের ঘরে যে জ্বালে আগুন
খা—খা—খা—।
তারে তুই খা ॥

* * *

'জীয়ক কুণ্ডের মাঝে কৈ মাছ ঝিকিমিকি করে /
ডাহুকার যৌরী তারা ঘটে পানি ভরে //
পানি ধরে পানি ভবে পানি করে সার'····

* * *

দেরী নয় আর—
মনসা দেবীর আজ্ঞা—যা —যা—যা—
আমার গুরুর মন্ত্র যা—যা—যা—
আমার সোনার ধানে যারা ঢালে বিষ—
খা—খা—খা—।
তারে তুই খা ॥

লোকায়ত বাংলার চিরকালের সজীব কাব্যের নাম ছাড়া—একান্তভাবে লোকজনের আবেগমথিত প্রতিদিনকার কাব্য। বাংলাদেশের কবিরা লৌকিক ছড়ার আঙ্গিকে লোকজীবনের প্রতিদিনকার চলমান জীবন থেকে ভাষা, চিত্রকল্প আহরণ করে চলেছেন। কবি মহ হারুল ইসলামের 'দুঃসময়ের ছড়া' কাব্যগ্রন্থে—

বায়না পেলাম লিখতে হবে / বিশেষ সংখ্যা দৈনিকে / কান কেটেছে লেংটি ইঁদুর /

মান লুটেছে সৈনিকে / রাজ পেয়াদা মারছে তুড়ি / সুরসুরি দেয় ডাইনী বুড়ি / কশাই খানায় দুহাত শানায় / বাংলাদেশী চৌনিকে। / [সম্পাদক সমীপেষু]

আর একটি কবিতায়—

মাচায় উঠে / খাঁচায় উঠে / বাঁচার কথা কেবল ভাবি, /

*   *   *

ডাইনে বামে / শহর গ্রামে / সকল মানুষ খাচ্ছে খাবি। /

*   *   *

খাবি খেয়ে পেট ভরে না / উপায় আছে কি ? / উড়কি পোকায় মুড়কি ভাজে / খবর পেয়েছি। /

*   *   *

ভরাও জঠোর সেই খবর / কাহার কাছে কি কববে ? / —কপাল পুরেছি। /

[মুড়কির খবর]

এপার বাংলার কবি কেবল ছড়ার জগতে আবদ্ধ না থেকে ওপার বাংলার লোকায়ত জীবনকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেন স্বপ্নের স্মৃতিতে শৈশবের স্বদেশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কবি বলে উঠেন—

হঠাৎ ঝড়ের বেগে। পঙ্গপাল ছড়ালে আকাশে / কেঁপে ওঠে আমার স্বপ্নের স্মৃতি শৈশব স্বদেশ।

*   *   *

সন্ধ্যার প্রদীপ দেখ ভেসে যায় তীব্র জলস্রোতে।

*   *   *

অশ্রুমতী বাংলাদেশ / গঙ্গা পদ্মা কালিন্দীর জলে। / তবুও বর্গীর দল হানা দেয় সোনার কুটীরে / দুরন্ত ঘোড়ার খুরে ছিটকে পড়ে নীল অগ্নিকনা / বিদ্যুতে আকাশ ফাটে / অন্ধকার গাঢ়তর হয় / এ কোন আঁধারে আজো ঢেকে আছে / গঙ্গামাটি / শুভ্র বাংলাদেশে।

শিবেন চট্টোপাধ্যায় ঃ সূর্য পতনের দৃশ্য

—কবির কাছে রক্তাক্ত, লাঞ্ছিত গোটা বাংলা দেশই কপালে ত্রিশূলে ফোঁড়া, রক্তনেত্র গাজন ভৈরবী রূপে চিহ্নিত হয়েছে। একেবারে লোকায়ত বাংলার গাজনের সন্ন্যাসিনীর চিত্রকল্পে সমস্ত বাংলাদেশের রূপটি ধরা পড়েছে। সেখানে কবি লোকায়ত অনুসন্ধানে বলেছেন—

গঙ্গামাটি বাংলাদেশ / কপালে ত্রিশূলে ফুঁড়ে রক্তনেত্র / গাজন ভৈরবী। /

[ঐ]

—তাই এপার বাংলার কবি জননী আর মাতৃভাষা যে নাড়ীর বন্ধন তার কথা বলতে গিয়ে বলে ওঠেন—

কে, ছিঁড়ে নিতে পারে কে জননীর নাড়ীর বাঁধন নাভিমূলে জন্মসূত্রে
মা-জননী মাতৃভাষা একই রক্তে স্রোতে বহমান পদ্মা-মেঘনা-গঙ্গা

একালের আধুনিক কাব্য-ছড়ায় লৌকিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের বিশিষ্ট নিদর্শন নিম্নলিখিত ছড়াটি—

মা কী মজা আমি যদি হয়ে যাই ছড়া
ব্যাঙমা কুটুমপাখী চোখ ছানাবড়া।
কাজী পাড়া হাটখোলা কাঠবেড়ালী
চুল টানা বিবিআনা খ্যাঁকশেয়ালী।
টুনটুনি বালুডাঙা বুদ্ধু ভূতুম
আমলকি কামরাঙা কাটুমকুটুম।

আমপাতা জোড়া জোড়া উল্টোমটাশ
হুলোমুখো হ্যাংলা কুমড়োপটাশ
কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ
দুঃখীরাম বনটিয়ে বুড়ো ঠানদি
আগডুম বাগডুম বাঘবন্দী।

জল পড়ে পাতা নড়ে ফিঙে দেয় দোল
ছড়া হওয়া কী মজা আবোল তাবোল
আমি যদি ছড়া হই তুমি ভবে মা
ছড়াদেরো মামণি কিছু ভেবো না॥

(আমি যদি ছড়া হই / তুষার চট্টোপাধ্যায়)

সন্তানের কণ্ঠস্বরে বর্ণ-পরিচয়ের প্রথম শৈশব পাঠ—
রক্ত কণিকায় পরায় জননী গর্ভে দাবী ভালোবাসা স্বাধিকার।

নীরেন্দু হাজরা : আত্মার করতলে সূর্য প্রতীক্ষা

তাই লোকায়ত ছড়ার ছন্দে এপার বঙ্গের কবি বঙ্গ ভঙ্গের বেদনাকে ছোট্ট করে সত্য করে বলেন—

মরালী রে উড়ালি পাঙখা বঁধুয়া রে ভাঙিলি শাঙখা /
খেলুড়ে রে ছাড়িলি সঙ্গ বাঙালি রে ভাঙিলি বঙ্গ।

পঙ্কজ সাহা : আপন ঝাপন

এই বেদনাকেই সান্ত্বনার ছড়ার প্রলেপে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন কবি –

আমরা যেন বাঙলা দেশের চোখের দুটি তারা মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে / থাকুক গো পাহারা। দুয়ারে খিল, টান মেরে তাই খুলে দিলেম জানলা ওপারে যে বাঙলাদেশ এ পারেও সেই বাঙলা। / (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

আল মাহমুদের কবিতায় বারবার এসেছে সোনালী বাংলার লোকায়ত জীবনচর্যার

স্পর্শ। তিনি পদ্মা-মেঘনার তীর ধরে ধরে হেঁটে গেছেন, দেখেছেন পাখীর ঝাঁক, দেখেছেন মেঘনাপাড়ে কৃষাণের দল আর নারীদের—যারা শস্যের মাঠে বীজ ছড়ায়। এই লোকায়ত বাংলার স্তরে স্তরে বাঁধা পড়ে আছে কবির মন, তাই সেখানে স্মৃতির রোমন্থনে রূপসী বাংলার লোকায়ত রূপ সহজ ভাষায় প্রকাশিত হয়ঃ

> তারপর কতকাল হল, আমি বাংলাদেশের প্রতিটি নদীতে সাঁতার কেটেছি /
> কত তরঙ্গ আমার চোখকে ধুয়ে দিয়ে গেছে। আমি পান করেছি সবুজের
> সরবত। লাফিয়ে পার হয়েছি বাতাসের বেড়া।

[সিকান্দার আবু জাফর স্মরণে]

এপার বাংলার কবি তরুণ সান্যালের 'স্বদেশে বিদেশী' কবিতায় সেই শিকড় গভীরে হারানো মানিকের সন্ধান, যেখানে ঝাউতলা ঘাটে কালো চোখে কবি দেখেছে আলো। তাই কবির মন সেখানকার মাটির গভীরে বাঁধা পড়ে আছে। তাঁর কাছে সেই দেশ 'নাড়ীর পোঁতা মাটি টেনেছে মন'—কারণ তিনি মনে করেন, মাটি ছাড়া যেমন চাষী হয় না, নদী ছাড়া যেমন মাঝির সন্ধান মেলে না ; তেমনি মাটির সন্ধানও মেলে না। তাই কবির মন বলে ওঠে, পড়েছি অনেক বুঝেছি খানিক / মানুষ সেও তো মাটিরই গাছ / শিকড় গভীরে হারানো মানিক আকাশে উড়ালে। পাতার নাচ।— তার কারণ কবি মনে করেন শিকড়ের উৎসেই থাকে জীবন রসের আকর। সেখান থেকে লোকসংস্কৃতি তার প্রাণরস সন্ধান করে। এপার বাংলার কবিদের কাছে বারবার তাই আকাশ-মাটি-মানুষ- সমুদ্র সব একাকার হয়ে গেছে কেবল দেশ হারানোর বেদনাতেই নয় একটি আরণ্যক আদিম পৃথিবীর সঞ্চিত রহস্যময় আকর্ষণের আকুতিতেও। একথা আমাদের কাছেও উপলব্ধির সত্যরূপে প্রতিভাত হয় যখন রামবসু বলেন – স্বপ্নের দর্পণে মুখ দ্যাখো / আকাশের ভিতরে আকাশ মাটির ভিতরে মাটি / মানুষের ভিতরে মানুষ / বুক ভরে নাও সমুদ্রের আদিম স্তোত্রে —(দুটি কাব্য নাটক ও কিছু কবিতা)। আসলে আমরা ছিন্নমূল—মূলের সঙ্গে সম্পর্ক চাই, তীরের সঙ্গে তরী বাঁধতে চাই—কিন্তু পারি না। মানুষ স্বভাবতই চঞ্চল, অস্থির, একসূত্রে সে গ্রথিত চায় না। অথচ আমাকে সম্পর্ক রাখতে হবেই কারণ বাঁচার মূল কথাই হোল নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একটি নিবিড় যোগসূত্রে নিজেকে গ্রথিত করা—আর তা সম্ভব হতে পারে লোকসংস্কৃতির গভীরে নিজের মানস-শিকড়টুকু চালিয়ে দিয়ে প্রতিদিন রস সংগ্রহ করা—পল্লবে-পুষ্পে-ফলে নিজেকে প্রতিদিন পরিপূর্ণ করা। তাই কবির ভাষায় সাঁকো আমাকে বাঁধাতেই হবে—তীর অর্থাৎ মাটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখতেই হবে। সামসুর রহমনের কবিতায় এরই একটি অসাধারণ চিত্রকল্পময় প্রকাশ—

> "বাঁধতে পারিনি কোনো সাঁকো,
> অথচ আমার আশে পাশে
> সাঁকো নেই বলে আমি মূক হয়ে থাকি,

নিজেকেই প্রিয়-সম্ভাষণে করি প্রীত, নিজের হাতেই
হাত রাখি। কিন্তু শুধু আয়নায় নিজের মুখ দেখে
নিজের সঙ্গেই মেতে কথোপকথনে
নিজেকে আদর করে চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে সকল সময়
থাকাদায়। অন্য কারো হাত
ছোঁয়া চাই, শোনা চাই অন্য কারো স্বর—
মানে সাঁকো থাকা চাই।"

ওপার বাংলার কবিরাও তাই আজও সেই বহতা ধারায় স্বপ্ন দেখেন—রাজকন্যা বসে আছে- / ডুবে টানা কাপড়েতে সোনালী জরির হাঁসি, / আঙিনাতে পাটী পাতা, / পিদীপ জ্বালাবে বলে সেঁজুতির ব্রতে, / ভাসাবে মান্দার ভেলা / বয়ে যাওয়া নদীস্রোতে। /

আর এপার বাংলার কবি আম ও নারিকেল গাছে ঘেরা পুকুরের স্থির জলে আকাশ একাই দেখছে মুখ, আর এক অপার্থিব আলো-অন্ধকার কবির রক্তের মধ্যে কেবল বিষের দাঁত ডুবিয়ে দিয়ে চুঁয়ে নিচ্ছে সব। কবির যাবার ইচ্ছে সেই পূর্বপুরুষের গ্রামে। সেখানে আছে তার হারানো শেকড়, যার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলে তবেই তাঁর নিজস্ব উত্তরাধিকারের স্বকীয়তায় খুঁজে পাবে নিজেকে। যেতে চাচ্ছি কিন্তু যেতে পাচ্ছি কই। নিজে আপন রক্তের গভীরে বারবার কবি এ আশংকা এবং সন্দেহের মধ্য দিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন সত্তার গভীরে, লোকায়ত সংস্কৃতির গভীর চেতনায়। শঙ্কায়, দোদুল্যমানতায়, সন্দেহে কবি বলে ওঠেন—

চলে যাবো চলে যাই, সেকি সত্যি যাওয়া হবে, নাকি
সত্যিই সহসা এমনি হবে ?
এবং আমার কোনো পূর্বপুরুষের মতো ধুতি-উত্তরীয়ে
মন্দিরের দাওয়া কিংবা পিপুলের বাঁধানো চাতালে
বসে দেখবো দূরে গ্রাম ছুঁয়ে জবাকুসুমসংকাশ।
সে কি সত্যি হতে পারে ? হয় নাকি ?
(নিতান্ত পুঁথির টানে : তরুণ সান্যাল)

এই জন্যই কি কবি নতজানু হয়ে রাত্রির কাছে প্রার্থনা করে বলেন—"এবার তোমার অবারিত হৃদয় হোক আমার আবরণ" তাই কি তিনি মৃত্যুহীন স্তব্ধ জলধারায় প্রাণের আগুনকে দেখেন সুতল শূন্যতায়। তাই তিনি ফসলের স্রষ্টা আদি উর্বরতার উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন—

অশ্বত্থ পাতার শিরা-উপশিরার মতো পৃথিবীর পথে পথে ভাঁজে ভাঁজে
সেই ঐশ্বর্য ছড়াও যার রেণুকণা মেখে স্বাধীন মানুষ হয় পূর্ণ, স্বয়ম্ভর
কোয়েলের পাড়ে সোনা-খোঁজা আমি বালি খুঁড়ে জল ভরে নিই তুম্বায়।
(দুটি কাব্য নাটক ও কিছু কবিতা : রাম বসু)

আধুনিক কবিতা শুধু ভাবের জগতে নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও লোক ভাষাকে গ্রহণ করেছে বারবার। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র সকলেই ছড়ার লোকভাষাকে ব্যবহার করেছেন তাদের কাব্যের দেহ নির্মাণে এবং আঙ্গিক সৃজনে। রবীন্দ্রনাথ 'এতো বড় রঙ্গ যাদু এতো বড় রঙ্গ'—এই ছড়ার পংক্তিটি নিয়ে বিরাট একটা কবিতাই রচনা করে ফেলেছেন। আর অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর একটি ছড়ার নামকরণই করেছেন 'উড়কি ধানের মুড়কি'। সাম্প্রতিক কালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছড়ার ভাষায় কবিতা লিখেছেন--আউলে বাউলে চারজন / চারজন হয় আটজন / আট জন হয় ছয়জন, / আউলে বাউলে কয়জন ? / কেন্দুবিল্ব গ্রামে / বাউলের এক নামে, / তুষ্ট হয় না কেহ। / এলে ঘোচে সন্দেহ ॥ /

অতি সাম্প্রতিক কালের কবিরাও যেমন প্রণব মুখোপাধ্যায় ছেলেদের জন্য ছড়া রচনা করেছেন লৌকিক ছড়ার লাইন ধরে--মণ্ডা মিঠাই লুচির শেষে / একটি খিলি পান / শিব ঠাকুরের বিয়ের রাতে / তিন কন্যা দান। পঙ্কজ সাহা লৌকিক ছড়ার ভাষায় মজার ছড়া রচনা করেন—বৃষ্টি এলো ঝেঁপে / ধান দিইনি মেপে / তাই বৃষ্টি থেমে / আবার এলো নেমে। / বৃষ্টির তিন কন্যে / গায়ে হলুদের জন্যে / হাত করলো চিৎ / রোদ্দুরেরই জিৎ। অমিতাভ চৌধুরী ছড়া লিখলেন রবীন্দ্রনাথের ওপর লৌকিক ছড়ার ভাষায়--আকুড় বাকুড় চালতা বাকুড় / মাসটি এখন রবি ঠাকুর। / নাচছে শহর নাচছে গ্রাম / বাজছে কাঁসর বাজছে ড্রাম— / ধা-কুড় কুড় ধাকুড় ধাকুড়। / দুই কানে, আজ লাগলো তালা / পালা সবাই দৌড়ে পালা— / কলকাতা নয়, চলরে পাকুড় / আকুড় বাকুড় চালতা বাকুড়। /

এই ভাবেই গড়ে উঠেছে আধুনিক বাংলা কাব্যের লোকায়ত ঐতিহ্যের ধারা।

॥ সূচনা ॥

উনবিংশশতকে লৌকিক কাব্যের ঐতিহ্য

মধ্যযুগে বাংলাদেশে দু' ধরনের কাব্যধারা প্রচলিত ছিল। (১) লিখিত কাব্যের ধারা (২) অলিখিত মৌখিক কাব্যের ধারা। বাংলায় বহুকাল আগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি, ছড়া, গীতিকা, ধাঁধা ইত্যাদি অলিখিত লোক কাব্যের ধারা লোক মানসে মৌখিক ভাবে প্রচলিত ছিল। বাংলার কৃষক গান গেয়ে ধান কাটতো, কৃষক পত্নী নবান্নের সময় ছড়া সুর করে আবৃত্তি করতো। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছড়া রচনা করে, ছড়া আবৃত্তি করে, ধাঁধা রচনা করে নিজেদের মুহূর্তগুলি আনন্দে ভরিয়ে তুলতো। মাঝি গান গেয়ে, উদ্দাম নদ-নদীগুলিতে নৌকা বেয়ে যেতো। বহু লোকশ্রুতি মূলক কাহিনী গানের সুরে ছন্দ বদ্ধ ভাবে লোক সাধারণের সামনে পরিবেশন করা হোত। অপর দিকে বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য, শাক্ত পদাবলীর মধ্যে লিখিত সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত ছিল। মধ্যযুগে লিখিত সাহিত্যের দুটি ধারাই প্রধানত সক্রিয় ছিল। (১) আখ্যান কাব্যের ধারা (২) গীতি কাব্যের ধারা। একদিকে মনসা, চন্ডী, ধর্ম, অন্নদা মঙ্গলের—মঙ্গল কাব্যের ধারা, অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলীর গীতিধারা। মঙ্গল কাব্য ও পদাবলী ধারা প্রায় চারশত বছর ধরে অগ্রসর হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়লো অষ্টাদশ শতকে এসে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিপ্রেম ক্রমশঃ সমাজ জীবনে তার জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এসেই বৈষ্ণব পদাবলী মন্থর গতি হয়ে পড়লো। মঙ্গলকাব্যও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের মধ্যে তার অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করে নির্বাণ লাভ করলো। এতৎ সত্ত্বেও যে বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গল কাব্য দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গালীর রসলোক অধিকার করেছিলো—তার সংস্কার সম্পূর্ণভাবে তার মধ্য থেকে দূর হয়ে যেতে পারলো না। বৈষ্ণব মহাজন কবিদের আশ্রয় পরিত্যাগ করে ভক্তি ভাবনাহীন বৈষ্ণব পদাবলী জনসাধারণের কাছে সুলভ গীতি কাব্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের আদর্শ ও সম্প্রদায়গত যে পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল, উভয়ের আদর্শ চ্যুতির জন্য উভয়ের মধ্য থেকেই তা দূরে হয়ে গেল এবং পরস্পরের মধ্যে একটি ক্ষীণতম যোগসূত্র সন্ধান করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল ; এরই ফলে মঙ্গল কাব্যের বিষয়, বৈষ্ণব পদাবলীর রূপাকৃতিতে একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। যে বিষয় কেবল আখ্যান কাব্যের অন্তর্গত ছিল তাই শাক্ত পদাবলীতে গীতিকাব্যের আকারে প্রকাশলাভ করলো। এই শাক্ত পদাবলীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট তাত্ত্বিক চেতনা অনুপ্রবিষ্ট থাকলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে তা একটা আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জীবনস্বরূপে রূপ পরিগ্রহ করলো।

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী—এই বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে দুটি বিশিষ্ট লৌকিক রূপ লাভ করছিলো—একটি পাঁচালী আর একটি কবিগান। পাঁচালী প্রকৃত পক্ষে সংক্ষিপ্ত ও সরলীকৃত মঙ্গল গান ও কবি গান হচ্ছে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর লৌকিক রূপ। মধ্যযুগের অবসানে এবং আধুনিক যুগের সূচনার মধ্যে বাংলা সাহিত্য লোকে যে অনিশ্চয়তার যুগ দেখা গিয়েছিল সেখানে পাঁচালী, টপ্পা, কবিগান, তর্জা প্রভৃতি নাগরিক জনপ্রিয় লৌকিক ধারার কাব্যগুলি তা সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে নিয়েছিল। সুতরাং বলা যায় একদিকে যেমন মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্য লৌকিক উপাদান সমূহকে ধারণ করে মঙ্গল, বৈষ্ণব, শাক্ত কাব্যের ধারা দেখা গিয়েছিল, ঠিক তেমনি এরই সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল আর এক ধরনের লোক জনপ্রিয় সহজ লিখিত পাঁচালী, কবিগান ও কথকতার ধারা—আবার তারই পাশাপাশি মৌখিক সাহিত্য ধারার মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতির স্তরে স্তরে এক ধরনের লৌকিক পাঁচালী ও কবিগান, তর্জা ইত্যাদি প্রচলিত ছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কাব্য জীবনের ধারায় কবিগান পাঁচালী তর্জা, টপ্পা ইত্যাদির প্রবর্তন লিখিত ও অলিখিত কাব্য ধারার মিলিত প্রয়াস। মৌখিক লোকসাহিত্য ধারার সঙ্গে লিখিত সাহিত্যধারার পরস্পর সম্মেলনের এবং একত্রীকরণের একটা যুগ্ম প্রচেষ্টা সেদিন কলকাতার নাগরিক জীবনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছলো।

এক ॥ কবিগান

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে সুরু হয়ে প্রথমার্ধ পর্যন্ত কবিওয়ালা নামক এক শ্রেণীর গীতি সঙ্গীত ব্যবসায়ী বাংলার জনসাধারণের কৌতূহল আকর্ষণ করেছিলো সেগুলিই কবিগান বা কবিওয়ালার গানরূপে প্রচলিত ছিল। এই ধারা ক্ষীণতম হয়ে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছিল। কবিগান বিশেষ কোন কবিওয়ালা স্বয়ং রচনা করে থাকে—কিন্তু অবয়ব রচনায় প্রভৃতে লৌকিক আঙ্গিক ও রূপকের আরোপ দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় লীলা কাহিনীগুলি স্বর্গীয়তার পবিত্র বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে তার পরিবর্তে পার্থিব রস ও রুচিদ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেছিলো। ঊনবিংশ শতকে কলকাতার সমাজ জীবনে কবিওয়ালাদের পূর্ব থেকেই কিছু কবিগান ও কবির দল বাংলার গ্রাম্য জীবনে দল রচনা করে সুর করে গান গেয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতো। এগুলির মধ্যে সরল গ্রাম্য জীবন ও মানসিকতার পরিচয় মেলে। দু-একটি সংগৃহীত প্রাচীন কবিগান উদ্ধৃত করলে তা স্পষ্ট হবে এবং দেখা যাবে এই সব কবিগানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বকে কত লৌকিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলি প্রকাশ ভঙ্গি, ভাষা ব্যবহার ও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে লোকায়ত জীবন ধারাকেই অনুসরণ করেছে। যথা ঃ

সুবলকে কয় আনতে রাধা, কৃষ্ণ দয়াময়,
আনতে শ্রীরাধায় দ্রুতগতি সুবল ধায়,
উপনীত আয়ানের আলয়।

করে ভানুজার বেশ ভাজারে,
ভানুজার বেশ ধারণ করে অন্তপুরে রয়।
দেখে কুটিলা তাই কয়—
আজ কেন বউ, কেমন কেমন কোনদিন দেখিনা এমন।
আজ কেন বউ ঢেকে বদন ধারা মনে রয়।
কুটিলা তাই তেড়ে গিয়ে আয়ানরে কয়—
আর দাদা, তুই দেখলে এসে কি সর্বনাশ ঘটেছে।
বড় দাদা তুই দেখে যারে বড় কেন আজ এমন করে
রান্না ঘরে কান্না জুড়েছে।
উলটায়ে চড়ায়ে হাঁড়ি উনানে দেয় ভিজে খাড়ি
হলুদ পিসতে আঙুল পিসে—এতো আমাদের বৌ নয়
খনেক খনেক মনে বলে, বউ গেছে যমুনার জলে—
চলে বুঝি কোন রাখালে বউরাণী সাজ সেজেছে।
হয় কি না হয় দেখলে. দাদা, কি জাদু ঘটেছে।
কেন বদন ঢেকে রোদন করে কয়না কথা চায়না ফিরে
অন্তরে কি দুখ দেখা যায় না রে বৌয়ের মুখ।

রাঁধিতে রাঁধিতে কাঁদিতে কাঁদিতে অম্বললতা দেয় সুম্ভানিতে
দিচ্ছে জবাল দুধের সাথে সে বড় কৌতুক
কেউ বলে ঐ দোষের সৃষ্টি হলে ঐ রূপ হয়
কেউ বলে, তোদের বৌয়ের উপরি বাতাস লেগেছে।
দাদা গো বল ও বড় দাদা, বৌ কেন আজ এমন হলো।
আমরা ত ব্রজবাসী, রাখলে বেশ ভালবাসি
কাঁদতে বৌ দিবানিশি রাশি রাশি বসন ভেজালে ॥

(কবিগান ছড়া—মুর্শিদাবাদ)

মধ্যযুগে বহু কবির ছড়া রচিত হয়েছে যার মধ্যে লৌকিক মনোভাবের পরিচয় মেলে। সেখানে পুরাণ থেকে সুরু করে সমসাময়িক সমস্ত বস্তুই কবির ছড়ার বিষয় হয়ে উঠেছে। বাংলার গ্রাম থেকে সংগৃহীত দু-একটি কবির ছড়া উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। যথা—

(১) কলিযুগের মহিমা প্রচারে কবিগান :

অন্যমুখে যত শোন রেডিও আর গ্রামোফোন
বিনা তারে জগদীশ বোস টেলিগ্রাম চালায়
স্পুটনিক যন্ত্র বিপুল যন্ত্র মাইন যন্ত্র আর তারের তন্ত্র
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর কি হয় ॥

বন্দুক বোমা কামান গুলি কলিকালে এ সকলি
ক্রমে ক্রমে হলো আবিষ্কার,
রেল জাহাজ আর কলকারখানা বাংলার খবর বিলাত জানা
পাঁচ মিনিট জানা ছিল কার ॥

(নদীয়া)

তারপর অষ্টাদশ শতকে গোঁজলা গুঁই নামে একজন কবিওয়ালার আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ তাঁর সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে কবিওয়ালার গানের সূচনা হয়। তাঁর একটি গানে তত্ত্ব বহির্ভূত নিছক প্রেমের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যথা এসো এসো চাঁদ বদনি / এ রসে নীরব করো না ধনি / তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, / তুমি কমলিনী আমি যে ভৃঙ্গ, / অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ, / তুমি আমার তায় রতনমণি ॥ / তোমাতে আমাতে একই কায়া, আমি দেহ প্রাণ, তুমি-লো ছায়া, / আমি মহাপ্রাণী তুমি-লো মায়া মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।

গোঁজলা গুঁইয়ের পর তাঁর পথ অনুসরণ করেছেন অগণিত কবিওয়ালা। বাংলার সর্বত্র নানা উৎসব পুজো পার্বণে এই কবিগান জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর পরবর্তী কালে বাংলাদেশে রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল, রজনী দাস, রাসু, নৃসিংহ প্রভৃতি কবি-বৃন্দ কবিগান রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতকের কবিওয়ালাদের মধ্যে হরু ঠাকুর অন্যতম। তার কবিগানেই প্রথম শব্দ মাধুর্য ও উচ্চ ভাবপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যথা :—

মহড়া—পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনী বলি তোমাকে।
শুনেছো কখনও জ্বলন্ত আগুনও
বসনে বান্ধনো করিয়া রাখে ॥

চিতেন—প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো. নয়নে না দেখে উদয়লেখে
দ্বিতীয়ের চাঁদো, বণ্ডিত প্রকাশ, তৃতীয়ের চাঁদো জগতো দেখে।

কিংবা—[সখী সংবাদ]

মহড়া—সখি রে রসেরো আলসে
গত দিবসেরো রজনী শেষে ॥
অচেতন হয়ে সুখো আবেশে।
শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে শ্যামেরে হারায়ে
কেঁদেছিলাম কত হুতাশে।

চিতেন- বিচ্ছেদো ওরে পরানো শিহরে
তাই বটে ছিল সই
অমনি সম্পান্বিত হৃদি, হেরে শ্যামনিধি,
হরে নিলে বিধি কি দোষে ॥

অন্তরা—রাই, অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা
বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম।
তব দরশন, আকাঙ্ক্ষা যে জন, তার প্রতি কেন হলে বাম॥
চিতেন কোন সখি কহে, হেথা থাকা নহে, এখনো অতি দুর্গতি
আনি সুশীতল বারি, কোন সহচরী বদনে দিতেছে হুতাশে।

এই গীত অষ্টাদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের বহুকাল পর্যন্ত বাংলার জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলো; এর নাম কবিগান। যারা কবিগান করতো তাদের বলা হতো কবিওয়ালা। অনেকে এদের যথার্থ কবি বলতে দ্বিধাবোধ করতো। কিন্তু তৎকালীন লোকসাধারণের মধ্যে এদের অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল বলে এদের কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। এদের প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য :—প্রথমতঃ এরা বাংলার পূর্ববর্তী কবি সম্প্রদায়ের কথা বৈষ্ণব ও শাক্তপদের অনুকরণ ও অনুসরণ করে কবিতা লিখতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

"তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিলাইয়া তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্যে সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘুস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার ও ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না তাহার মধ্যে লড়াই এবং হারজিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল।"

লোক সাধারণের রুচির প্রয়োজনে পূর্ববর্তী কবিদের অর্থাৎ বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিদের কাব্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল ও চটক মিশিয়ে ভাবরসের চেয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির তাগিদ এই সব কবিগানে দেখা গেছলো, দ্বিতীয়তঃ এইসব কবিদের এই কবিগান রচনার একটা অদ্ভুত তাৎক্ষণিক প্রতিভা ছিল তাবা যার দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারতো। এক দিকে শব্দ চাতুর্য অন্যদিকে তাৎক্ষণিক কাব্যসৃষ্টি এবং সমসাময়িক বিষয়বস্তু ও রঙ্গ-রসিকতার দিকে ঝোঁক এইসব কবিদের কাব্যগুলি জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

কবিগান তৎকালীন সমাজ জীবনের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। ভারতচন্দ্র অস্তমিত—রামপ্রসাদের কাল অতীত প্রায়। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে এক ধরণের অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহ পুষ্ট ও কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল হিসাবে এক শ্রেণীর ঐতিহ্যহীন জমিদার বা হঠাৎ বড়লোকের দল কলকাতা বা পল্লী অঞ্চলের আসর জাঁকিয়ে বসেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় :

"ইংরেজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজ সভা ছিল না, পরাতন আদর্শ ছিল না। তখনকার কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল?

তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলা বৈঠকে বসিয়া দুই দন্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"

কবিগানের তিনটি যুগবিভাগ—পত্তন যুগ, ঐশ্বর্য যুগ এবং অন্ত যুগ। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত হলো এই শ্রেণীর গীতি রচনার ঐশ্বর্য যুগ। ডঃ সুশীল কুমার দে গোঁজলা গুঁইকে আদি কবিওয়ালা বলেছেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে উনি জীবিত ছিলেন। গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য—রঘুনাথ দাস, লালু, নন্দলাল। এই তিনজনের শিষ্য রাসু, নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বণিক। হরু ঠাকুরের শিষ্য নীলু ও রাম প্রসাদ ঠাকুর আর ভোলা ময়রা। নিতাই বৈরাগীর শিষ্য রামানন্দ নন্দী, ভবানী বণিকের শিষ্য রাম বসু। রাসু থেকে আরম্ভ করে রাম বসু পর্যন্ত কবিগানের লেখকেরা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

কলকাতা শহরে ও শহরের বাইরে ধনী মানী ব্যক্তিগণ নিঃসন্দেহে এই নাগরিক লোক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, যেমন চিরকাল রাজা মহারাজা ও সামন্তগণ কবি ও সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। দোল-দুর্গোৎসব-রাস বারোয়ারি উপলক্ষে কলকাতা কেন, বাংলার সর্বত্র কবি গাওনা হত। লোক সাহিত্যের অন্যতম সংস্করণ বলেই লোক উৎসবে লোক সংস্কৃতিতে ও লোক প্রমোদানুষ্ঠানে এর স্থান হয়েছিল। আবার এই প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ এর অন্তর্ভুক্ত তরজা ও খেউর গান। নাগরিক জীবনে লোক সাহিত্য হলেও এই কবিগান কেবল লঘু সাহিত্যের নিদর্শন নয়। বরং এর মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারানুসরণ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি এর ভাব ও বিষয়ের বিস্তার ও রসের পূর্ণতাও পরিলক্ষিত হয়।

ঊনিশ শতকের কবিগান গুলিকে কেবল কবিতা না বলে এক ধরনের লোকগীতি পর্যায়ের গীতিই বলা যেতে পারে। কারণ কবিগানের আঙ্গিক গঠনে লোকগীতের রীতিই অনুসৃত হয়েছে। লোক সাধারণের সামনে আনন্দ পরিবেশন ও তৎক্ষণিক উত্তেজনা সৃষ্টি এই কবিগানগুলির প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবিগানের বিভিন্ন পর্যায়গুলি গীতের আকারেই রচিত এই পরিভাষাগুলি মূলতঃ লোক সংগীত শ্রেণীর। এই পর্যায়গুলি যথাক্রমে চিতান, পরচিতান, প্রথম ফুকা, মেলতা, মহড়া, দ্বিতীয়ফুকা, দ্বিতীয় মেলতা এবং অন্তরা ইত্যাদি। কবিগানের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রাম বসুর একটি আগমনী গান উদ্ধৃত করলে কবিগানের গঠন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা হবে। যথা ঃ

মহড়া— গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।
শিবকে পুজিবে বিল্বদলে, গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।
আগে সদয় হবেন সদানন্দ আসতে দিবেন বাবা তারাধন
এলো কার্তিক গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী
ভগবতী এলো মস্তকে করে।

খাদ— জামাই যদি আসেন এলো সমাদর করে।

ফুঁকা— শুনি পুরাণ চণ্ডীতে,
পূর্ব্বজন্মেতে উমা ছিল দক্ষের মেয়ে, প্রসূতির মেয়ে
শিব নিন্দা শুনে,
সে অভিমানে, প্রাণ ত্যাজিলেন দক্ষালয়ে

মেলতা— আমি সেইটে করি ভয়
ঝি জামাই আনতে হয়,
এলো কৈলাস বাসিনীসব নিমন্ত্রণ করে।

একচিতান— নিশি সুপ্রভাতে
শুভ ষষ্ঠীতে, শুভক্ষণ সময়।

ফুঁকা— কে কবে সশনা ষষ্ঠীর কল্পনা,
কল্পনা করলেন হিমালয়।
বলে পাষাণকে রাণী, সবিনয় রাণী
আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীর মেয়ে
আমি দেখেছি স্বপন। যেন উমাধন

মেলতা— আছে কন্যা-সন্তান যার দেখতে হয়, আনতে হয়
সদাই দয়াময় ভাবতে হয় হে অন্তরে ॥
অন্তরা করবো চণ্ডীর বোধন বিল্বমূলে
চণ্ডীগণ পোড়বে চণ্ডী পাব চণ্ডী, চণ্ডীর ফলে
ঘটে চণ্ডী পটে চণ্ডী, স্থলে মঙ্গলচণ্ডী
চণ্ডীর কল্যাণে।
পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল,
আসবেন মঙ্গলচণ্ডী সুমঙ্গলে ॥

২ চিতেন— কন্যার মায়াছলে, ত্রিজগৎ ভোলে
সুপাদ্য সকলে, দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায়
সদানন্দের মন ভুলালে।

ফুঁকা— শিবের নয়নের তারা ত্রৈলোক্য তারা
দুঃখ পসরা ত্রিনয়নী শিব মোহিনী
গৌরীর আজ্ঞাধারী শিব,
নামে তরে জীব
ভয় তারিণী ভবানী ॥

মেলতা— আমার এমন কি জামাই
জন্মে জন্মে যেন পাই
সদাই পূজা করি
আমার মানস অন্তরে ॥

উপরোক্ত কবিগানে খুব বেশী একটা ভাবের গভীরতা কিংবা উত্তম কাব্যকলার স্পর্শ না থাকলেও এই সব কবিওয়ালারা পুরাণ রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির সম্পর্কে লোক সাধারণের ধ্যান-ধারণাকে চলতি ভাষায় সহজ কথায়, ছন্দে গ্রথিত করেছেন বলে কবিগান সর্বস্তরের জনগণের হৃদয়স্পর্শ করেছিল। কবিগানের লেখক সম্প্রদায়, কাব্যের আভিজাত্যের ধার ধারতেন না। কিন্তু এইসব গানে লোকরঞ্জনের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এই কারণেই সে যুগের কবিওয়ালার দল তাদের কবিগান নিয়ে একেবারে পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। লেখক-গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে কোন দূরত্ব ছিল না। একদিকে পুরাণ-কাহিনীর লৌকিক প্রকাশ, অন্যদিকে নিছক মানবীয় প্রেমের আশা-নিরাশের প্রকাশে কবিগান লোক সাধারণের মনে একটি স্থায়ী আসন পেতে নিয়েছিল। রামবসুর একটি গীতে প্রেমের মর্মকথার সকরুণ বেদনাটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। যথা।

১। চিতান— পরের ভালবাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ।

১। পরচিতান-- কোন সুখ দেখি না শঠের প্রেমে দুঃখ বার মাস।

১। ফুঁকো— কেবল হাসায়, আর কাঁদায়, সদা প্রাণেতে জ্বালায়
আজ সে কোলে সিংহাসনে, কাল পথেতে বসায়।

১। মেলতা— পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই
হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর,
সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে।

মহড়া— তোমার প্রেম হতে প্রাণ
বিচ্ছেদ আমায় ভাল বেসেছে।
প্রেম হল ফুরাল, চোখে দেখতে দেখতে গেল,
অন্ধের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে।

খাদ— কলহ নির্বহ হয়ে সন্দেহ মিটেছে।

২। ফুঁকো— তোমার প্রেমে সঁপে প্রাণ, কেবল হল অপমান,
সুখ হবে কি বল দেখি সাধতে গেল প্রাণ।

২। মেলতা— এ সব সুখের চেয়ে আমার স্মৃতি ভাল হে,
সে সব সাধ সাধিব দায়ে প্রাণ বেঁধেছে।

কবিগানের ঐতিহ্য বঙ্গদেশের পক্ষে নূতন নয়। এর পূর্ববর্তী লোকগীতির মধ্যে কবিগানের উৎস সন্ধান করা যেতে পারে। বিশেষ করে লোকগীতি ঝুমুরের সঙ্গে কবি গানের বহু বিষয়বস্তুর বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আঙ্গিকের দিক থেকে ঐ সব লোকগীতির সঙ্গে কবিগানের মিল লক্ষ্য করা যায়। কবিগানের বিষয় ভাগ হচ্ছে বন্দনা, সখীসংবাদ, বিরহ, মাথুর, ভাবসম্মিলন ইত্যাদি। অন্যদিকেও আগমনী, সখীসংবাদ মাথুর, বিরহ ও বন্দনা ইত্যাদি। রামবসুর একটি সখী সংবাদে শ্রীরাধার প্রেমের জ্বালা ও কলঙ্কের কথা সপ্রমাণ করা হয় এভাবে—

মহড়া—　　পোড়া প্রেম করে তোর পোড়ায়
আমার জন্মটা গেলো।
যতদিন হয়েছে মিলন,
একদিন নাই তার কান্না বারণ,
পোড়া শিবের দশা যেমন,
তাই আমার হোল।
ভেবে ভেবে হৃদের মধু হৃদে শুখালো।
আর তো দৃষ্টি পোড়ায় পুড়তে পারি নে।
সোনার বর্ণ ছিলো, কালি হোল,
চোখের মাথা খেয়ে চেয়ে দেখিস নে॥
অনল নেবাসে নিবে না সদাই উঠে জ্বালিয়ে,
বুঝি তোমা হতে প্রেমের সাধ ফুরালো।

চিতেন—　　অনেকে তো অনেক পীরিত করে,
এমন দশা বলো কার।
কর্ম্ম ভোগের যেমন কপাল আমার
এমন খুঁজে মেলা ভার॥
অস্থি ভাজা হোলো প্রেমের দায়।
ভেবে তোর গুণাগুণ মনের আগুন,
জ্বলছে যেন রাবণেরই চিতাপ্রায়।
কেবল ঘরে দিলে দেখা করিস মুখ বাঁকা,
গিয়ে আর আর লোকের কাছে থাকিস তালে।

ঝুমুর গানে শ্রীরাধিকার অনুরাগে এই সুরেরই প্রতিধ্বনি—

একে নারী কুলবালা তাথে যৌবনের জ্বালা
আমি আপন দুঃখে থাকি,
বিধাতা করেছে যেমন পিঞ্জরার পোষা পাখী।
দারুণ বিরহ জ্বলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
তুষের অনল যেমন জ্বলে ধিকি ধিকি॥
প্রেম করে দুখ দিবে বলে না জানি সখী,
আমার কুল গেল কলঙ্ক হল বঁধুহে তোমার লাগি,
আমার শ্যামবধু চলে গেল কোন পথে॥　　(পুরুলিয়া)

আর একটি ঝুমুর গানে শ্রীরাধিকার অন্তর্বেদনা বিফল জীবনের নৈরাশ্য বিরহের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। যথা ঃ—

এল না সখী, এমন সময় কান্ত এল না,
শুন বলি সহচরী, কেন না আসিছেন হরি,
দুরন্ত কালে আমরা দিতেছি যাতনা।

আইল বসন্ত ফুটে ফুটন্ত,
ফুলের মধু ফুলে রইল ভ্রমর কেন এল না।
সখী কামবানে পঞ্চশরে বিঁধে তনু জরজরে ;
কত তে যাতনা মরমের বেদনা সে কি বুঝে না।
অধম বিনা দিনেই কানা কিছু ভাব ত জানে না গো।
মনের আশা মনেই রইল আমার হল না ভজনা, সখী ॥

(ঐ)

ঐ একই কথা ও ভাবের প্রতিধ্বনি শুনা যায় কবিগানে। রামবসুর একটি মাথুর পদে শ্রীরাধিকার বিরহ-বেদনা সুন্দরভাবে প্রকাশিত। যথা—

মহড়া— মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি
আব বলা হোল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না ॥
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জ রমণী বলে; হাসিতো লোকে।
সখি ঠিক থাক আমারে ধিক সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না ॥

চিতেন— একে আবার যৌবনকাল
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো ॥
যখন হাসি, হাসি সে আমি বলে।
সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নের জলে ॥
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে
মন চায় ধাবিতে
লজ্জা বলে ছি ছি কোরো না ॥

অন্তরা- তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম সজনি।
অনায়াসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি ॥
একি সখি হোল বিপরীত
রেখে লজ্জার সম্মান
মদন দহিছে এখন অবলার প্রাণ ॥
প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণে বাঁচা ভার।
লজ্জা পেয়ে লজ্জা বুঝি না রহে আমার।
কারে এ দুঃখরে সই
কত আর প্রাণে সহ
হল গো একি সখি যন্ত্রণা ॥

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবেই বলা চলে যে, লোক সঙ্গীতের পর্যায়ে ঝুমুর প্রভৃতি গানের মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছিল বিষয়বস্তু ও রীতির দিক থেকে সেই বৈচিত্র্যই দেখা গেল পরবর্তী যুগের অর্থাৎ উনিশশতকের কবিগান, পাঁচালী, তর্জা ইত্যাদি নাগরিক লোক সাহিত্য ধারার অনুবর্তনের মধ্যে। আসলে কোন দেশের লৌকিক সংস্কৃতি ধারার নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটলেও অন্তঃসলিলা হয়ে সেই ধারা বয়ে চলে শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে। তাই লিখিত সাহিত্য ধারার মধ্যে যেমন এই লোকায়ত সংস্কৃতির বারবার প্রতিফলন ঘটে তেমনি নৃত্য, নাটক, সংগীত এর মধ্যেও লোকায়ত ধারার প্রভাব পড়েছে বার বার। কবিগানের মধ্যে একদিকে আছে লৌকিক কবিগানের প্রভাব, আর তারই সঙ্গে ঝুমুর গানের বিস্তৃত ও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই।

॥ পাঁচালী ॥

পূর্বে সূচনায় আলোচনা করতে যেয়ে যে মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে দুটি বিশিষ্ট লৌকিক রূপ পরিগ্রহ করেছে— তার মধ্যে একটি পাঁচালী ও অন্যটি কবিগান। পাঁচালী হচ্ছে সংক্ষিপ্ত মঙ্গলগান এবং কবিগান বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর লৌকিকরূপ! মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যলোকে যে অনিশ্চয়তার যুগ দেখা গিয়েছিল সেখানে এই দুটি লৌকিক কাব্য ধারা পাঁচালী এবং কবিগান তাকে সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার করে নিয়েছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পাঁচালী বলতে পয়ার ছন্দে আখ্যানমূলক যে কোন রচনাকেই বুঝাত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে দাশরথির পাঁচালী এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করলো তাকেই নূতন পাঁচালী নামে অভিহিত করা হোতো। দাশরথির পাঁচালীর বিশেষত্ব এই ছিল যে এটি প্রাচীন পাঁচালীর মত কেবল পয়ার ছন্দেই রচনা হয়েছিল। গল্পের ধারাটি সহজ ভাবে বর্ণনা করে যাওয়াই যদিও এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি নানা অলঙ্কারের সহযোগে একটি শিল্পরূপ সৃষ্টি করাও এর উদ্দেশ্য ছিল। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। যথা :—

লৌকিক পাঁচালী :- পালা : লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও রামের বিলাপ—

পালা — রামের পরাজয় দেখে লক্ষ্মণ গিয়ে সম্মুখে দাঁড়াল
ময়দানবের শেল পড়ে কোন রণে লক্ষ্মণকে রাবণ সে এ বাণ মারিল
বাণের মুখে গো কত ধিকে ধিকে আগুন জ্বলে।
সজোরো পড়লো গিয়ে লক্ষ্মণের বক্ষস্থলে॥

ঐ লক্ষ্মণ হলো তখন অচেতন। কাঁদে রাম।
সীতা তরে লঙ্কাপুরে গো প্রাণের ভাই হারালাম ॥
ঐ ব্রহ্ম অস্ত্র ধরিতে রাম রাবণের পরাজয়
রাবণ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল কখন লঙ্কায় ॥
কত ধুলোয় পড়ে কাঁদে রাম রঘুমণি
আমি আগে এলাম জন্ম নিলাম আগে কোথা যাবে তুমি ॥
কাঁদে তখন কমল আঁখি।
আমি বাড়ী গিয়ে সুমিত্রা মায়ের কোলে দিব কি ॥
মনের দুঃখ আমার গেল না, জানকী উদ্ধার হল না।
এ যে মিতে সুগ্রীব, আমি কি করি তাই বল না ॥
তোমরা যবে যাও চলে মরিব সাগরের জলে।
পোড়াবিধি বাদী হলো সুখ নাই মোর কপালে ॥
রাত পোহালে রাজা হই বিধাতা পাঠাল বনে।
রাবণ করলে সীতা চুরি পঞ্চবটী বনে ॥

(মুর্শিদাবাদ)

কিন্তু দাশরথির পাঁচালীতে কাহিনীর ধারা সহজভাবে অনুসরণ করবার পরিবর্তে বর্ণনার বিশেষ বিশেষ অংশে অলঙ্কার ব্যবহার করে রসসৃষ্টি করাই লক্ষ্য ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের সুদীর্ঘ কাহিনী এক একটি সংক্ষিপ্ত ভাবে এবং অর্থে বিবর্তিত হয়েছে। যুগপ্রভাবশতঃ দাশরথির সেই অলঙ্কার যুক্ত পাঁচালী রচনা সমগ্র বাংলায় অনন্য সাধারণ জনপ্রীতি লাভ করেছিল। একটি উদাহরণ উপস্থিত করলে প্রাচীন লৌকিক পাঁচালীর সঙ্গে ঊনিশশতকের নূতন পাঁচালীর ধারার পার্থক্যটি বুঝতে পারা যাবে। পূর্বের লৌকিক প্রাচীন পাঁচালীটি যে বিষয়বস্তু আশ্রয় করে রচিত দাশরথি সেই বিষয়তেই পাঁচালী রচনা করেছেন একেবারে অন্য রীতিতে। যথা—দাশরথির পাঁচালী ঃ পালা ঃ শক্তি শেল লক্ষ্মণের পতন ও রামচন্দ্রের বিলাপ ঃ

সক্রোধে শেলপাট. দশানন ছাড়ে।
চক্ষুর নিমিষে লক্ষ্মণ শেল কাটি পাড়ে
ব্যর্থ হৈল শেলপাট, ক্রোধিত রাবণ।
শক্তিশেল ধনুকে যুড়িল ততক্ষণ ॥
ডাক দিয়ে লক্ষ্মণেরে কহিছে রাবণ।
রক্ষা কর দেখি বেটা আপনার জীবন ॥
ছাড়ে রাবণ, শক্তি-শেল মন্ত্রপূত করে
শক্তিশেল গর্জনেতে কাঁপে চরাচরে ॥

দুরন্ত শেলের মুখে অগ্নি জ্বলে ধক্ ধক্
অন্যাকি ছার দেখে ভাবিত ত্র্যম্বক পাবক ॥
বায়ুবেগে পড়ে গেল, লক্ষ্মণের বুকে।
হাহাকার শব্দ অমনি হইল ত্রিলোকে ॥
রণজয় করে লংকায় চলিল রাবণ।
চেতন হারায় লক্ষ্মণ ভূতলে শয়ন ॥
ঘন ঘন ঘনবরণ বলেন, গা তোল লক্ষ্মণ।
বিপদে পড়য়ে কাঁদেন বিপদভঞ্জন ॥

ঝিঝিট

কি মল হায় / কি নিশি পোহায়
আজ কেন ভাই, নীরব
রব কি হারায়ে তোমায় ॥
রাধিকে তোরে অন্তরে পাই রে বেদন;
ও চাঁদ বদন, হেরি অন্তরে,
কি লয়ে অযোধ্যা যাব।
কি কব সুমিত্রা মাতায় ?
কেন ভাই, হলে বিবর্ণ সুবর্ণ জিনি
তোমার ছিল বর্ণ, শশিবদন মণি হল,
সে বর্ণ লুকাল কোথায় ॥

পাঁচালী উৎপত্তি ইতিহাস এবং পাঁচালী নামকরণ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নানা ইতিহাসকার ও গবেষক বিভিন্ন মতামত দিয়েছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই শ্রেণীর সংগীতের সৃষ্টি পাঞ্চাল বা কনৌজ। ডঃ সুশীল কুমার দে বলেছেণ—পদ চালন কথা থেকে পাঁচালী এবং এই পাঁচালী শব্দের রূপ পরিবর্তনে পাঁচালী কথার উদ্ভব হয়েছে। তিনি আরও অনুমান করেছেন—লাচাড়ী থেকেই হয়তো পাঁচালী কথাটি এসেছে। এই অনুমানও স্থির সিদ্ধান্ত কিছু নয়। আসলে নৃত্যগীত এবং আবৃত্তি—এ নিয়ে পাঁচালী।

একজন মূল গায়ক পায়ে নূপুর পরে, হাতে চামর নিয়ে ছড়া কাটতেন এবং গান করতেন। তাঁর পদ্য আবৃত্তির মধ্যে কিছুটা অভিনয়ের ঢঙ এসে যেত। আদিতে পাঁচালীর প্রিয় বস্তু ছিল পৌরাণিক কাহিনী, এতে ভক্তিরসের প্রাধান্য ছিল। আঠারো শতকের শেষের দিকে পুরাণো পাঁচালী যখন রূপান্তরিত হতে থাকে তখন আধুনিক কাহিনী অবলম্বনে পালা রচিত হতে লাগলো। দু একটি আধুনিক পালা উপস্থাপিত করলে ব্যাপারটি অনুধাবন করা যেতে পারে। যথা :

(১) ॥ কর্ত্তাভজা

শ্রবণে সুশ্রাব্য অতিরসজ্ঞ পাঁচালী
প্রণিধান কর কিছু কাব্য কথা বলি ॥
নূতন উঠেছে কর্ত্তাভজা শুন কিঞ্চিত তার মজা……
হতে শ্রবণে বড় মিষ্ট।
বাল বৃদ্ধ যুবা রমণী, নিষেধ মানে না যায় অমনি,
অন্ধকারে পথ না হয় ইষ্ট।
ইহার ঘোষপাড়াতে পূর্ব সূত্র,
গোপাল ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র,
সেই উহাদের কর্ত্তার প্রধান।
চারিজন তার আছে চেলা
মদন সুবল গোপাল ভোলা
তারা এখন বড় মান্যবাণ ॥
সেই চারিজন চারি আখড়াধারী
মন্ত্রণা দিয়ে পুরুষ নারী,
ভুলায়ে আনে বুলিয়ে মাথায় হাত
ওদের ভোজের ভেল্কী এমনি
সোজা চলে ঘরের গিন্নী
সিন্নি দিয়ে করেন প্রণিপাত ॥

(২) ॥ বিধবা বিবাহ ॥

বিধবা বিবাহ আইন উপলক্ষ্যে ঘোর আন্দোলন

বিধবা বিবাহ কথা কলির প্রধান কলকাতা
নগরে উঠেছে এই রব।
কাটাকাটি· বান ক্রমে দেখছি বলবান
হবার কথা হয়ে উঠেছে সব
ক্ষীরপাই নগরে ধাম ধন্যগণ্য পুণ্য ধাম
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামক
····কর্ত্তা বাঙ্গালীর তাতে আবার··· নীর
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক
বিবাহ দিতে ত্বরায় হাকিমের হয়েছে রায়
আগে কেউ টের পায়নি সেটা

তারা করলে অর্ডার করে অর্ডার

চুটকে বুদ্ধি আটকে রাখবে কেটা ?

হাকিমের এই বুদ্ধি ধর্মবুদ্ধি / এ বিবাহ সিদ্ধি হলে পরে। /

বিধবা করে গর্ভপাত, অমঙ্গল উৎপাত, / এতে রাজার রাজ্য হতে পারে ॥ /

ঊনবিংশ শতকের নূতন পাঁচালীর মধ্যে তৎকালীন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাকে নিয়ে পালা রচনা করা হয়েছিল। এটি কিন্তু কেবল ঊনিশ শতকের নূতন পাঁচালীর ক্ষেত্রেই নয়, সাময়িক ও লৌকিক বিষয়কে নিয়ে পাঁচালী রচনা রীতি চিরকালই প্রচলিত আছে। অত্যন্ত আধুনিক বিষয়বস্তু নিয়ে আজও লোককবিরা লোক সমাজের আশা আকাঙ্খার কথাকে পাঁচালীর মধ্যে রূপান্তরিত করে চলেছে। বর্ধমান থেকে সংগৃহীত একটি লৌকিক পাঁচালী উদ্ধৃত করলেই দেখা যাবে সেখানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ক্যানেল কাটার পর চাষীদের মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটিও উপলব্ধি করা যাবে যে ঊনিশ শতকের দাশু রায়ের নূতন পাঁচালীর সমসাময়িকতার যোগসূত্রটি কোথায়। যথা ঃ

দেশে সোনার ফসল রে ঐ ক্যানেল এসে। /
তোরা থাকুবে বসে দেশের চাষী সেই আশার বশে ॥ /
ক্যানেল এলো না কাল এলো সোনার দেশটি ধ্বংস করলো। /
মোদের বুকে রক্ত চুষে হোল এমনি রাক্ষুসে ॥ /
কেড়ে নিল জমিজমা দেয়না টাকা ষোল আনা।
বললে বেশি জরিমানা যেতে হয় কোটে ॥ /
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে আসলো ক্যানেল এ বাংলাতে। /
পেট পুরে ভাত পাই না খেতে এ জমি চষে ॥ /
সময়ে জল দেবার তরে, দিলে যে বাঁধ দামোদরে। /
উল উঠে বাঁধের উপরে যায় রে বাঁধ ফেঁসে ॥ /
কোলো সোনার বাংলা গেল ধুয়ে কি ফল পেলাম ক্যানেল পেয়ে, /
ভুলেও দেখলে না চেয়ে আমাদের দেশে ॥ (বর্ধমান)

আসলে ঊনবিংশ শতকে কবিগান, পাঁচালী, তর্জা ইত্যাদির মধ্যে যে লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় তার পিছনে লোক সাহিত্য ধারার সুগভীর প্রভাব বর্তমান। বাংলা লোকগীতির যে প্রাচীন ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে ঊনিশ শতকের পাঁচালী, তর্জা, টপ্পা ইত্যাদির মধ্যে তারই অনুসরণ মাত্র। লোকগীতির বহু ধারার বিষয়বস্তুর মধ্যেই আছে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বিবিধ পুরাণাদির অনুসরণ যা ঊনিশ শতকের নূতন পাঁচালীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাংলার লোক-সাহিত্যে কাঠি নাচের গান নামে এক শ্রেণীর গীতি প্রচলিত ছিল। এ গানের বিষয়-বস্তুও মূলত রামায়ণ ও ভাগবতের কাহিনী। কাঠি নাচের গানের একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। যথা—

॥ নৌকা বিলাস—পালা ॥

দধি বিক্রয় স্থলে যান শ্যাম গরবিনী
কৃষ্ণ দরশনে যান সঙ্গেতে গোপিনী।
চলিলেন গরবিনী মথুরার হাটে
নাবিক হলেন কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে।
সঙ্গেতে বড়াই ছিল কাজে বড় পাকা
ওপারে নাবিক বুঝি ওই যায় দেখা।
নাবিক বলিয়া ডাক দিল · · সখি।

বাংলা লোকসাহিত্যের পূর্বোক্ত ঐতিহ্যগুলি নিয়ে রচিত হয়েছে ঊনিশ শতকের পাঁচালী। সেখানেও বিষয়বস্তুগুলি নিম্নলিখিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, গোষ্ঠলীলা, নন্দলীলা, কলঙ্কভঞ্জন, অক্রুর সংবাদ, রুক্মিণী হরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, সীতা অন্বেষণ, তরণীসেন বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, আগমনী, প্রহ্লাদ চরিত্র ও অন্যান্য নানা আধুনিক বিষয়।

॥ তর্জা ॥

ঊনবিংশ শতকের লোকসাহিত্য ধারার পূর্বতন সূত্র হিসাবে যে বিষয়গুলি লিখিত সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায় তর্জাগান তার মধ্যে অন্যতম। তর্জাগানের মধ্যে লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের শেষ যুগে অষ্টাদশ শতকে কবিগানের উৎপত্তি। এই কবিগানের উৎস হচ্ছে প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য, শাক্ত পদাবলী ও বিভিন্ন পুরাণ। তাই কবিগানের বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বিশেষ দিক দেখতে পাবো। যথা—(১) সখী সংবাদ, (২) আগমনী বিজয়া, (৩) তর্জা, (৪) খেউর, (৫) আখড়াই, (৬) বিচিত্র প্রসঙ্গ। কবিগান এই কয়টি বিভিন্ন ধারার সম্মিলিত নাগরিক লোকসাহিত্য। তর্জাগান এই ধারারই তৃতীয় পর্যায়ের একটি রূপ। আরবী ভাষায় তরজা শব্দ থেকে তর্জা শব্দের আগমন অনেকে কল্পনা করে থাকেন। প্রাচীন বাংলার চড়ক ও ধর্মঠাকুরের উৎসবের মধ্যে। আটা ও তরজা তর্জন রূপে প্রমোদানুষ্ঠান হত তা শ্লেষ ও রসগীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তর্জা শব্দ প্রয়োগ এখনও প্রশ্নোত্তরে, হেঁয়ালী বা প্রহেলিকা বা শ্লেষ এমন অর্থেও প্রয়োগ হয়। একটি প্রাচীন তর্জার উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কাব্যে ঃ—

বাউলকে কহিও লোকে হইল অউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

এটি কিন্তু তর্জার সুষ্ঠু ও সার্থক রূপ নয়। এটিকে যদি তরজার চাপান বলা যায় তাহলে কাটান ও উতোর অংশের যোগ করলে তবে তরজা সম্পূর্ণ হয়। আসলে তর্জা হচ্ছে গানের মাধ্যমে বাগ্‌যুদ্ধ। মধ্যযুগের সাহিত্যেও এ ধরনের রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই-এর যে বাগ্‌যুদ্ধ হয়েছিল তাতে তর্জার কথাই স্মরণে আসে। যথা—

রামপ্রসাদ গাইলেন— ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥

আজু গোঁসাই এর উত্তরে— ডুবিসনে মন ঘড়ি ঘড়ি।
·· আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥

রামপ্রসাদ গাইলেন— এ সংসার ধোকার টাটি

আজু গোঁসাই এর উত্তরে— এ সংসার রসের কুটি
হেথা যাই-খাই আর মজা লুটি।

রামপ্রসাদ গাইলেন— আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে চারিফল কুড়ায়ে খাবি ॥

আজু গোঁসাই এর উত্তরে— কেমনে বেড়াতে যাবি ?
কারও কথায় যাসনে রে কোথাও
মাঠে যাবে যারা—যাবি।

রামপ্রসাদ সমাধান— মন কোরো না দ্বেষাদ্বেষি
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণেতে করলাম কত খোঁজ-তল্লাসী
ওরে কালীকৃষ্ণ শিবরাম সবই আমার এলোকেশী ॥

বহু প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার লোক সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপ হিসাবে এদেশে তর্জা গানের প্রচলন আছে। আনুমানিক খৃষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে' তর্জা গানের উল্লেখ দেখা যায়। আটা তর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া। তর্জা শব্দ ছড়া অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও এর কোন অর্থের পরিবর্তন হয় নি। তর্জা শব্দে এখনও প্রধানতঃ ছড়া বুঝায়। বাংলায় বহুকাল ধরেই এ জাতীয় লোকগীতি প্রচলিত আছে। দু-একটি প্রাচীন লৌকিক তর্জা গীতির উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করলে উনবিংশ শতকে ও আধুনিক যুগে এর পরিবর্তনটিও সার্থকভাবে উপলব্ধি করা যাবে। যথা :—

॥ লৌকিক তর্জাগান ॥

(বন্দনা)

মা বলে, মা-ডাকি মা তোরে, পড়ে ঘোর সমরে
রেখো পদে আমায়, রেখো তোমার এ দাসেরে।
কারে দাও মা বালাখানা, কারো চালে খড় জোটে না,
কারো ভিক্ষা করে প্রাণ বাঁচে না যেই দশা করলে মোরে।
শ্রীমন্ত মশানে গেল, মা-মা বলে, ডেকেছিলো,
সেথায় তুমি উদ্ধারিলে, কোলে করে নিলে তারে।
কোথায় · গুরু কল্পতরু দেখ মৃত্যুঞ্জয়
আজ দীন দীন এ অধমকে দাও গো পদাশ্রয় (পদপ্রার্থী আমি)।
জয় জয় জামাতা ভয়ত্রাতা অভয় দায়িনী,
আজ তোমার পায় নিয়ে শরণ তরজা গাইব আমি (পদে শরণ নলাম)।

(চাপান)

আজ জুড়িদারের সাথে একটু পাল্লা দিতে হবে।
হুকুম মোরে করেছেন যে বড় বাবুরা সবে ॥ (হুকুম তামিল করি)
আজি শাস্ত্রকথা শুনবো হেথা জুড়িদারের কাছে।
জুড়ির কথা জারিজুরি দেখবো জানা আছে ॥ (এইবার ঠেলাতে হবে)
গো-জাতির জন্ম কোথা হতে হলো
আর ক্ষীর সমুদ্র কোথায় আছে, কে করলে ভাই বলো।
(অত ক্ষীর জুটলো কোথা)
গান বন্ধ নয়কো এটা শাস্ত্রকথা হয়।
শাস্ত্রমত প্রধান দেবে নাইকো তোমার ভয় ॥ (তোমায় অভয় দিলাম)
কথার জবাব দিবে প্রাণ জুড়াবে গুণের গুণমনি।
দেখি তোমার গুণপনা কেমন তুমি গুণী ॥ (এইবার বোঝা যাবে)
এইখানেতে সংক্ষেপেতে গাওনা সাঙ্গ করি।
· চাঁদবদনে বলুন হরি হরি ॥

(মুর্শিদাবাদ থেকে সংগৃহীত)

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিওয়ালার গানের মধ্যে তর্জাগান প্রবেশ লাভ করার ফলে, দুদল ছড়াদারের মধ্যে প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়াজাতীয় গানকেই বুঝাত। বর্তমানে কবিওয়ালার গানের দল থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গিয়ে তর্জা গান স্বাধীন ভাবে গীত হয়। তাতে একজন ছড়াদার ছড়ার ভিতর দিয়ে একটি প্রশ্ন করে যায়। তার প্রতিপক্ষ জবাবে আর একটি চাপান বা নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করেন। নানাবিধ পৌরাণিক কাহিনীর লৌকি । ব্যাখ্যা অবলম্বনে তর্জাগান রচিত হয়। কয়েকটি উদাহরণ :

(১) রাম বসুর চাপান— সেই তুমি সেই আমি
সেই প্রণয় নূতন নয় পরিচয় —ইত্যাদি।

ঠাকুরদাসের উতোর— পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর
পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী সুযশ করে না
বিনা দোষেতে দুষো না।
সুখের প্রেমে দুখ দিও না।
মিছে অপযশ করলে ধর্ম্ম সরে না। ইত্যাদি

(২) কৃষ্ণমোহনের চাপান— রসেশ্বরে সুধাও সখী,
আমার নাথের মঙ্গল কি
নিবাসে হই নির্দ্দয়, নাথ আসবে নাকি ?
আমি কেমনে ভুলিব তারে
পতিগত মুক্তি অবলার
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার।

রাজকিশোরের উতোর— নিবাসে আসিবে নাথ যাবে সব জ্বালা
পতি বিচ্ছেদে এমনি হয় সখি মিছে নয়
তা বলে আশাত্যাগী কেন হও। ইত্যাদি

(৩) ভোলা ময়রার চাপান— তুই জাত ফিরিঙ্গী জবর জঙ্গী
আমি পারবো নাকো তরাতে।
শোনরে ভ্রষ্ট বলি পষ্ট, তুই রে নষ্ট মহা দুষ্ট
তোর কি ইষ্ট কালী কেষ্ট ভজ্‌গে যা তুই যীশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গীর্জ্জেতে।

এন্টনী সাহেবের কাটান সত্য বটে আমি জাতিতে ফিরিঙ্গী
ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন, অন্তিমে সব একাকী।

ঐ উতোর— খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথাও শুনি নাই॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে, ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়ায়ে রয়েছে
আমার মানব জন্ম সফল হবে, যদি রাঙা চরণ পাই॥

॥ টপ্পা ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক যুগে লৌকিক কাব্যধারার অনুসৃতি—দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। এক ভাগে—কাহিনী কাব্য, পাঁচালী, কবিগানের অধিকাংশ পদ ও

তরজা ইত্যাদি , দ্বিতীয় ভাগে—গীতিকাব্য টপ্পা ও কবিগানের কোন কোন অংশ। উনিশ শতকে আধুনিক কাব্য ধারায় গীতিকাব্যের সূচনার কিছু পূর্বেই ঝুমুর, ভাটিয়ালী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় লৌকিক প্রেম সঙ্গীতের ধারা অনুসরণ করে টপ্পা নামক একজাতীয় নিছক লৌকিক প্রেম কাব্যের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন সমালোচক টপ্পা গানের মধ্যে লোকসঙ্গীত ভাটিয়ালী প্রভাব লক্ষ্য করে বলেছেন—এদিকে গানের মধ্যে কথার পরিবেশনের নিয়ম আলোচনা করলে দেখা যাবে—শিল্প সঙ্গীতে টপ্পা নামক গীতরীতির সঙ্গে এ বিষয়ে ভাটিয়ালের বেশ মিল রয়েছে।··· ভাটিয়ালীর মত এর কথাগুলোও এক এক গোছা করে গায়কের মুখে উচ্চারিত হয়, আবার তারপরেই কথার হাল থেকে ছাড়ান পেয়ে সুর জমজমা নামক তালের দ্বারা বিশ্রাম লাভ করে। তফাৎ দাঁড়ালো এই ভাটিয়ালীতে একটানা সুরের যা কাজ, টপ্পার বেলা জমজমা তালের কাজও তাই। যদি বলা যায়, বাংলা টপ্পায় ভাটিয়ালির প্রভাব আছে তাহলে বোধ হয় খুব মিথ্যা কথা বলা হবে না। বাংলার লোকসাহিত্য ঃ ১ম খণ্ড ঃ পরিশিষ্ট পৃঃ ৬০৭। ২য় সংখ্যা ঃ রচনার দিক দিয়ে ভাটিয়ালি পিতাস্য সরল এবং সংক্ষিপ্ত। টপ্পাও সংক্ষিপ্ত ও সরল। ভাটিয়ালির প্রধান বিষয় প্রেম ও বিরহ, টপ্পারও ঠিক তাই। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যথা—

ভাটিয়ালি গান ঃ ও সুবলরে, গুণের ভাই রে সুবল,
আমায় শীঘ্র এনে দেখা, রে সুবল ব্রজেশ্বরী রাধা ॥
হস্ত দিয়ে দেখরে সুবল আমার হৃদয়ে
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল আমার অন্তরে

নিধুবাবুর টপ্পা ঃ অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি
বিরহ অনলে আমি সদা জ্বলেছি।
জনরব বিষধর, পাইয়াছি নিরন্তর
মিলন অমিয়গানে, এবে বেঁচে আছি।

লোকসঙ্গীত ভাটিয়ালির মধ্যেই কেবল উনিশ শতকের টপ্পা সঙ্গীতের উৎস খুঁজলে চলবে না। লৌকিক প্রেম সঙ্গীত ঝুমুর গানের সঙ্গেও টপ্পার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঝুমুর রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম, টপ্পাতেও তাই। ঝুমুর গানে রাধাকৃষ্ণ সাধারণ নরনারীতে রূপান্তরিত। টপ্পায় রাধাকৃষ্ণের মাঝে মাঝে নামোল্লেখ আছে বটে কিন্তু রাধাকৃষ্ণের আবরণ করে বাবুর টপ্পায় প্রণয়. প্রণয়স্পদা অকুণ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঝুমুর গানের মতই টপ্পা বৈকুণ্ঠে সুখী নয়। এখানে কোনরূপ আধ্যাত্মিকতার আড়াল নেই—মানবীয় ব্যথা-আনন্দ-বেদনা-সুখ-দুঃখের কথাই এখানে প্রকাশিত। ঝুমুরের মত টপ্পাতেও নরনারীর দেহ মনের আকুলতা বিজড়িত প্রেম······ বাণীরূপ লাভ করেছে। ঝুমুর ও টপ্পাগানের দু-একটি উদাহরণ পাশাপাশি উপস্থাপিত করলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে। যথা ঃ—

(১) ঝুমুর (বিরহ)

হে প্রাণধন, কেমনে রাখব জীবন
যারে না দেখিলে বহিতে নারি তিলে তিলে,
এখন কোথায় আছ সে রতন।
চলনে চলনে মনে পড়ে, বদন গো, চলিতে না চলে চলন,
সদা মন চঞ্চল কি করিতে কিবা হল গো,
হৃদিতে বিঁধিতে মদন।
ধন কোথায় আছে সে রতন॥
বীণা বলে শোন গো ধনি
তোর গূঢ় তত্ত্ব সবই জানি।
আর না হেরিব সে বদন,
এখন কোথায় আছে সে রতন।

(মেদিনীপুর)

শ্রীধর কথকের টপ্পায় তারই প্রতিফলন ঃ

বাঁধা যার কাছে মন— সেই ঘোর প্রিয়জন।
সে জনে দরশনে, সদা প্রয়োজন।
এসেছে যে দিন, বসে অর্দ্ধদিন,
গেছে সেইদিন, হবে বহুদিন,
আর কতদিন,— হেরিব সে দিন,
সে বিধু বদন,
যারি অদর্শনে, বাঁচিনে বাঁচিনে।
জ্বলে মরি প্রাণে, ধৈর্য নাহি মানে
আর কন মনে প্রবোধ বচনে,
বাঁচে এ জীবন।

কিংবা (২) অন্য একটি ঝুমুর গানে

আমার ভালবাসা বিনে আমি রইব কেমনে গো,
বহুদিনের ভালবাসা আমার ভাঙ্গলো কেমনে গো।
কি কহিব সহচরী গুমরে গুমরে মরি গো
নিলাজ নিষ্ঠুর সে হে জানিলাম এত দিনে।
কি শেল বিঁধিছে মোর বাজিছে হৃদয় মাঝারে গো
এ দুখ কাহারে বলি আমি ভাবি রাত্রি দিন গো।
মনে পড়ে রূপগুণ ভুলেও ভুলা যায় না কেন গো॥

(বাঁশপাহাড়ী ঃ মেদিনীপুর)

নিধুবাবুর টপ্পাগানে প্রেমিকার সেই একই আর্তি :

পিরীত পরম সুখ সেই যে জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে ॥
থাকিতে বাসনা যার, চন্দন বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই, করে কি কখনে ॥
যতন করি হে যারে, থাকে না সে অন্তরে ॥
.. .... সতত করিছে অনাদর,
মিলনের প্রাণ ভাবি চাতুরী সে করে ॥

(৩) ঝুমুর— পীরিতি করিয়ে কালা বিদেশে রহিল,
যৌবন জ্বালা আমায় সহিতে হল।
ও বিশাখা গো, মন-আগুনে তনু জ্বরে গেল
.... তরুর ডালে, ছেদন করিল মূলে
হুতাশনে দিতে ঢেলে দিল।
ও বিশাখা গো, মন-আগুনে তনু জ্বরে গেল।
যৌবন জ্বালা আমার' সহিতে হোল,
মন আগুনে তনু জ্বরে গেল ..... (ঐ)

গোপাল উড়ের টপ্পায় :

প্রেম করা, পুড়ে যারা, এ দুই সমান হয়।
শীঘ্র আর বিলম্ব মাত্র, তা বলে তো প্রভেদ নয় ॥
বিচ্ছেদাগ্নি উঠলে পরে
কার সাধ্য নিভায় তারে
সই না করিতে পারে দগ্ধে দগ্ধে প্রাণ যায় ॥
দৃষ্টি হয় না, দৃশ্য আলো,
ক্রমে শরীর করে কালো
এর চেয়ে যে অগ্নি ভালো
অঙ্গে মাত্র চিহ্ন রয় ॥

সুতরাং সুরেই নয়, গানের ভাষা ও ভাবের দিক থেকেও ভাটিয়ালি ও ঝুমুর প্রভৃতি লোকগীতির পথ অনুসরণ করেই এসেছে উনিশ শতকের টপ্পা সঙ্গীত। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে শুরু করে মৈমনসিংহ গীতিকা ও বিভিন্ন লোক সাহিত্যের পরেও কলকাতার নাগরিক জীবনে যে নিখাদ প্রেমগীতি রচনা হতে পারে উনিশশতকের প্রথম ভাগের টপ্পাগীতিই তার প্রমাণ। রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা, গোপাল উড়ে প্রভৃতি কবিরা সেদিন যে গান রচনা করেছিলেন তা তৎকালীন লোক সাধারণকে বহুদিন যাবৎ তৃপ্তি দিয়েছিলো। এই প্রেমমূলক গীতিগুচ্ছ একদিন জাগতিক লৌকিক

প্রণয় ও অন্যদিকে রহস্যময় অপার্থিব প্রেমসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। দেহ ও আত্মার মিলনের সঙ্গে সঙ্গে আশা নিরাশার বহু বাণী এখানের মধ্যে অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করেছে। নিধুবাবু, শ্রীধর কথক ও গোপাল উড়ের কয়েকটি টপ্পার গান উপস্থিত করলে বোঝা যাবে যে লৌকিক সঙ্গীত ধারা থেকে জন্মলাভ করে উনিশ শতকে টপ্পাগান—লোক সঙ্গীত ভাটিয়ালি, ঝুমুর প্রভৃতি পথ অনুসরণ করে শহুরে ভদ্র সমাজে অনপ্রবেশ করেছিল।

নিধুবাবুর টপ্পা—

গীতাবলী বা নিধুবাবুর (ঈশ্বর রামনিধি গুপ্তের) যাবতীয় গীত সংগ্রহ।

"রামপ্রসাদ সেনের পর, গীত রচনায় রামনিধি গুপ্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার প্রণীত গ্রন্থের নাম গীত রত্ন গ্রন্থ! উহা সচরাচর নিধুবাবুর টপ্পা নামে প্রসিদ্ধ। নিধুবাবুর পর কবিওয়ালাগণ গীত রচনা বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিধুবাবু একজন কবিওয়ালা ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু
বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব
পৃঃ—৬

টপ্পা হিন্দী শব্দ—আদি অর্থে লম্ফ, ... ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান ..... তাহার নাম টপ্পা। এ দেশীয় অনেক লোকের এইরূপ সংস্কার যে আদিরস বিষয়ক গানকেই টপ্পা বলে। কিন্তু সেটি ভ্রম—গানের এক পৃথক রীতির নাম টপ্পা, ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।" (পৃঃ—১৯)

(১) যামিনী যে যায়, প্রাণ রাখিব কেমনে,
হেরি যে অরুণ তব কমলে নয়নে।
সে কামিনী কুমুদিনী, সুখে পোহাইবে রজনী,
আমি কমলিনী বুঝি করিলে মননে॥

(২) উভয়ে মিলনে সুখ পিরীত রতন।
একের যতনে দুখ না যায় যখন॥
মনেতে মিলন, মলে সুখী হয় প্রাণ
ইহাতে অন্যথা হলে ভাবহ কেমন॥

(৩) অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি
বিরহ অনলে আমি সদা জ্বলেছি॥
জনরব বিষধর, খাইয়াছে নিরন্তর।
মিলন অমিয় পানে, এবে বেঁচে আছি॥

(৪) জলে কমলিনী জ্বলে, কোথা মধুকর।
বিরস অনল জ্বলে, জ্বলে নিরন্তর॥

বিচ্ছেদের শরজলে, ডুবিল .....
ভাসিছে নয়ন জলে, জ্বলে অনিবার ॥
কার যন্ত্রণা শুনে প্রাণ ভুলিলে অধীনে।
আমি তব ধ্যানে থাকি না হেরে নয়নে ॥

(৫) পিরীতি পরম সুখ সেই সে জানে।
বিরহে না রহে নীর যাহার নয়নে ॥
থাকিতে বাসনা যার, চন্দন বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই, করে কি কখনে ॥
যতন করি হে যারে থাকে না সে অন্তরে।
যারে না চাহি আমি ত্যজে না আমারে ॥
বিচ্ছেদের সতত করি হে অনাদর,
মিলনের প্রাণ ভাবি চাতুরী সে করে ॥ (৮৪ পৃঃ)

(৬) আমি কি জানি প্রাণ, অন্তরে অন্তরে।
আর কি নাহিক জানি, তোমার অন্তর ॥
দিবানিশি আছ তুমি, আমার অন্তরে।
অন্তরে অন্তর জানে, জানিতে অন্তরে ॥ (৯০ পৃঃ)

(৭) নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধরাতল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা। (১০৪ পৃঃ)

(৮) আমায় কি হলো ওগো ধর ধর।
বিরহ বাতাসে, সঘনে হুতাশে অঙ্গ কাঁপে থর থর।
পিরীতে বিমল সুখ, বিচ্ছেদে তেমতি দুঃখ ;
সুখ আশ করি, এখন যে মরি,
তনু হলো জর জর (১১৮ পৃ)

(৯) এত ভালবাসারে প্রাণ ভুলেছ কি একেবারে।
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল।
পেতে দিলে মায়াজাল, অবলা বধিবার তরে ॥ (১৩০ পৃঃ)

(১০) আগে তারে দিও না রে মন।
সখি সে নহে আপন।
সে যে শিরোমণি, আমি তারে ভাল জানি
শঠের পিরীত যেমন জলের লিখন।

(১১) তবে প্রেমে কি সুখ হত।
আমি যারে ভালবাসি সে ···ভালবাসিত
কিংশুকে শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক জীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে,········ ফল ফলিত,
প্রেম সাগরের জল তবে হইত শীতল ॥
বিচ্ছেদ বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত ॥ (১৭২ পৃঃ)

(১২) পিরীত নয়ননিধি, পাইল যে জন।
তাহার মনের না হবে কখন ॥
···········করিয়ে কোলে, ভসয়ে সুখ সলিলে,
অনল শীতল হয়, তাহার তখন ॥ (১৮৫ পৃঃ)

শ্রীধর কথক ঃ অনেকগুলি শ্রীধরের গান, নিধুবাবুর নামে ইদানীং চলিয়াছে। মৃত রামনিধি গুপ্ত একরকম লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। নাম লুপ্ত প্রায় হউক—কিন্তু তাহার ভাল ভাল গানগুলি লুপ্ত হয় নাই। তাহা যে লুপ্ত হইবার নহে। সাহিত্যাত্মা যে চিরদিন অবিনশ্বর বলিয়াই শ্রীধরের গানগুলি বাঙ্গালীর কণ্ঠে-কণ্ঠে সদাগীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এসকল গান কাহার বিরচিত তাহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া নিধুবাবুকেই এই গানের রচয়িতা বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। অনেকে ভাবিতেন, একন সুন্দর সুকবিত্বপূর্ণ সুমধুর টপ্পা এক নিধুবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। তাই অনেকেই স্থির করিয়াছিলেন —

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিলে,
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে।
বিধু মুখে মধুর হাসি,—দেখতে বড় ভালবাসি
তাই তোমায় দেখিতে আমি, দেখা দিতে আসিনে।

উপরিউক্ত এই গানটি নিধুবাবু কর্তৃক বিরচিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা বহুদিন পূর্বে হুগলী জেলাস্থ প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম এ গান নিধুবাবুর নহে—শ্রীধর কথকের।'

শ্রীধরের খাতায় লিখিত গানটি এইরূপ ঃ

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার যে ভালবাসা, তোমা বই, জানিনে।
বিধু মুখে মধুর হাসি, দেখিলে মুখেতে ভাসি,
তাই,—আমি দেখিতে জানি, দেখা দিতে আসিনে।

হাসির হর্‌রা

(১) বাঁধা যার কাছে মন—সেই মোর প্রিয় জন,
সে জনে দরশনে, সদা প্রয়োজন।

এসেছে যে দিন, বলে······ ····
গেছে সেই দিন   হবে বহুদিন,
আর কতদিন   হেরিব সে দিন
সে বিধু বদন,—
······· অদর্শনে, বাঁচিনে বাঁচিনে।
ভুলে মরি প্রাণে, ধৈর্য্য নাহি মানে
আর কত মনে, প্রবোধ বচনে,—
বাঁচে এ জীবন।

খসাজ—ঠেকা

(২) মন কেমনে সুখে রবে,—মানিলে পরেরি কথা।
পোড়া লোকে তাই করে, লাগে যাতে প্রাণে ব্যথা॥
মজেছি দিয়েছি প্রাণ, করেছি প্রেম বিধান,—
যায় জাতি কুল মান, সে ভাবনা ভাবি বৃথা ?

ঐ

(৩) প্রাণপণে যতন করে, পেয়েছি পরেরি মন।
পোড়া লোকে কেন এত ঘুচাতে করে যতন।
প্রেমে পরাধিনী হয়ে দিবানিশি মরি ভয়ে,
পাছে কুমন্ত্রণা দিয়ে, – পরে করে জ্বালাতন।

ভৈরবী—ঠেকা ঃ

(৪) এই মনে বাসনা—
আমায় কেউ যেন ভালবাসে না
পরে ভালবাসিলে পরে, পরাণে পাব বেদনা
পরে চাতুরী করিলে,– আমিও ফিরিব ছলে
ভাসিব না নয়ন জলে,··· ··· ·· প্রেম যাতনা।

(৫) প্রেম ভালবাসি বলে তাইতে লোকে কত বলে
এখন এমন হলো—আর কি আছে কপালে
নবীন প্রেমেতে ব্রতী হয়েছি, সখী সম্প্রতি
প্রেম করার এই রীতি'
গঞ্জনা– প্রথম কালে।

(৬) ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণ যায়।—আর ভাব না
যার ভাবে ভাবি আমি, এভাবে সে ভাবে না
আমি যেমন ভাবি ভাবে সে যদি সেভাবে ভাবে,
তবে কি অভাব ভাবে—তবে রবে নাহি ভাবনা।

(৭) মান করে এ মান গেল, আর মান করিব না।
সে যদি না মানে মানে, সে মানে কি কামনা ?
…যবে হলে…সদা সাধে মানে মান,
নহে মানে অপমান, হতমান হইত না।

(৮) ওগো আমি …কি কালো ভালবাসি ?
ভাবের ভাবে কালো রূপে,
মন ভাবে দিবানিশি।
মন দিয়ে কালাচাঁদে, গড়েছি তার প্রেম ফাঁদে
যে অবধি শুনেছি তার বাঁশী।
কালা আমার জাতি কুলে, করেছে উদাসী।

গোপাল উড়ের টপ্পা : হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৩১৭ সাল, আশ্বিন। বঙ্গবাণী কার্যালয়, কলিকাতা।

নারীগণের উক্তি—

চেয়ে দেখ বকুল মূলে
গগন ছেড়ে গগন শশী উদয় ভূতলে।
যেন ফণী মনের ভুলে, গিয়েছে সই মণি কোলে,
এমনি রূপ রসকে… ভাসে নয়ন জলে।

মালিনীর উক্তি—

যাওয়া ভার হয়েছে আমার কুসুম কাননে।
মন-আগুনে জ্বলে মরি বাঁচিনে প্রাণে
আর কি আমার সে বাস আছে
ভেঙ্গে গেছে।
মালঞ্চ সব বশ হয়েছে, মালী বিহনে।

(৩) মালিনীর উক্তি :

প্রেম কি গোপনেতে রয়
দুএকদিন প্রেম লুকো ছাপা,
তিনদিনেতে প্রকাশ হয়।
পীরিতে হয়ে নিপুণ। জাননা পীরিতি গুণ।
পীরিতি করা যেমন ধারা, চকমকির আগুন,
ঠুকুরে ঘা মারল পরে, পাথর থেকে আগুন ঝরে,
সে আগুনে মানুষ মরে, সয়ে থাকলেই সওয়া যায়। (২১৪/পৃ-১৯)

(৪) বিদ্যার উক্তি :

প্রেম করা, পুড়ে মরা, এ দুই সমান হয়।
শীঘ্র আর বিলম্ব মাত্র, তা বলে তো প্রভেদ নয়॥
বিচ্ছেদাগ্নি উঠলে পরে
কার সাধ্য নিভায় তারে,
সহ্য না করিয়ে পারে, দগ্ধে দগ্ধে প্রাণ যায়
দৃষ্টি হয় না দৃশ্য আলো, ক্রমে শরীর করে কালো
এর চেয়ে যে অগ্নি ভালো—অঙ্গে মাত্র চিহ্ন রয়॥ (২২৯/পৃ°৩১)

(৫) বিদ্যার উক্তি :

তবে আর ভালবাসব না
আমি ভাল······খানা॥
আমি যারে ভালবাসি সে দেয় আমার গলায় ফাঁসি,
দূরে থাকি টানে রশিগুলো মাসি।
গুলো মাসি লো,
আমার হেঁচকা টানে প্রাণ বাঁচে না। (৩৫১/পৃঃ ৪৭)

(৬) সই। শঠের সঙ্গে প্রেম করে সুখ হল না।
সুখ হল না আমার দুঃখ ঘুচলো না॥
শঠে······যেমন, দণ্ডেতে···· ···যেমন,
জিহ্বা জানে দণ্ডের বেদন, দণ্ড জানে না॥ (৩৫২/পৃঃ ৪৫)

———

লোককাব্য ও আধুনিক বাঙলা কবিতা

॥ এক ॥

॥ ছড়া ও আধুনিক বাংলা কাব্য ॥

রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়া প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত-পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরলস্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো, সেই জন্যই বলিয়াছিলাম ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।" লোকসাহিত্যের অন্যান্য ধারায় মতই ছড়াগুলি স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি। লোকসাহিত্যের অপরাপর ধারার সঙ্গে ছড়ার স্বাতন্ত্র্য এখানেই। সংক্ষিপ্তভাবে বৈশিষ্ট্যগুলিকে এভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। যথা : (১) ছড়া লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি, যেমন শিশুই পরিণত-বুদ্ধি মানবের অগ্ররূপ। (২) ছড়া সমাজ সচেতন মনের সৃষ্টি নয়, বরং স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি। (৩) ভাবের দিক দিয়ে অস্ফুট রূপের দিক দিয়ে অপরিণত, কিন্তু রস সৃষ্টিতে সার্থক। (৪) ভাবহীন, অর্থবন্ধন শূন্যতা ও চিত্রবৈচিত্র্যমূল ছড়া শিশু মনোরঞ্জক, এর রসও তাই অকারণ পুলক ও আনন্দ, চিত্রের রেখাগুলি ও বর্ণোজ্জ্বল। সুতরাং বলা যায় এসব কারণেই ছড়ায় বৈদগ্ধ্য অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত রসধারা মস্তিস্ক অপেক্ষা হৃদয়ের স্থান অনেকখানি বেশী। তাই শিক্ষিত ও সচেতন শিল্পীর পক্ষে অনুরূপ ছড়া রচনা করা একান্ত কঠিন। তথাপি লোকসাহিত্যের ছড়ার ভাবভাষা, ছন্দপ্রকরণ, রূপকল্প ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক কালের বহু কবি ও সাহিত্যকারগণকে ছড়া রচনায় ব্রতী দেখা যায়। আধুনিক সুশিক্ষিত সুনিরূপিত প্রাজ্ঞমন অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত অযত্ন রচিত লৌকিক ছড়ার প্রভাবে কেন প্রভাবান্বিত? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে একটি মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "এই শিশুজনসুলভ প্রকৃতি যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে একেবারেই লোপ পায়, এমন মনে করা ভ্রম। বয়োবৃদ্ধির মধ্যেও এই শৈশবোচিত্য প্রকৃতির অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে।" বাঙালীর রসচেতনার প্রাথমিক পর্যায়েই মায়ের কাছ থেকে ছড়া শোনার কাহিনী বর্তমান। দোলনায় দুলুনি, মায়ের ছড়া বলার মিষ্টি সুর, ছড়ার নৃত্য চপল ছন্দ বাঙালীর রক্তের মধ্যে চিরকালের একটি প্রভাব সৃষ্টি করে।

উনিশশতকের প্রাথমিক যুগ থেকেই লৌকিক ছড়ার অনুসরণে অনেকে সাহিত্যিক ছড়া রচনা আরম্ভ করেন। উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে নাটকের সংলাপ রচনায়

ছড়ার ব্যবহার খুব বেশী লক্ষ্য করা যায়। এই ছড়ার মধ্যে কতকগুলি খাঁটি লৌকিক ছড়া হলেও, অধিকাংশই নাট্যকারগণের নিজস্ব রচনা, অষ্টাদশ শতকের সূচনাতেই এই ছড়ারচনার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সখা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক-কবি লিখিত যে কবিতাটি পাওয়া যায় তার মধ্যেই ভবিষ্যৎ ছড়ার আগমনী সূচিত হলো। কবিতাটি এই ঃ

আঃ ছেড়ে দাওনা

আঃ ছেড়ে দাওনা কুকুরচন্দ্র মায়ের কাছে যাই,
এমন কি আর খেলা করবার সময় আছে ভাই?
দেখ্‌ছো না কি হাঁড়ি হাতে চাল ধোয়া রয়েছে তাতে,
মা বলেছেন নিয়ে যেতে 'চাকর বাকর' নাই।
কাজটি সেরে ফিরে এলে, তখন তোমায় আমায় মিলে
মনের সুখে করবো খেলা যত ভেবে পাই,
কাজ ছেড়ে না করবো খেলা, ছেড়ে দাওনা হলো বেলা,
আগে কাজ কি আগে খেলা জানতে আমি চাই।

'সখা' পত্রিকা এগারো বছর চলবার পর যখন 'সাথী'র সঙ্গে মিলিত হল সাহিত্যিক ছড়া সৃষ্টির ক্ষেত্র নির্মাণে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলো 'বালক' পত্রিকা। এই পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ লেখকেরা শিশু সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন। পত্রিকা প্রকাশিত হবার পরবৎসর অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কবির নাম ছাড়াই পর পর তিনটি সাহিত্যিক ছড়া প্রকাশিত হয়। যথা ঃ

১। বনের রাজা

বনের রাজা মুকুট মাথায়
হাঁকিয়ে জুড়ি আসছে হেথায়
গড়গড়িয়ে গাড়ী!
কাজনিকো আর হেসে খেলে,
প্রাণটি যাবে দেখতে গেলে,
দাও টেনে ভাই পাড়ি!

২। ভুলুর নাচ

তা ধেই তা ধেই, ধেই
নাচে মেরা ভুলু এই!
নাকে দড়ি দু'হাত তুলে
ভুলু নাচে তালে তালে
ধিনতা তিনি তা তা—
ক্যায়াবাৎ—বাঃ—বাঃ

'মুকুল' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের (১৯০০) বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী ছেলে ভুলানো ব্যঙ্গাত্মক ছড়ার ঢঙে এক কবিতা লেখেন। কবিতাটির নাম 'দাদা মশার সাধের নাতি'। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেই উনিশশতকের শুরুতেই যে ছড়া লেখার সূচনা হয়েছিলো তা বেশ উপলব্ধি করা যাবে। যথা—

'দাদামশার সাধের নাতি ফড়িং বাবু নাম / এই সহরের এক কোণেতে আছে তার ধাম / তালপত্রের সিপাই ভায়া লিক্‌লিকে শরীর, / চলেন যদি উড়েন যেন পা

দুটি অস্থির / কি যে করেন, কোথায় যে যান, হয় না তাই নির্ণয়, / বুদ্ধি শুদ্ধি গজাবে যে হয় না সে সময়। / লেখা পড়ায় মন বসেনা বইকে লাগে ডর, / পড়াশুনা শিকায় তোলা কেবল খেলায় ভর। বাড়ীর লোকে পাগল পারা এক ফড়িঙ্গের চোটে। / কি হবে গো তাদের গতি আর একটি যদি জোটে।' ইত্যাদি।

১৯৩৭ খৃঃ রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সাহিত্যিক ছড়ার গ্রন্থ 'খাপছাড়া' প্রকাশিত হয়। এর পূর্বেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশের পরই সুকুমার রায়ের বিখ্যাত সাহিত্যিক ছড়া এবং অভিনব সৃষ্টির যুগ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নজরুল, আধুনিক কালের অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কবির মধ্য দিয়ে আজও বাংলায় সাহিত্যিক ছড়া রচনার প্রবাহ চলে আসছে, পরে তার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত করা হবে।

উনিশশতকের প্রথম আধুনিক কবি ঈশ্বর গুপ্তের অধিকাংশ কবিতাই ছড়ায় প্রভাবান্বিত। তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দ সমস্তই লৌকিক ছড়ার আকারে রচিত। কেবল তাই নয়, বহু লৌকিক ছড়াকে ঈশ্বর গুপ্ত কবিতার বিষয়বস্তু ধ্রুবপদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যথা ঃ একটি লৌকিক ছড়া—

বন থেকে বেরুল টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়—

বন হ'তে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥
এমন মোহন মূর্তি দেখিতে না পাই
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই।

একটি লৌকিক ছড়া—

আওনি বাওনি চাওনি, তিনদিন পিঠা খাওনি,
তিনদিন না কোথা যেও, ঘরে বসে পিঠা খেও।

ঈশ্বর গুপ্তের পৌষপার্বনে—

বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নবশাস্ত্র অশেষ প্রকার ॥
উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া
চাউনি কর্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া ॥

প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়—

প্রশ্ন ঃ

বলনা বলনা প্রাণ ললিত—নয়নি।
নলিনী মালিনী কেন করে সে রজনী ?

। ঃ

যেরূপ স্বভাব যার সে চায় সেরূপ।
শক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ ॥
তিমিরে ত্রিলোক পূর্ণ-পূর্ণ করে যেই
তামরসে তমোরাশি দান করে সেই ॥

ছড়ার ছন্দে ছড়ার রীতিতে আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা কবিতা ঃ

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে।
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত পাবে।

ছড়ার ছন্দকে বাংলায় স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বলা হয়। এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য প্রতি পর্বই চার মাত্রার, দ্রুত লয়ের শব্দ, প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। একটি ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের উদাহরণ ঃ

(মা) নিমে খাওয়ালে / চিনি বলে / কথায় করে / ছলনা ৪+৪+৪+২
(ওমা) মিঠার লোভে, / তিত মুখে / সারা দিনটা / গেল ৪+৪+৪+২

অনুরূপ ভাবেই ঈশ্বর গুপ্তের একটি ছন্দ বিচার করা যেতে পারে।

এঁরা না "হিঁদু" / না "মোছোল মান" / ৪+৪
ধর্ম্ম ধনের / ধার ধারেনা ৪+৪
নয় "মগ" "ফিরিঙ্গী" / বিষম "ধিঙ্গী" / ৪+৪
ভিতর বাহির / যায় না জানা / ৪+৪

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'নীতি কুসুমাঞ্জলি' কাব্য সংকলনে অধিকাংশ কবিতায় প্রাচীন শাস্ত্রাদি থেকে সংকলিত হয়ে অনুদিত হলেও এর বিষয় ও প্রকাশরীতি নীতিমূলক ছড়ার পর্যায়েই পড়ে। দুএকটি উদাহরণ উপস্থিত করলে ব্যাপারটি অনুধাবন করা যাবে। যথা ঃ

১। রোহিত রোহিত-দর্প গভীর পুষ্করে।
একাঙ্গুল জলে পুঁটি ছট ফট করে ॥
২। শুভাশুভ কর্ম্মফল কালেতে উদয়।
শরদেই আশু ধান্য বসন্তে না হয় ॥

মধুসূদন বাঙলা আধুনিক কাব্যের অগ্রদূত হলেও, মহাকাব্যের বাইরেও মধুসূদনের লৌকিক আত্মাটি সহজেই আবিষ্কার করা যায়। বিদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে মধুসূদন মহাকাব্য লিখলেও, এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করলেও লৌকিক

প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। 'ময়ূর ও গৌরী' রসাল ও স্বর্ণলতিকা 'মেঘ ও চাতক', 'সিংহ ও মশক' কবিতাগুলিতে তার প্রমাণ আছে।

যথা ঃ

১। নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন।
তার হতে সুখীতর অন্য কোন জন।

২। ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে।
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ॥

হেমচন্দ্র যুগের প্রয়োজনে মহাকাব্য রচনা করলেও আসলে তিনি ছিলেন গীতিকবি ও খন্ডকাব্যের কবি! হেমচন্দ্রের কবিতায় ছড়ার প্রভাব বর্তমান। 'হুতোম-প্যাঁচার গান' কবিতাটি আগাগোড়া সেই ছড়ার ছন্দে লেখা। যথা ঃ

কলির সহর কলকাতাটির পায়ে নমস্কার।
যার জাঁকজমকে ভাগীরথীর দুধার গুলজার ॥

কয়েকটি কবিতাতেও সার্থক ছড়া-নিদর্শন আছে হেমচন্দ্রের কাব্যে। যথা ঃ

নোংরা কথা বলতে নাই
নোংরা পথে যেতে নাই।
পথিককে দেখাইও পথ,
বাক্যে কাজে হইও সৎ ॥

কিংবা 'নাকে খৎ' প্রহসনে ঃ—

ওদের ওদের বেলা / তবে টাকার কেন খেলা ? / রাঙা ডোবার জলে / শুনি, ছী না নি চলে। / ঢাকাই জালা পেট / চন্দ্রহারের সেট। কাঁকাল গোদা বোট / তাইতো সোনার গোট। আমার বেলা যেই। অমনি হোল নেই ॥

নবীনচন্দ্রের কবিতায় ঃ

উড়া জাহাজে হাওয়া যায়, বাপরে বাপ জান বাঁচান হল দায়। / চার্চিল ছদ্মেরই বেশে / (ও সে) অট্টালিকাতে বসে / চপ কাটলেট চুষে / এটালীকে ফের কেটলী বানাইয়া / সেই জলতে চাহা যায়, বাপরে।

বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো-ছড়া' সংগ্রহ ও আলোচনা প্রকাশের পর শিক্ষিত জনসাধারণের ছড়ার প্রতি এবং এইসব অবজ্ঞাত লোকসাহিত্যের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে বহু কবিই ছড়ার ছন্দ, ছড়ার ভাব ও বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্য রচনা শুরু করেন। ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহের একটি ছড়া 'যাদু এতো বড় রঙ্গ', অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী অত্যাধুনিক যুগে অনেকেই ছড়ামূলক কবিতা রচনা করেছেন এবং এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হবে যে লৌকিক ছড়াগুলির এমন অসাধারণ যাদুশক্তি ছিল যে আধুনিক ও অত্যাধুনিক কবিদের মনকেও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। লৌকিক ছড়ার ঐতিহ্য যে পরবর্তী শিক্ষিত ও আধুনিক

কবিদের রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত ছিল একটি উদাহরণ দিলে সেটি স্পষ্ট উপলব্ধ হবে। যথা :

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া : -

"যাদু এতো বড় রঙ্গ, যাদু এতো বড় রঙ্গ। / চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥", "কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ, / তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥" "যাদু এতো বড় রঙ্গ, যাদু, এতো বড়ো রঙ্গ। / চার ধলো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥" / "বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস। / তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ ॥" / "যাদু, এতো বড় রঙ্গ, যাদু এতো বড়ো রঙ্গ / চার রাঙা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥", / "জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা, কুসুম ফুল / তাহার অধিক রাঙা, কন্যে তোমার মাথার সিঁদুর ॥" / "যাদু, এতো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এতো বড় রঙ্গ। / চার তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥", "নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকালের ফল। / তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতীনের ঘর ॥" / "যাদু এতো বড়ো রঙ্গ, যাদু এতো বড় রঙ্গ। / চার হিম দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥" / "হিমজল, হিমস্থল, হিম শীতলপাটি। / তাহার অধিক হিম, কন্যে তোমার বুকের ছাতি ॥"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সংগৃহীত ছড়ার ছন্দ ও রীতি অনুসরণ করে 'রঙ্গ' নামে একটি ব্যঙ্গ-হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করেন। যথা :

এতো বড় রঙ্গ, যাদু, এতো বড় রঙ্গ / চার মিঠে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥ / বরফ মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোনা পাপড়ি / তাহার অধিক মিঠে কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি ॥ / এতো বড় রঙ্গ, যাদু, এতো বড় রঙ্গ— / চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ / ক্ষীর সাদা, ননী সাদা, সাদা মালাই বার্বড়ি / তাহার অধিক সাদা তোমার স্পষ্ট ভাষার দাবড়ি। / এতো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এতো বড় রঙ্গ / চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ। লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা, / তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ী চলা ॥ / এতো বড় রঙ্গ, যাদু এতো বড় রঙ্গ— / চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ। / মিথ্যে ভেলকি, ভুতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না, / তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না ॥ (প্রহাসিনী)

অতি আধুনিক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রও 'রঙ্গ' নামে কবিতাটি লিখেছেন 'এ তো বড় রঙ্গ' ছড়াটির ছন্দে ও আঙ্গিকে। যথা :

এতো বড় রঙ্গ যাদু / এতো বড় রঙ্গ / নিজেই আগুন জেবলে / আবার / নিজেই হই পতঙ্গ। উপর তলায় আসর মেলা / চলেছে সতরঞ্চ লেখা / ঘুঁটি কিন্তু নীচের তলায় / যা নড়ে তার ব্যঙ্গ । এ তো বড় ধন্দ যাদু / এ বড় আফশোষ / এমন জমি চষি / ফসল আগাছায় আপোষ ! / বিনা ফাঁদেই ধরি পাখী / শিকল দিয়ে

বেঁধে রাখি। / শিকল কেটে যায় না উড়ে / মানেও নাকো পোষ ! / ঐ তো বড় ধন্দ যাদু / এ তো বড় ধন্দ / তরী হওয়া / শিকড় গাঁথা তরুরই নির্বন্ধ ! / নাও ভাসিয়ে তুলে দি পাল / ঘাট ঘুচলেই যত বেচাল / হাল ছাড়লেই পালে লাগে / বাতাস মৃদুমন্দ ! / এ বড় আশ্চর্য যাদু / এ বড় আশ্চর্য / সিধ না কেটে নিজের ঘরের / মেলে না তাৎপর্য ! / প্রাণের এমন তেজরতি না হাতালেই অধোগতি ! / শোধ লাগেনা সুদ পড়ে না / কারো যতই কর্তা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছড়ার ছবি' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, '.... এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার, ধ্বনিতে থাকবে স্বর। ছেলে মেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে, ওরা অর্থলোভী জাত নয়'। এই হচ্ছে আবোল-তাবোল বা উদ্ভট শ্রেণীর কবিতার বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কাব্যের কবিরা তাদের ছড়ারচনায় বয়স্কের মস্তিস্ক, জননীর হৃদয় ও শিশুর বিস্ময়বোধকে একত্র করে তাদের ছড়া রচনা করেছেন। তাই অনেক সময় শিশুর পক্ষে ভাবটি ধরা অসুবিধা হলেও কবির শিশু বর্ণনা ভঙ্গিতে ভাষা ছন্দ প্রকরণ ইত্যাদি দ্বারা ছেলে মেয়েদের মনে কৌতুক ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে আনন্দ দিয়ে থাকে। যেমন 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছড়া ঃ

(১) খেঁদু বাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে। (শ্রাদ্ধ)

(২) মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে দুলে, / রোদ পড়েছে নাচন মণির ভিজে চিকন চুলে। / কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলা ব্যাঙ, / খঞ্জাপুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ড্যাড্যাঙ ড্যাঙ। (ঐ)

(৩) অল্পতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি ? / মুড়কির মোয়া চাই, চাই ভাজা ভেটকি। / আনবে কটকি জুতো, মটকিতে ঘি এনো, / জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়ানো। চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি ?

[দামোদর শেট ঃ খাপছাড়া /]

(৪) বর এসেছে বীরের ছাঁদে, বিয়ের লগ্ন আটটা—
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে, গালেতে গালপাট্টা [খাপছাড়া]

(৫) ব্যাপার খানা এই— / রাজপুত্র তেরো বছর রাজভবনে নেই। / সদ্য ক'রে বিয়ে / নাথ দোয়াবার সেগুন-বনে শিকার করতে গিয়ে / তারপরে যে কোথায় গেল খুঁজে না পায় লোক, / কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল রাণী মায়ের চোখ।

(ছড়ার ছবি)

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত উদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে বয়স্কের অনুভব, জননীর অন্তঃকরণ ও শিশুর বিস্ময়-বোধ সবই একত্রিত। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ছড়ার খাপছাড়া এলো মেলো ভঙ্গী অথচ একটি চিত্রের সরলতাও যে স্পষ্ট থাকা দরকার তা রবীন্দ্রনাথের ছড়া রচনায় বর্তমান।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ছড়ার লৌকিক প্রভাব কিছু বেশী, অনেক বেশী সহজ সরল ও অকৃত্রিম। যথা :

এক যে আছে মজার দেশ সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো। (মজার মুল্লুক)

উদ্ভট ও আবোল-তাবোল ছড়া রচনার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সুকুমার রায়। লঘু কৌতুকের সঙ্গে ব্যঙ্গের ঝাঁঝ তাঁর ছড়াগুলিকে একাধারে শিশু ও বয়স্কের উপযোগী করে তুলেছে। যথা :

(১) কান করে কট্‌কট্‌ ফোড়া করে টনটন— / ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন, / কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খট্‌কা, ঝোলা গুড় কিসে দেয় ? সাবান না পট্‌কা।

(২) দুড় দুড় ছুটে যাই, দূরে থেকে দেখি / প্রাণপণে ঠোঁট চাটে, কান কাটা নেকী / গাল ফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা / ধুক করে নিভে গেল বুক ভরা আশা। (হুলোর গান)

সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' ও 'আবোল-তাবোল' ছড়া গ্রন্থ দুটি বাঙলা সাহিত্যে সাহিত্যিক-ছড়ার সার্থক নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লোকসংস্কার ও ঐতিহ্যকে যে ভাবে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির রসে জারিত করে নতুন যুগ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবেশন করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। উচ্চতর মানসচিন্তার সঙ্গে লৌকিক আচার আচরণ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় যুক্ত হওয়ায় সে রসলোকের সৃষ্টি হয়েছে তা অভূতপূর্ব। ছড়াগুলি তারই সার্থক ফসল। যথা : অবনীন্দ্রনাথের ছড়া :

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় / রাতের পাখি গাছের কোলে, / দোলে দোলে কোলের ছেলে / মায়ের কোলে। / নিদ্‌ পাড়ে নিদ্‌ পাড়ে / হিমনদী জল / আলোছায়ায় নিদ্‌ পাড়ে / নীল পাহাড়ের ঢল। / ঘুম যাচ্ছে ঘুম যাচ্ছে / শিমুল গাছের ফুল / ঘুমায় ঘুমায় গানের বাতাস / রাতের আকাশ—রাত দুপুর।

[বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৬৭]

শিল্পীমনের কল্পনার সঙ্গে শিশু মনের খেয়ালী মেজাজের অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছে উপরোক্ত ছড়ায়। আর একটি ছড়ায় আছে প্রত্যক্ষ ভাবে লৌকিক ছড়ার প্রভাব। যথা : 'বৃষ্টি পড়ে' কবিতায়—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর / বাজছে বাদল গামুর-গুমুর / ডাল চাল আর মক্কা—মুসুর / ফোঁটায় ফোঁটায় নামে— / আকাশ থেকে নামে / আকাশ থেকে নামে / জলের সাথে নামে / ঘরে ঘরে নামে / টাপুর টুপুর গামুর-গুমুর / গামুর-গুমুর টাপুর টুপুর। [ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন/পৃঃ ১]

ধ্বনি চিত্রের সঙ্গে সংগে শব্দ চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা লৌকিক ছড়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবনীন্দ্রনাথ তাকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'বৃষ্টিপড়ে' কবিতায়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যধর্মেই ছিল ধ্বনিময়তার প্রতি ঝোঁক। ফলে লৌকিক ছড়ায় ছন্দ ও ভাবধারা তাঁকে আকর্ষণ করেছে এবং তাঁর কাব্যের মধ্যে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। 'কমলা ফুলি' কবিতায় ছেলে ভুলানো ছড়ার প্রভাব আছে। যথা ঃ

কমলাফুলি, কমলাফুলি। কমলা লেবুর ফুল।
কমলাফুলির বিয়ে হবে কানে মোতির দুল।
কমলাফুলির বিয়ে—
দেখতে যাবে, ফলার খাবে চন্দনা আর টিয়ে।

রবীন্দ্র সংগৃহীত ছেলে-ভুলানো ছড়ার অতি প্রচলিত একটি হচ্ছে এই ঃ

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে। / ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥ / বাজতে বাজতে চলল ডুলি / ডুলি গেল সেই কম্‌লা পুলি॥ / কমলা পুলির টিয়েটা। / সুর্যি মামার বিয়েটা॥

উপরোক্ত ছড়ার লৌকিক রূপটিকে অবলম্বন করে আধুনিক কবি রচনা করেন ছড়া। কারণ লৌকিক ছড়ার ঐতিহ্য তো বাংলা দেশের কবির রক্তের ভিতরে, মনের গভীরে। যথা ঃ

আগডুম বাঘডুম ঘোড়াডুম সাজে / ঢাল ঘাগর মৃদঙ্গ বাজে। / বাজতে বাজতে খরতাল / কোলকাতা জুড়ে হরতাল / হরতালে হরতালে উত্তাল ছন্দ। / ট্রামের চাকা বন্ধ, ট্রামের চাকা বন্ধ। [একালের ছড়া/পূর্ণেন্দু পত্রী]

একেবারে অত্যাধুনিক যুগের বাঙলা কবিতার মধ্যেও ছড়ার প্রভাব বিদ্যমান। কবি অজিত দত্তের 'পাতাল কন্যা' কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি সাহিত্যিক ছড়া সুপরিচিত যথা ঃ

বদ্যিনাথ ও পদ্য লেখে
আপন চোখে আসছি দেখে।
চোদ্দ খানা ডিক্‌সনারি
চলন্তিকা সঙ্গে তারি

'নইলে' কবিতাটি সম্পূর্ণ লৌকিক ছড়াছন্দে লৌকিক ছড়ার মেজাজে রচিত। যথা ঃ

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির ? ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির / নইলে রইলে / ট্রামে না চড়ে / ভ্যাবা চাকা-রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

সাহিত্যিক ছড়া রচনায় প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন একালের কবি বিষ্ণু দে। তাঁর রচিত দু একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যথা ঃ

লাল জুতুয়া পায়ে বেড়ায়, হতে দুটো যা' দোলে
ধেই ধেই সে ছুটে বেড়ায় আবার উঠে কোলে।

তার একটি ধাঁধাঁ মূলক ছড়া ঃ

লম্বা লম্বা ঠ্যাং
বাঁকা তার দুটো উরু
ছোট্ট একটা মাথা
নেই চোখ নেই ভুরু। (চিমটা)

গবেষক হলেও আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের কবিত্ব শক্তি অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর আজব বেদে (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থটি ছড়ার ছন্দ ও সুরে রচিত। দু একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বোঝা যাবে। যথা ঃ

(১) ঠুন ঠুন ঘুঙুর
পথে কার বাজল
খোকাদের ঘুমচোর
ঐ বুঝি বাজল। (হরকরা)

(২) মধুবোস ডাক্তার
বড় নাম ডাক তার
কলেরা কি ম্যালেরিয়া
সাচর আইডিন দিয়া
ঘায়ে দিয়া কুইনিন
বাঁধি রাখে দুইদিন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ায় রাজনৈতিক সচেতনতা থাকলেও মেজাজটি অত্যন্ত হাল্কা ও লঘু সুরের। যথা ঃ

(১) এক যে ছিল রাজা—
রাজত্বটা মস্ত,
উঠতে বললে উঠত লোকে
বসতে বললে বসত।

[এক যে ছিল রাজা]

এই একই মেজাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতার পরিচয় মেলে কবি শঙ্খ ঘোষের ছড়াতে। যথা ঃ

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা, একটু আগুন দে, / আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি, বাঁচার আনন্দে। / নোটন নোটন পায়রাগুলি, খাঁচাতে বন্দী— / দু' এক মুঠো ভাত পেলে তো, ওড়াতে মন দি।······ / যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে / যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে / বিষের টোপর নিয়ে।··

[পরিচয় ১৩৫৮ পৌষ]

অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়ার যাদুকর। তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' ও 'রাঙা ধানের খই' ছড়াগ্রন্থ দু'খানি লৌকিক ছড়ার মানসিকতার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত। দুটি উদাহরণ ঃ

(১) এক যে ছিল মানুষ / নিত্য ওড়ায় ফানুষ। / অবশেষে একদিন / ব্যাপার হলো সঙ্গীন / ফানুষ ওড়ায় মানুষ।

[রাঙা ধানের খই/পৃঃ ৮]

(২) হাঁ গো হাঁ / পটলের মা / বর্গীরা পেঁছাল বর্মা। / আসতে কি পারে / গঙ্গার ধারে / এ দিকে যে রয়েছেন শর্মা। [উড়কি ধানের মুড়কি/পৃঃ ১২]

সুনির্মল বসু তাঁর 'আমার ছড়া সঞ্চয়ন' গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছেন, "শিশুদের হয়ে কবিতায় লিখতাম" ··আগে বিশেষ কিছু ছড়া লিখি নাই, কিন্তু আমার সেই কাব্যজীবনের মূল উৎস হচ্ছে আমার বাল্যজীবনের মা-ঠাকুমার মুখে শোনা মধু ঝরানো সুরেলা ছড়াগুলি। ঐ ছড়াগুলির কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী··· কারণ আমার মনে হয় ছড়া লেখা সহজ নয়। ছড়া লিখবার রীতি নীতি ও পদ্ধতি সাধারণ রচনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা·· ··," এই উক্তির মধ্যে থেকে আমরা সাহিত্যিক ছড়ার দুটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পারি। প্রথমতঃ শিশুকবিতা ও ছড়া এক বস্তু নয়। দ্বিতীয়তঃ ছড়া খুব সহজবস্তু হলেও, ছড়া রচনা করা আদৌ সহজ নয়। শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসুর একটি ছড়ার উদাহরণ দিলে তাঁর বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হবে। যথা ঃ

উড়কী ধানের মুড়কী / ইঁদুর চাটে গুড়কি ? / টিক্‌টিকিটা বানায় বাড়ী, / ফড়িং ভাঙে সুরকী / মৌ মাছিরা মধুর লোভে / যাচ্ছে মধুপুর কি ?

সুখলতা রাও এর ছবি ঃ

বাবনা ভূতের ছানা / নেইকো তাদের ডানা / ঝড়ের সাথে খেলায় মাতে / ঝেঁটিয়ে আকাশ খানা।

লৌকিক ছড়ার আধুনিক কাব্যের উপরে যে কত বিস্তৃত ও গভীর তা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত করে বেশ বোঝা গেল প্রবীণ নবীন আধুনিক অত্যাধুনিক সব কবির দলই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লৌকিক ছড়ার দ্বারা প্রভাবিত এবং তারই ফসল হচ্ছে বাঙলার সাহিত্যিক ছড়াগুলি। এই লৌকিক ছড়ার প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী, সাহিত্যকে ছাড়িয়ে তা যে রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, সমসাময়িকালে ভোটের সময় রচিত ছড়াগুলি তার প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে। যথা ঃ

(১) যখন ইলেকসন আসে / সমাজসেবী নেতারা সব ঘোরেন আশে পাশে। / ভোট গ্রহণের আগে / কেউ বা ভোগে হৃদরোগে আর / কেউ বা রাত জাগে। / ভোট গণনা হলে / কারু ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে / কেউ বা পটল তোলে।

[১২ই মাঘ/১৩৭৫/আনন্দবাজার]

(২) খিস্তি টাকে কিস্তি ভেবে / পার হতে চাও ভোট-নদী / ভাবছো তুমি এমনি ক'রে / বাগিয়ে নেবে দেশের গদি / লোকে যাঁরে মন্ত্রী গড়ে / তিনি যদি কুকুর হন। / জেনে রেখো 'মানবশিশু' / তোমার পিতাও মানুষ নন।

(৩) এক যে আছে মজার দেশ / সব রকমের ভালো / চালের বদল ক্ষুদ দেয় / ক্ষুদের বদল মাইলো। / মাইলোর বদল পচাগম / গমের বদল গুলি / ভেবেছে বুঝি বাংলাদেশ সব গিয়েছে ভুলি / আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে / সেই প্রফুল্ল,

ঘোষ প্রফুল্ল, আর অতুল্য নাচে / অশ্বত্থতলায় বসে আশু কটমটিয়ে হাসে— / জন্মদাতা পিতা হয়ে পুত্রে দিলি ফাঁসে। (১৮ই মাঘ/১৩৭৫ যুগান্তর)

(৪) আমার কথাটি ফুরলো / কংগ্রেস এবার ডুবিল / ক্যানরে কংগ্রেস ডুবিলি ? / ফ্রন্ট কেন হলো ? / ক্যানরে ফ্রন্ট হলি ? / মানুষ কেন চায় ? / ক্যানবে মানুষ চাস ? / কংগ্রেস কেন মারে ? / ক্যানরে কংগ্রেস মারিস ? / খেতে কেন চায় ? / ক্যানরে খেতে চাস ? / ক্ষিধে কেন পায় ? / ক্ষিধে কেন পাবে ? ক্ষিধে পাবে ভালো হবে— ইত্যাদি। [ঐ]

শেষের দুটি ছড়া লৌকিক ছড়া 'আগডোম বাগডোম' ও 'আমার কথাটি ফুরালো' ছন্দে ও ঢঙে রচিত। কিন্তু ছড়াগুলি আসলে প্রচারমূলক, তাই সাহিত্যিক গুণ নেই বললেও চলে। তথাপি লৌকিক ছড়া যে কত সুদূরপ্রসারী, ভোটের ছড়াগুলি তার দৃষ্টান্ত।

॥ দুই ॥

লোকগীতি ও আধুনিক বাংলা কাব্য

লোকগীতির সঙ্গে আধুনিক বাংলা কাব্যের সম্পর্ক অতি নিগূঢ়। লোকগীতিকে যদি বাংলাদেশের মানুষের কাব্যের প্রাথমিক স্তর বলা যায় তবে প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় কাব্যকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর বলা যেতে পারে। আর আধুনিক বাংলা কাব্য সেই ধারার পরিণত ফসল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলা কাব্যধারার এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নবতর চিন্তাধারা, বিশেষ করে দেববাদের পরিবর্তে মানবতাবাদের সূচনা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে তার সূত্রপাত। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদের বিকাশে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। অপরদিকে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষরের সূত্রপাত। সনেটের আবির্ভাব 'মহাকাব্য' গীতিকাব্যের সূচনা আধুনিক কাব্যের বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে। এতদসত্ত্বেও দেখা যায় লৌকিক ঐতিহ্যকে কোন আধুনিক কবিই অস্বীকার করতে পারেন নি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিক সাহিত্য থেকে শুরু করে বহু আচার অনুষ্ঠানকে তাঁরা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে যদি আধুনিক কাব্যের সূচনা বলা যায়, তবে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যেই আছে লোকগীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। দু একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। ঊনবিংশ শতকের প্রাথমিক পর্বে যে লৌকিক কাব্যের অর্থাৎ লোকগীতির ধারার অনুসরণ চলেছিল, ঈশ্বরগুপ্ত সেই ধারার কবি। তিনি আধুনিক যুগে বসেই কবি গান, হাফ্ আখড়াই, ঝুমুর ইত্যাদি শ্রেণীর লোকগীতি রচনা করেছেন। যথা ঃ

(১) নীলকর (গীত) কবির সুর। মহড়া। / ভালো কার্য্যটি ধার্য্য করে যদি গো, / এই রাজ্যটি করেছে মা খাস্। / এসে এ দেশেতে বসত কর, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধর / অন্নদানে বাঁচাও প্রজাদের প্রাণ / সব অন্নভূমি কর তুমি, / তুলে নিয়ে নীলের চাষ, / কোথা মা পায়ে ধরি, / হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী, / সন্তানের পুরাও অভিলাষ ॥……

চিতেন

তুমি বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া থাক বিলাতে। / আমরা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন / শুভদিন মা ভারতে ॥ / কোম্পানীর রাজ উঠিয়ে নিলে / কে বুঝে তোমার লীলে ? / নিলে মা এই ভারতের ভার। / পেয়ে শুভ সমাচার।

অন্তরা

না বুঝলে নীল, মেরে কিল / "কিল" করে নীলকরে। / দেশের ছোটকর্ত্তা, দিলেন তাদের, / হর্ত্তাকর্ত্তা ক'রে / জোরে বেঁধে আনে ধ'রে ॥

চিতেন

যেমন কাজীরে সুধালে পরে হিঁদুর পরব নাই, / তেমনি সব নীলকরের আচার, বিষম বিচার, গোস্বামী ভক্ষণের গোঁসাই / একে তো মাগ্‌গি গান্ডা, লুঠেল তায় কুঠেল ষণ্ডা, তারা ত ঠান্ডা কেহ নয়। / গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাঁটা / আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে / এখন মা প্রাণ সংশয়। / গেল গরু জরু তৃণ তরু কিছু নাহি আর / ক'রে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট / সমান কষ্ট বারোমাস ॥

[ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী/বসুমতী, পৃ ১৩৫]

মহড়া

(২) হাফ্‌ আখড়াই গীত ঃ

কি ভাবতে যেতে বল, শান্ত হওয়া দায় / আমরা কেমনে যাব ঘরে, প্রাণে না ধৈর্য্য ধরে / রাইগো সকলে মজি এস কৃষ্ণের পায়।

অন্তরা

কালরূপে ভুলাইব সব গোপিকায়,
কৃষ্ণ হবেন অনুকূল যত গোকুলে গোকুল,
গোপী গোপকুল হ'ল হ'ল প্রতিকুল,

চিতেন

ভেবেছ কি মননে, গোপনে ভাবিবে কৃষ্ণ,
শ্রীকৃষ্ণের ভাবে হয়ে নিবিষ্টে,
একি কথা শুনি রাধে,
শুধু শ্রীকৃষ্ণ তোমার নয়, সকলের দয়াময়,
যে মজে শ্রীকৃষ্ণের রাঙা পদে।
সবে ভাবিব কৃষ্ণ ভাব শ্রীকৃষ্ণের দাসী হয়
শ্রীকৃষ্ণ পাব এই যমুনায়।

অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে
যার চিন্তামণি অন্তরে তার কি চিন্তা মরণে ?
যে জন কৃষ্ণ বলে একবার,
অতুল্য-অমূল্য-কৈবল্য হয় তার,
শুন শ্যাম গুণ ধাম, তব নাম করিসার। … …ইত্যাদি, [ঐ পৃঃ ৪০৩]

একটি লৌকিক ঝুমুর গীতে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী রাধিকার যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে অনুরাগ। একদিকে ভালবাসা, অন্যদিকে অভিমান ও অভিযোগের রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। যথা ঃ একটি ঝুমুর গানে—

শ্যাম হে, তুমি আমার বাকি কি রেখেছ ? যেদিন নয়নে নয়নে নয়ন বিঁধেছে / যদি জেগেছে নয়ন আমারে / প্রাণ যে করে কেমন কেমন ॥ / কেমন যাদু করেছে। / শ্যাম হে, তুমি নানা ছলে / আমার কুলমান সব হরে নিলে, / আমার বলিতে কি রাখিলে ? / আমার আখের খোয়া করেছে। / দীনদ্বিজ ফণী ভণে / যে দিন তোমার মনে আমার মনে / তোমায় ভালবাসি মনপ্রাণে / শ্যাম হে, তুমি আমার বাকি কি রেখেছ ॥ [পুরুলিয়া]

ঈশ্বরগুপ্তের 'কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা' কবিতার সেই গানেরই প্রতিধ্বনী ঃ

হে নটবর সর হে সর, / ছি ছি কি কর বসন ধর ॥ / আমি অবলা গোপের বালা। / হলো কি জ্বালা ছুঁয়ো না কালা ॥ / করিলে ভারী বিষম জারী। / নয়ন ঠারি বধিছ নারী ॥ / তুমি হে শঠ দারুণ নট। / কুরবু বট রসিক বট ॥ / কি হাস হাস, কি ভাষ ভাষ। / লাভ না বাস ভাব প্রকাশ ॥ [ঐ ঃ পৃঃ ১৭৫]

বাউল গানের সুরে গান রচনা করেছেন আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর 'দুর্ভিক্ষ' শীর্ষক গীতিটির বাউল বাদী সুর'। গীতটি এই ঃ—

হয় দুনিয়া ওলট পালট, / আর কি সে ভাই ! রক্ষা হবে ? / আর কি সে ভাই ! রক্ষা হবে ? / পোড়া আকাশেতে নাকাল করে, / ডামাডোল পড়েছে ভরে। / আমরা হাটের নেড়া শিক্ষ ধরে, / ভিক্ষে ক'রে বেড়াই সবে, / হ'ল সকল ঘরে ভিক্ষে মাগো, / কে এখন আর ভিক্ষে দেবে ? [ঐ ঃ পৃঃ ১৪০]

ঝুমুর গান বাংলার লোকসঙ্গীতের একটি প্রধানতম বিষয়। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের বহু কবিতাই ঝুমুরের আঙ্গিকে রচিত ; কেবল তাই নয়, বাঙলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত ঝুমুর গানেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতাবর্জিত হয়ে নিছক লৌকিক ভাবে নরনারীর প্রেম মানবীয় রসে পরিপুষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'ব্রজাঙ্গনার' রাধাকৃষ্ণ প্রেম লৌকিক আবেদনে পরিপুষ্ট। বৈষ্ণব কাব্যের চেয়ে লোকগীতি ঝুমুর গানের সঙ্গে এর ঐতিহ্যগত যোগ বেশী। একটি ঝুমুর গানে দেখা যায়।

বন্দে সই,
আসবে বলে প্রাণ কালিয়া নিশি জেগে রই
আজ আসবে কালা আসবে বলে
পথ পানে চেয়ে রই।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের মধ্যে রীতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে উপরোক্ত ঝুমুরেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এই প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণে পাবে সে রতন।
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকা রমণ॥

একটি ঝুমুর গানে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবনে শ্রীরাধিকার আর্তি ঃ

ও কে রে বনে বাজায় রে বাঁশী / অমন করে বাঁশী বাজাতে বারণ কর গো সহচরী, / প্রবেশ আসি মরমে আমার সখীরে, / বড় দেয় রে জ্বালা ও বালা সরলা বল কেমনে ধৈর্য্য ধরি / আমার কর্ণেতে পশিতে স্বর কাঁপে থর থর, কেন এমন হয় গো বুঝিতে না পারি। / অমন করে বাঁশী বাজাতে বারণ কর গো সহচরী, / ঘাটে বসে কোন মহাজন কুলবধূর কাঁদায় জীবন,······ [বাঁশ পাহাড়ী]

মধুসূদনের 'বংশীধ্বনি' কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রকাশ ভঙ্গীতে উপরোক্ত ঝুমুর গানেরই প্রতিধ্বনি। যথা ঃ

কে ও বাজাইছে বাঁশী, সজনি, / মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ বনে ? / নিবার উহারে, শুনি ও ধ্বনি / দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে, / এ আগুনে কেনে আহুতি দান ? / অমনি পারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?

উপরোক্ত তুলনামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপনের পর বলা যেতে পারে, প্রথমতঃ বিষয়বস্তুতে কদম্বমূলে রাধিকারমণের বংশীধ্বনী এবং তজ্জনিত শ্রীরাধার যে আর্তি ও বিরহ প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে লোকসঙ্গীত ঝুমুর গানের স্পষ্ট সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়ে লৌকিক ঝুমুরের ভাষা দ্বারা মধুসূদন অতিরিক্ত প্রভাবিত, সজনি, ধৈরজ, পীরিত, লো ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লৌকিক ঝুমুরের ভাষাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তৃতীয়তঃ মধুসূদন 'পীরিতের ফুল ফাঁদ' ও 'মরমের ফাঁসী' ইত্যাদি লৌকিক অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন অজস্র। চতুর্থতঃ অনুপ্রাস ব্যবহারের মধ্যেও লৌকিক রীতিই অনুসরণ করেছেন। যথা 'থাক মান, যাক কুল', মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো সজনী, ইত্যাদি। ব্রজাঙ্গনার আরো দুটি কবিতা উদ্ধৃত করলে উপরোক্ত উক্তির তাৎপর্য আরো স্পষ্ট হবে। যথা ঃ

(১)   ভাল যে বাসে সজনী, কি কানে তাহার রে কুলমান ধনে ?
শ্যাম প্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম অধীনী
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে ?
মধু কহে, 'কুলে ভুলি করলো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন।   (পৃঃ ২৬)

(২)   লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী।
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর সীমন্তিনী ?
অনন্ত জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়েছেন বিধি,
তবু তুমি মধু বিলাসিনী !
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী—শ্যামে হারায়েছি আমি
আমার দুঃখে কি তুমি হওনা দুঃখিনী ?   (পৃঃ ২৩)

একটি লৌকিক ঝুমুর গানে বিরহ বেদনায় শ্রীরাধিকার আর্তি :

আমায় বিরহ দিয়ে ভুলে রইল—সেথায় কি সে গিয়ে,
এস, প্রিয়ে কামনায় বিঁধিছে আমার অন্তরেতে।
একবার ফিরে চাও হে নয়নেতে।
অন্তর জ্বর জ্বর মুখানল লাগে তো মোর।
এ যৈবন আর রইবেনা হে যাবে দুদিন পরেতে।

নবীন চন্দ্রের 'হৃদয় উচ্ছ্বাস' পর্যায়ের কবিতাগুলি ঝুমুরের আঙ্গিকে রচিত। কয়েকটি কবিতার বিষয়বস্তুও ঝুমুর পর্যায়ের, উপরোক্ত লৌকিক ঝুমুরটিরই প্রতিধ্বনি মেলে নবীনচন্দ্রের একটি কবিতায় :

কি আর বলিব আমি মরিতেছি মরমে,
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে,
দিন দিন পল পল, জ্বলিছে বিরহানল,
নিশিবেলা আর তাহা বুঝি এই জনমে।
প্রিয় সাথী মরিতেছি মরমে।

বিহারীলাল বাংলা আধুনিক গীতি কাব্যের প্রথম কবি। তাঁর রচিত 'বাউল বিংশতি' গ্রন্থের সমস্ত গান গুলির মধ্যে লোকগীতি বাউল গানের প্রভাব বিদ্যমান। মানব দেহের মধ্যে আত্মারূপী ভগবানের উপলব্ধি এবং তার নিয়ত সান্নিধ্য সুখের অনুভূতিই বাউল সাধকদিগের লক্ষ্য, আত্মারূপী এই ভগবানকে সহজ কথায় 'মনের মানুষ' বা 'প্রেমের মানুষ' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, সে জন্যে বাউল গানে, 'মনের মানুষ' বা 'প্রেমের মানুষ' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যমূলক। একটি লৌকিক বাউল গানে—

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী যে জন হয়,
মুখে কথা ক'ক বা না ক'ক, তার নয়ন দেখলে চেনা যায় ॥
মণিহারা ফণি যেমন রসিকের দুটি নয়ন,
কি দেখে, কি করে সে' জন কে তাহার অন্ত পায়। ইত্যাদি

বিহারীলালের 'বাউল-বিংশতি' কাব্যগ্রন্থের ৪নং কবিতাটিতে এই একই সুরের প্রতিধ্বনি। যথা ঃ বাউলের সুর—রাগিনী পাহাড়ী তাল তেতাল—

প্রেমের মানুষ চেনা যায়
ওর, হাসী হাসী মুখ-শশী, খুশি ফোটে চেহারায়
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন পর ;
সে জানে না দুনীয়াদারি, ভালবাসে দুনীয়ায়।
আপন মনে আপনি মগন
ঢুলু ঢুলু ঢোলে দু-নয়ন,
সে, কি যেন মধুর বাঁশী সদাই শুনিতে পায়।
(বিহারী লালের কাব্য-সংগ্রহ /৩য় সং/পৃঃ ৩২৭)

এ ছাড়াও 'বাউল-বিংশতি' সংকলনে-কয়েকটি কবিতার ভাবসম্পদ, রূপক ব্যবহার, ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী, সুর ইত্যাদি লৌকিক বাউলের পর্যয়ে পড়ে। পর পর কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করলে ব্যাপারটি অনুধাবন করা যাবে। যথা ঃ

(১) ভবের খেলা চমৎকার
এর কোথাও ফাঁসি, কোথাও হাঁসি
কোথাও ওঠে হাহাকার। (ঐ/ পৃঃ ৩২৬)

(২) খেলা নাই, বেলা নাইরে, হয়েছে যাবার বেলা।
ভাঙ্গা হাটে নবীন ঠাটে আরো কত খেলবিরে—
ও পাগল মন,
চারিদিকে ধুয়ার আকার
সমুখে বিষম ব্যাপার,
কোথায় পালাব এবার, কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা—
আমার কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা ? (ঐ পৃঃ ৩২৯)

(৩) ফক্কিকার,
ফক্কিকার ফক্কিকার, ফক্কিরে !
আমি চোক্ বুঁজিয়ে শুধুই দেখি অন্ধকার।
আমি ডুবে ডুবে কতই খুঁজি সাগরের তলে,
কই, মাণিক কই জ্বলে ?

তুমি আকাশ-ছাঁদা ধোবে চাঁদা করে দিও না আমার
ঘোর, ওলট পালট হচ্ছে কেবল, রচ্ছে সকলি,
গোল, চাকার মতম মহাচক্র বোঁ বোঁ কোরে ঘোরে আপনি,
এর, কোনটা গোড়া, কোনটা আগা ?
বিশ্ব বিচিত্র ব্যাপার
আছে, বিশ্বজয়ী-শক্তিময়ী নারী এ ধরায়
তাই নরে নিধি পায়,
আমার, সেই-ই স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ,
ধারি কেবল প্রেমের ধার। (ঐ পৃঃ ৩২৯)

অতি-আধুনিক কবি বিষ্ণু দে সাঁওতালি গান ও ছত্রিশ গড়ি গান রচনা করেছেন-

(১) দুটি ছেলে
তারা লাঙল চালায় লাঙল
লাঙল চালায় তিন পাহাড়ে গায়। (সাঁওতালি গান)

(২) হে প্রিয় আমার
পাহাড়ে বাজাও বাঁশি
ঝর্ণার ধারে শুনবো বলে তা আসি,
কলসী ফেললে লোকে বলে হ'লো কি ও !
যদি না-ই আসি, বকা বকি করে প্রিয়। (ঐ)

(৩) কি করে ভাঙলে
সোনার কলসী খানি
বলো তো কোথায়
হারালো তোমার জ্বলজ্বলে যৌবন ? (ছত্রিশগড়ী গান)

॥ তিন ॥

উপভাষা ঃ প্রবাদ ও বাংলা কাব্য

আর্যরা এদেশে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। এদেশে আসার পর তাদের দুটি বিরাট জাতির সাক্ষাৎকার ঘটলো—দ্রাবিড় এবং কোল বা অষ্ট্রিক গোষ্ঠী। এ দুটি গোষ্ঠীর একটি উন্নত ধরনের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা, রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী ছিল। আর্যরা ছিল সংখ্যায় খুবই অল্প, অপরদিকে এদেশের স্থায়ী অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। সুতরাং নবাগত আর্যরা এদেশের নবতর জীব ও উদ্ভিদ জগৎ, নানা নূতন ধরনের মানুষ এবং তাদের অদৃষ্ট পূর্ব রীতি-নীতি, ধর্ম বিশ্বাস, আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতির সম্মুখীন হয়েছিলো। ফলে নবাগত বিজেতা আর্য এবং বিজিত দ্রাবিড় ও কোল—এই ত্রিবিধ জাতির ধর্ম কর্ম, নীতি, আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার এবং জীবনচর্যার বিচিত্র বিষয়ে এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটলো সমাজদেহের অভ্যন্তরে। বিশুদ্ধ আর্যধর্ম ও খাঁটি আর্যসমাজের পরিচয় যা আমরা বেদে পাই তা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো হিন্দু অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম ইত্যাদিতে। আর্যদের দেবতাদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে এলে এদেশের নিজস্ব দেবদেবীর সঙ্গে ঘটলো ভাষার মিশ্রণ। খাঁটি আর্যভাষা এদেশে কোল ও দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে মিশে গেল। আর্যভাষায় ধাতু ও শব্দ প্রচুর পরিমাণে থেকে গেলেও ভাষার কাঠামোর বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। ভাষা বদলে সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও মৌল রূপান্তর ঘটে গেল। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতীয় জনজীবনে পান বা তাম্বুলের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পান আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, একটি প্রধান উপাদান। পান খাওয়া, পান দিয়ে সম্বর্ধনা দান, পান পূজা-বার ব্রততে ব্যবহার করা—একটি প্রাচীন ভারতীয় রীতি। আর্যরা এই পান বা তাম্বুলের ব্যবহার জানতো না। আর্যরা যেমন এই বিষয়টি সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে গ্রহণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে এই তাম্বুল শব্দটিও গ্রহণ করলেন। সাধারণ পত্র বাচক পর্ণ > পন্ন > পান শব্দের তাম্বুল-পর্ণ অর্থে অর্থ-সঙ্কোচ ঘটলো। কোল ভাষায় 'তমবল' শব্দটি প্রচলিত ছিল।

ভারতের প্রাচীন আর্যভাষার মধ্যভারতীয় আর্যার মধ্য দিয়ে নানা বিবর্তনের ফলে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার মাধ্যমে বাঙলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আদি আর্য-ভাষার বিকার জাত হলেও, বাঙলায় এবং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এমন কতকগুলি বাক্য বা পদ সাধন রীতি পাওয়া যায় যা আর্যভাষায় অর্থাৎ বৈদিক বা

সংস্কৃতে মিলে না। এই রীতিগুলি কোল (অষ্ট্রিক) ও দ্রাবিড় শ্রেণীর অবদান। যেমন—অনুকার শব্দগুলি, বাঙলায় 'জলটল', 'ঘোড়াটোড়া', 'দেশটেস' ইত্যাদি। বাঙলা ভাষার সহকারী ক্রিয়াও দ্রাবিড় প্রভাবজাত। যেমন—'বসা' এবং 'পড়া' উভয় ধাতুরূপ একত্রিত করে 'বসিয়া পড়া'র মত সহকারী ক্রিয়ার রেওয়াজ বাঙলায় নাই ; যেমন নাইয়া ফেলা, সড়িয়া পড়া ইত্যাদি। অপর দিকে বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চারণ রীতি, শব্দ ব্যবহার কাব্যগঠন পদ্ধতি ইত্যাদির দ্বারা আর এক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সেটি হচ্ছে উপভাষা সমস্যা। সমগ্র বঙ্গভাষী অঞ্চলে বহু উপভাষা গড়ে উঠেছে এবং প্রত্যেক উপভাষা ভাষী মানুষ তাদের উপভাষাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার দাবী জানাচ্ছে। ভাষা একটি সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ফল। কিন্তু সেখান থেকে যে সমস্যা উদ্ভূত হচ্ছে তা রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক সমস্যা যা বহু মানুষের মনে বিচ্ছিন্নতা বোধের সৃষ্টি করছে।

সাধারণভাবে বাঙলা ভাষার উপভাষা হচ্ছে পাঁচটি। রাঢ়ী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী, বঙ্গলী এবং কামরূপী। ডঃ সুকুমার সেন এগুলিকে কোন একটি বিশেষ উপভাষা বলতে রাজী নন। বরং তিনি এগুলিকে ঘনিষ্ঠ আঞ্চলিক কথ্যভাষার সমষ্টি বলেই অভিহিত করেছেন। রাঢ়ী মূলতঃ মধ্য-পশ্চিমবঙ্গে উপভাষা, ঝাড়খণ্ডী হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা, বরেন্দ্রী হল সমগ্র উত্তরবঙ্গে উপভাষা, বঙ্গালী পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে উপভাষা এবং কামরূপী হচ্ছে উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষা। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকায় এই উপভাষা শব্দটি ব্যবহার না করে 'মৌখিকভাষা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তিনি বাঙলা সাধুভাষা ও চলিতভাষার উদাহরণ ছাড়া বাঙলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে মানভূমের মৌখিকভাষা পশ্চিমবঙ্গ), কোচবিহারের মৌখিক ভাষা (উত্তরবঙ্গ), ঢাকা মানিকগঞ্জের মৌখিক ভাষা (পূর্ববঙ্গ), শ্রীহট্টের মৌখিক ভাষা, চট্টগ্রামের মৌখিক ভাষা ও বরিশালের মৌখিক ভাষার উদাহরণ উপস্থিত করেছেন এবং একটি গদ্য কথোপকথনের ভাষাও উদাহরণ হিসাবে পর পর তুলে ধরেছেন ; ফলে তার মধ্য দিয়ে একই অভিব্যক্তি কিভাবে শব্দ ব্যবহার ও বাক্যগঠন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বদলে গেছে অঞ্চলভেদে তার একটি পূর্ণ পরিচয় উপস্থিত হয়েছে। যেমন 'তৎকালে' শব্দটি কলকাতার চলতি ভাষায় হয়েছে 'তখন', মানভূমের ভাষায় 'তেখুনে', কোচবিহারে 'তখন', শ্রীহট্টে—'হিসময়', চট্টগ্রামে 'তহণ'। নিম্ন দামোদর অঞ্চল থেকে ভাগীরথীর পূর্বতীরের অঞ্চল অর্থাৎ হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায়, সদর মহকুমা, চব্বিশপরগণা ডায়ামণ্ডহারবার মহকুমা, ব্যারাকপুর মহকুমা এবং পূর্বাংশ বাদে বারাসত মহকুমা রাঢ়ী উপভাষার মূলস্থান। এই কেন্দ্রীয় উপভাষায় অভিশ্রুতি—স্বর সঙ্গীত জনিত স্বর-ধ্বনির পরিবর্তন, বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যেমন শব্দের মধ্যে বা অন্তে 'ই'-কার বা 'উ'-কার চারি > চাইর > চের, রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখ্যা > রেখে, বিশেষ উচ্চারণ রীতি শো > শুই, সে শুনে > সে শোনে। উচ্চারণে 'অ-কারের' পরিবর্তে 'ও'-কারের প্রবনতা—অতুল > ওতুল, প্রথম স্বরধ্বনিতে সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত থাকায় পদান্ত ব্যঞ্জনে মহাপ্রাণতা

অথবা ঘোষবত্তা উপলব্ধ করা যায় না। যেমন দুধ > দুদ্‌, লার্ড > লাড > লাট। অতিরিক্ত লুম,—লু ইত্যাদির ব্যবহার যেমন করলুম, কল্লু ইত্যাদি। অপরদিকে বঙ্গালীর উপভাষার প্রধান লক্ষণ বিপর্যস্ত বা অপিনিহিত স্বরের ব্যবহার এবং অভিশ্রুতি এবং স্বর সঙ্গতি নাই। যেমন, করিয়া > কইরা, রাখিয়া > রাইখা। তাছাড়া ঘোষবৎ মহাপ্রাণ অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ, মহাপ্রাণতা ত্যাগ করে কন্ঠনালীয় স্পর্শ যুক্ত তৃতীয় বর্ণে পরিণত যেমন, ভাত > বাত, বাড়ী > বারি।

রাঢ়ীর সঙ্গে বঙ্গালীর যে পার্থক্য সেই পার্থক্য কি রাঢ়ী ও ঝাড়খন্ডীতে? সেখানে লক্ষ্য করা যায় যে ঝাড়খন্ডী অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষাগুচ্ছ তিনটি ভাগে বিভক্ত। মেদিনীপুরের উত্তর ও পূবাংশের কথ্যভাষা রাঢ়ীর অন্তর্গত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের কথ্যভাষাগুলিকে 'দণ্ডভুক্তীয়' এবং মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তের ধলভূমের এবং মানভূমের কথ্যভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খন্ডী বলা চলে। এ ভাষার সঙ্গে রাঢ়ীর প্রধান পার্থক্য এখানে বড় বেশী অনুনাসিকের প্রাচুর্য। এছাড়াও দণ্ডভুক্তীয় এবং কেন্দ্রীয় ঝাড়খন্ডীর সাধারণ বিশেষত্ব হল অনুসর্গহীন সম্প্রদান কারক, নাম ধাতুর বাহুল্য, 'আছে'র স্থানে বট ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার। সুতরাং ঝাড়খন্ডী একটি আলাদা ভাষা বলার বিশেষ কোন যৌক্তিকতা নেই। যেমন কামরূপী উপভাষা বরেন্দ্রী ও বঙ্গালীর মাঝামাঝি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই উপভাষা উত্তরবঙ্গে এবং কোন কোন বিষয়ে পূর্ববঙ্গে উপভাষা বঙ্গালীর উপভাষার নিকটতর। তবে এখানে বরেন্দ্রীর সঙ্গে কামরূপী উপভাষার সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ।

সুতরাং বলা চলে ভাষা হচ্ছে বহতা নদীর মত। নানা শাখানদী ও উপনদীর সংমিশ্রণে কখনও সে বিরাট স্রোতস্বিনীর রূপ নেয়, কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যে ভাবে তা হোক না কেন সে সব নদীর জলের কোন পার্থক্য থাকে না, সব মিশে একাকার হয়ে যায়। ঠিক তেমনি সমগ্র বাঙলা দেশে বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে যে সব উপভাষা আছে 'সেখানে বিভিন্ন শব্দ স্থানীয় উচ্চারণে বদলে গেলেও, ক্রিয়াপদের নানাভাবে পরিবর্তন ঘটলেও, বাক্য বিন্যাস প্রণালীর কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অদল বদল হলেও, ধ্বনির হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটলেও সেগুলি মূলতঃ একই বাঙ্গলাভাষার এক একটি আঞ্চলিক রূপ মাত্র, ভাষাতাত্ত্বিকেরা ধ্বনিগত এবং রূপগত নানা পার্থক্য বিচার করে একটি তত্ত্বরূপের প্রতিষ্ঠা করলেও বাঙলা ভাষার বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি সংহতরূপের পরিচয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যতই এক একটি উপভাষা আলাদা ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবী জানাক না কেন তাতে মাতৃভাষা বাঙলার সার্বিক রূপের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। লোকজীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব নূতন নূতন শব্দ তৈরী হচ্ছে জনপদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলি যেমন উপভাষা-গুলিকে সমৃদ্ধ করছে তেমনি সামগ্রিক ভাবে বাঙলাভাষার সমৃদ্ধিকেও প্রসারিত করছে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপর্বেই এই উপগুলির প্রত্যক্ষ ভাব ঘটেছে। বাক্যগঠন পদ্ধতি, শব্দব্যবহার থেকে শুরু করে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার—সমস্তক্ষেত্রেই এই প্রভাব আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভাষাকে বিস্তৃত, সজীব এবং জোরালো করেছে। বাংলা

কবিতার ক্ষেত্রে মধ্যযুগ থেকেই এর প্রবাদের ও উপভাষার প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করা গেছে, তাই ভারতচন্দ্র যখন বলেন, নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়, কিংবা আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে, অথবা আরো প্রসারিত হয়ে যখন বক্তব্য রাখেন "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ", —তখন প্রবাদমূলক এই কাব্যাংশটির মধ্য দিয়ে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বাক্যগঠন পদ্ধতি ও উপভাষা গত বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অঞ্চলভেদে উপভাষাগত প্রভাববশতঃ উচ্চারণ ও শব্দব্যবহারে একই প্রবাদ কিভাবে বিশিষ্ট প্রয়োগের ক্ষেত্রে বারবার বদলে যাচ্ছে তার পরিচয় তুলে ধরা যায় একটি প্রবাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্যবহার বিভিন্ন জায়গার কবির ক্ষেত্রে। যেমন একটি প্রবাদ বর্তমানে ব্যবহার করা হয় এভাবে—রোগের শেষ, শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ এ সবের শেষ রাখতে নেই। মধ্যযুগের তিন কবি আঞ্চলিক ভেদে তিনভাবে ব্যবহার করেছেন। যথা ঃ

(১) ব্যাধি-অগ্নি-ঋণ একই সমান —কাশীরাম দাস
(২) রোগ-ঋণ-বিপু না রাখিব অবশেষে—ঘনারাম
(৩) ব্যাধিশেষ শত্রুশেষ রাখা বিধি নয় —মানিকরাম।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে বিশেষ করে চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের প্রবাদ ব্যবহার বাংলার উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। চর্যাপদের মধ্যে ব্যবহৃত প্রবাদ ও বিশিষ্ট শব্দ-ব্যবহারগুলি লক্ষ্য করলে একথা আমরা সহজভাবেই বুঝতে পারবো, যথা ঃ

(১) আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
(২) গরুবোর সে সীসা কাল।
(৩) বর সুণ গোহালী কি সো দুঠট বলন্দে।
(৪) হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ
(৫) দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ।
(৬) হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

হাজার বছর পূর্বে ব্যবহৃত আঞ্চলিকভাষা ও তার প্রবাদগুলি আজও বাংলা ভাষার সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে তার অন্তর্নিহিত অর্থ এক থাকলেও ভাষা ও বাক্যগঠন পদ্ধতি কিভাবে বদলে যায় তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(১) দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
(২) হাতে শাঁখা দর্পণে দেখা।
(৩) দোয়া দুধ বাঁটে সামায় না।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে একটি প্রবাদ ব্যবহার উপভাষার লক্ষণগুলিকেই স্পষ্ট করে তোলে। যথা ঃ

(১) পরধন দেখিলে কি পাএ ভিখারী
মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল

(২) বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জনজনে জানী।

(৩) চারিপাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী
নিজমাঁসে জগতের বৈরী।
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী
এভোঁহো নাহি ঘুচে তোর মুখে দুধবাস

(৪) মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। ইত্যাদি

আপনা মাংসে 'হরিণী বৈরী'—প্রবাদটি চর্যাপদে ব্যবহার হয়েছে, আবার অনেক পরে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন যেটি ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় রচিত সেখানেও ব্যবহার হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই এই প্রবাদটি ব্যবহার কিন্তু তার নিজস্ব ভাষারীতি ও বাগধারাকেই অনুসরণ করেছে। আধুনিক বাংলা কাব্যেও এই ব্যাপারটি ঘটেছে তার ভাষা ব্যবহার ও বাক্য-রীতি গঠনের ক্ষেত্রে। তাই কবিওয়ালাদের গান থেকে শুরু করে পাঁচালীকারদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে কি ধরনের ভাষার বিবর্তন ঘটেছিলো এবং প্রবাদ ব্যবহারটিই বা কি ধরনের হয়েছিলো সেক্ষেত্রে প্রবাদও বিশিষ্টার্থক শব্দ কতদূরে ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রাথমিক ক্ষেত্রে উপস্থিত করে আধুনিক কাব্যের ভাষাও কিভাবে লৌকিক ভাষার অনুসারী হয়ে উঠেছে তার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

লোকসাহিত্যে প্রবাদ একটি বিশিষ্ট বিষয়। এই প্রবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে A proverb is a short sentence based on long experience— অর্থাৎ প্রবাদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ততম বাক্যে জীবনের দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার প্রকাশ। কিন্তু প্রবাদের বা প্রবচনের সবচেয়ে বড় পরিচয় প্রবাদ ভাষাকে সমৃদ্ধতর করে এবং ভাষার মধ্যকার প্রাণ-শক্তিকে বিপুলভাবে বর্ধিত করে। কারণ প্রবাদ লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ রচনা। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কথায়, রূপকে, উপমায়, এবং ব্যঞ্জনায়, ব্যঙ্গ, সরসতায়, জীবনের এক একটি গভীর সত্য ক্ষুদ্রতম বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় বলে প্রবাদ একদিকে যেমন জীবন সত্যকে প্রকাশ করে অপরদিকে ভাষাকে জোরালো বক্তব্যধর্মী ও সজীবতর করে তোলে। একজন লোকশ্রুতিবিদ বলেছেন যে প্রবাদের ছয়টি গুণ থাকা প্রয়োজনঃ সংক্ষিপ্ততা, সরলতা, সাধারণ জ্ঞান ও গুণ সম্পন্নতা, অলংকার, প্রাচীনতা এবং সত্যতা। প্রথমতঃ প্রবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হবে, দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত সরল ও সাধারণ হবে, তৃতীয়তঃ প্রবাদ সাধারণ গুণ ও জ্ঞানসম্পন্ন হবে, চতুর্থতঃ রূপক উপমা অলংকারের সৌন্দর্য প্রবাদে প্রকাশিত হবে, পঞ্চমতঃ এর মধ্যে প্রাচীন বা অতীত জীবনের নানা তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে আর ষষ্ঠতঃ প্রবাদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে সত্যতা প্রকাশিত হবে। প্রবাদ সম্পর্কে যে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রচলিত আছে তাতে দেখা যায় প্রবাদের প্রধানতঃ তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁরা বলেছেনঃ সংক্ষিপ্ততা (brevity) অর্থবহতা (sensibility), সরলতা (saltness)। উপরোক্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির প্রেক্ষাপটে প্রকৃত প্রবাদের বিচার করা চলতে পারে।

প্রবাদ ও বাংলা আধুনিক কাব্য

দাশু রায়

১. অজ্ঞানে বাপান্ত করে, জ্ঞানবানে কি তাই ধরে ?

২ ভাল নয় অতিশয়, বুদ্ধি হলে পড়তে হয়, অতিশয় দর্পে রাবণ ম'লে।

৩ অন্তরে এত খলতা, মুখে তোর অতিশীলতা, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

৪ অনেক পরিবারে ঘটে কষ্ট, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

৫ ঋণ প্রবাস রোগ বর্জিত তাকে বলি সুখী।

৬ কি ফল আছে অরণ্যের মধ্যে রোদন করি ?

৭. ফেললে আকাশে থুতু লাগাবে গায়।

৮. পেয়েছে পতি আট কপালে।

৯. না জানি কি দেন গোপাল আটকপালে যেমন কপাল।

১০ আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজে কাজ কি গো ?

১১. অপরে যদি কান কাটতো, তবু বিধাতা মান রাখতো, কেবা দেখতো চুলে ঢাকতো, কাটলি কেন নাকরে ?

১২. সেবাদাসী সীমন্তিনী, বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী।

১৩. উনুন মুখো দেবতার ঘুঁটের পাশ নৈবেদ্য যেমন।

১৪. উঠো ধানের পথ্যি।

১৫. রাগে শরীর যায় পেকে, ব্যঙ্গ করে উড়ন পেকে।

১৬ এ কুল রাখতে ও কুল হরে, পড়েছিলাম উভয় সংকটে।

১৭ উপুড় হস্ত করা নাই তার মত।

১৮ স্বর্ণ ফেলে রেখে বেনা বনে মুক্তা বোনা।

১৯. মুখে মধু অন্তরে বিষ, তুমি ঊনিশ, আমি বিষ।

২০. তোমরা কিসে ম'লে লাজে, এক হাতে কি তালি বাজে ?

২১. এখন হে কুবুদ্ধপতি, একাদশ বৃহস্পতি।

২২. পাছে এ-কুল ও-কুল দু'কুল যায় তোমার সঙ্গে থেকে থেকে।

২৩ আমার এ কি দশা, একে মনসা, তাতে ধুনোর গন্ধ।

২৪. একে শনি তার গত রন্ধ্র, একে মনসা তার ধুনোর গন্ধ।

২৫. কি দোষে এক হাটে চোর মায়ে ঝিয়ে হই ?

২৬ কারে তুচ্ছ কারে আদর এক বাজারে দুই দর।

২৭. পাঁঠা বিক্রীর আদর যেমন আশ্বিন মাসে হয়।

২৮. দিন ক্ষণ চাই নিরূপণ, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে নয়।

২৯. পরিচয় দিস্ রাজার বংশ, বেটাদের ক অক্ষর গো-মাংস।

৩০. পেটে নাই বিদ্যার অংশ, ক অক্ষর গো-মাংস।

৩১. আরে খেলে কচু পোড়া, ভাল সময় ভাল পোড়া।

৩২ থাকিবে না তোমার কথা, সে তো কেবল কথার কথা।

৩৩. লোকে বলে হরিভক্তি, হরিভক্তি উড়ে যায় ওরে দেখে।

৩৪. মিথ্যা কথার ধুকরি ওটা, সত্যকয়না একফোঁটা।

৩৫. বিবাহ-বিষয়ে দেখাইলে কথা।

৩৬ গুলি খোরের এমন বুদ্ধি সরু ঠিক যেন কলুর গরু
থাকে চক্ষু মুদে দৃষ্টি যায় না ধরা।

৩৭. মায়া রূপে কাক নিদ্রা সদা দাশরথির নয়ন যুগলে।

৩৮. কাকে যেমন লাগে ফিঙে, বলে লাগে কেউ।

৩৯. গণক বলে করি গণনা, নাই মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কাগা-বগা বলিব কি হেতু?

৪০. কোঁচা করতে কুলায় না কাছা।

৪১. কাঠ বিড়ালীর যেমন সাগর বন্ধন।

৪২. কবে শোকেতে আচ্ছন্ন যায়, যায়না দুঃখে চক্ষু যায়।

৪৩. কালো কুকুর মাড় ভক্ষণ করে।

৪৪. ও ছার বাসনা কান কাটা সোনা।

৪৫. দেখ বড় আশা করি, কালো নিমে পাকায় দড়ি, ভাগ করে লব বলে লঙ্কা যান।

৪৬. খোঁড়ার নৃত্য দেখে কাণা....কানায় ব'লে বোবার গান শুনেছে।

৪৭ যদি কালির অক্ষর পেটে থাকত, তবে কি গালে কালি মাখত?

৪৮. কাশীতে আবার ভূমিকম্প হলো... ত্রিশূলের উপর ছিল কাশী।
কলি বেটা ক্রমে নাড়িয়ে দিলে।

৪৯. নষ্টের স্বভাব কাষ্ঠ হাসি।

৫০. লাগে যুদ্ধ যেন কীচক ভীমে।

৫১ কথায় বলে মাথায় চড়ে বানরকে দিলে লাই।

৫২. ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুরকে না দিয়ে কুকুরে দিয়েছি ঘৃত।

৫৩. কুঁদের মুখে থাকে না বাঁক দেখবে সকল লোকে।

৫৪. কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনো নয়।

৫৫. আতঙ্কেতে গড়িয়ে পড়ি অমনি কুপোকাত।

৫৬. কুম্ভকর্ণ বর্বর মেগেছিল নিদ্রার বর, সেটা কেবল মৃত্যুর কারণ।

৫৭. কোঁচড়ের আগুন ফেলবি তারে কোথা?

৫৮. কোথা রাম রাজা হবেন, কোথা যান বন।

৫৯. খাই দাই কাঁসি বাজাই, কিছু জানা নাই।

৬০. খাটতো মজুর, কটতো নাড়া, তার মেগের যে নথনাড়া, সইতে হল ওই, দুঃখ বড়।

৬১. সদরে গিয়ে লিখিয়ে নাম দ'য়ে মজায়ে পরিণাম, করেন কিনা ব্যভিচারিণী কর্ম্ম।

৬২. কথায় মারেন মালসাট।

৬৩. খুঁট মিশতে পারে না, এমনি খুঁট-- আখুঁরে।

৬৪. জ্ঞান নাস্তি পাবি শান্তি, মস্ত হচ্ছিস খুঁড়িয়ে।

৬৫. নূতন নূতন ভাল লাগিবে, শেষকালে সকলে রাগিবে, বলিবে--বেটা বড় গয়ার পাপ।

৬৬. বেটার গলা টিপলে বেরবে দুগ্ধ, পোঁদে গিয়েছিস ।

৬৭ তোমরা গাছের পাড়, তলার কুড়াও।

৬৮ গাঁ শুদ্ধ মানুষ মারে, দোহাই দেব কারে?

৬৯. গুরু পুরোহিতে দ্বন্দ্ব, কেবা ভাল, কেবা মন্দ।

৭০. কেউ ভাবেনা লঘু গুরু, আপনি বলেন আমি গুরু।

৭১ যেমন গোদের উপর বিষ ফোঁড়া, তেমনি পোড়া জানি।

৭২ সাড় কুড়ে শতদল।

৭৩ ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব, ইতু পুজোয় ঢাক।

৭৪ ঘর জ্বালানে পরমজ্ঞানে কুমন্ত্র কুতন্ত্র জানে।

৭৫ যেমন বাবুই ভেজে থাকতে বাসা।

৭৬. ঘর নাই তার উত্তর দারী, ভূমি নাই তার জমিদারী।

৭৭. হতেম তো এমনি বিদায়, ঘর পোড়ান কাঁসা আদায়।

৭৮. অনেকে রাজার মাকে ডান বলে।

৭৯. সহোদরের গুণ শুণ, ঘরের শত্রু বিভীষণ।

৮০. পরাণে কি সহ্য হয়, কুড়ুনীর বেটার উড়ুনী গায়।

৮১. বাঁধালে বিচ্ছেদ যাগ চিইয়ে দিলে ঘুমান বাঘ।

৮২ ঘৃত ত্যাজ্য করে মাছি, ঘা দেখলেই ঘটে রুচি।

৮৩. কথায় বলে চিরকাল, ঘোড়ার ডিম আর কাচের ছাল।

৮৪ গরুর ঘাস কাটতে হল, ভাগ্যে এই ছিল।

৮৫ তুমি চাইলে হীরে পেলে জিরে, যত্ন করলে অতি।

৮৬. পাতালে আর গোলোকে, টেমটেমি আর ঢোলকে।

৮৭. উজ্জ্বল করেছে বটে, ঠিক যেন চাঁদের হাট।

৮৮. এমন কলেরাতে এত লোক ম'লো, আর বুড়ো না ম'লো, চিত্রগুড় খাতা না দেখিয়ে।

৮৯. এত মেয়ের মাঝে সখী, বুড়ো মিনসে করলো একি, চুড়োর উপর ময়ূর পাখা।

৯০. তুই কি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে দেখিস লাখ টাকার স্বপন?

৯১. নইলে কেন তার এত দুঃখ, বুদ্ধি নাই বুঝ না সূক্ষ্ম চক্ষু থাকিতে তুই অন্ধ।

৯২. তুই রাখাল হয়ে চাস বস্ত্র, তোর চোখের পরদা নাই।

৯৩ জোর বিনে সই চোর কখনো ধর্ম শাস্ত্র মানে ?

৯৪. ঢালি ভূমে অন্ন কিসের জন্য চোরের উপর রাগো ?

৯৫. পাঁচবার চোরের, সাধুর একবার।

৯৬. ছলে বলে কৌশলে এমন পিরীত রাখে।

৯৭ এখন করলে বেশ, বাঁধলে কেশ, ছেড়া চুলে খোঁপা।

৯৮. আর মিছে কাঁদ, আটকে বাঁধ, আটকে রাখলে থাকি।

৯৯. তাদের হাতে থোপ-দেওয়া খঞ্জনী।

১০০. জয় কেতে যত মাগীরা।

১০১. কুমীরের সঙ্গে বিবাদ, বাস করা সলিলে সাধ।

১০২ পোকা পড়ে জীয়ন্ত মাছে ।

১০৩. বলে দিওনা জেতে বাটা।

১০৪. শুনি রুক্মী উঠিল দ্রুত জ্বলন্ত অনলে ঘৃত।

১০৫. টোপ ফেলে মাছ ধরার মত।

১০৬ ইদানীং ডুমুরের ফুল, হয়ে তাতে প্রতিকূল, তোমার প্রতি আমি হতে নারি।

১০৭. ভাড়ানী বেটার আড়ানীর যায সঙ্গে।

১০৮. আমি তোকে জন্মে জানি, বৃন্দাবনে ঢাক বাজালী, কেবল পরের ঘর মজালী, চিরকালের স্বভাব লো।

১০৯. নইলে ঢাকী সহ সহ সহমরণ হত।

১১০. কিন্তু ঢাকে ঢোলে বিয়ে কাঁসিতে মানা।

১১১ তপ্ত জলে পোড়ে না ঘর, জলে কি পচে পাথর ?

১১২. এখন কি আছে সে সবকাল, এখন লাউতে চাপড়ে হারিয়ে তাল।

১১৩ তিনকাল হলে পড়ে মন্ত্রৌষধি ফলে না।

১১৪. তিন বামুনে এক শূদ্রে যাত্রা ক'রে যায় না।

১১৫. তিন বামুনে একত্রেতে যাত্রা করা যায় না।

১১৬. তিন দ্রব্য দিলে লোকে শত্রু বলে লয়না।

১১৭. করিলাম অঙ্গীকার বার বার তিন বার।

১১৮. তিনে নেই তেরোতে নেই, ফাঁকে ফাঁকে থাকিস লো।

১১৯. তিন কাণ্ডনে রাত্রি কাটান ছোঁড়া চেটায় শুয়ে।

১২০. আদ্য শ্রাদ্ধ করে পরে, কেহ করে দানসাগরে, কেহ সারে তিলকাণ্ডনে।

১২১. তিলটি হলে তালটি কর তাকে।

১২২. এখন তুরুপের জোর নেইক হাতে, তাতে আবার ফেরাই (free) কই।

১২৩. আর দেখ মুনি-ঋষি হরি পূজে তুলসীতে, সে তুলসীর কুক্কুরে জানে কি মান ?

১২৪. উষ্মা করি অতিরেক হাতীকে লাথি মারে ভেক।

১২৫ সহরে গিয়ে লিখিয়ে নাম, দ'য়ে মজায়ে পরিণাম, করেন কিনা ব্যাভিচারিণী কর্ম্ম।

১২৬. ঠারো গুয়াপান দিতে হবে কালই।

১২৭. একজন দেয় অন্যে রাজে, ধিক্ ধি অখিল মাঝে বখিলের মৃত্যু কেন নাই ?

১২৮. কত কাকুতি করবো আর দাঁতে ধরবো কুটো !

১২৯. কত কাল কাটাব কান্ড, দন্তে আর দিয়ে দন্ড।

১৩০. এ বেটী সামান্য নয়, মারতে গেলে মরতে হয়, দায়ে যেমন কুমড়ার বিনাশ।

১৩১. নষ্ট নারী যারা দিবসেতে তারা দেখায় তারা।

১৩২. তিনি ভালবাসেন কাজিয়ে, বেড়ান দুকাঠি বাজিয়ে, ঢেঁকি বাহনে মাজিয়ে চলিলেন মুনি।

১৩৩. দুধ দিয়ে কালফণী পুষে আপনি বিষে মরি শেষে।

১৩৪ কীর্ত্তি মেনে রাখলি ভালা, দুধের ছেলে চিকণ কালা তাকে নিয়ে তোর রস লো।

১৩৫. করে মালতির সঙ্গ, তোর কি দুধের তৃষ্ণা খোলে ভৃঙ্গ, হয়েছেরে ভঙ্গ।

১৩৬. গোয়ালার কাছে সবাই ঋণী, হাঁড়িতে পুরে পুস্করিনী, তামাম জল দুধ কই রাখি ?

১৩৭. দুর্গোৎসবে শাঁখের খাদ্য ধোপার নাটে ঢাক ;

১৩৮. দুই হাতে এক হাত হলে পরে, চিঠি বন্দী করে ঘরে।

১৩৯. দেবতাদিগের বেলা লীলা বলে ঢাকে, পক্ষে কোন পাপ লেখা থাকে।

১৪০. হেঁলো বেটী এ কি বেজায়, দোয়া দুধকি বাঁটে যায় ?

১৪১. কিন্তু দোষা বাচ্যা ও রোরপি শাস্ত্র মতে কর।

১৪২. যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা।

১৪৩ ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত।

১৪৪. ধর্ম্মের ঘরেতে চুরি, অধর্ম্মের ঘরে হরি জন্মে যেমন অসম্ভব কথা।

১৪৫ ধর্ম্মের ঢাক ধর্ম্মে বাজায়, থাকবে আর মান বাজায়।

১৪৬. অবলা কি জানে ছিদ্র, কোথা কৃষ্ণ বলভদ্র—পোড়া মুখি ধরে ভদ্র তুই গিয়ে ঘটাস লো।

১৪৭. আগাগোড়া ধোঁকার টাটি, কিছুই নহে সাচা।

১৪৮. লেখা করি দেখেছি অঙ্ক, লাভের বিষয় নবডঙ্ক।

১৪৯. হারায়ে হেমবর্ণ সতী ন ভূত ন ভবিষ্যতি, কি বিচ্ছেদ ভূতপতির উৎপত্তি।

১৫০. এখন লোক উল্টে বলছে কত, সয়ে থাকি চোরের মত, বাঁদীর খপ্পরে হয়েছিল বাধার দোষে।

১৫১. পুরুষকে নারী শিখায় নীত না পড়ে হয় পন্ডিত শুনে পুরুষ গুলো মুর্খ।

১৫২. নায়ে কিরি দিয়ে ডুবে পার।

১৫৩ নালা কেটে আনে জল।

১৫৪. নাক কেটে যাত্রাভঙ্গ কথায় বলে, কাজে আমি তাই করিলাম।

১৫৫. নিত্য ভিক্ষে তনু রক্ষে, তাকেই বলি দুঃখী।

১৫৬. যা হোক হয়েছে বংশ রক্ষা, নাই মামাত অপেক্ষা লোকে বলে কালী মামাটা ভাল।

১৫৭. কি ফল আছে নেঙটা যোগীর ঘরে করে চুরি।

গোপাল উড়ে

১. মিষ্টি কথা বলে কয়ে আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে।

২. আমি যদি মনে করি ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে পারি।

৩. ভেকের মত থাক বসি হাতে দিয়ে।

৪ আছে চাল দেখায়ে ভেড়া গোয়ালে পোরা।

৫. আস্‌কে খেয়েছ যাদু, ফোঁড় ত গণনি।

৬. ইতো নষ্ট ততো ভ্রষ্ট কর্ণেতে শুনি।

৭. রেখেছিলাম তোমার তরে, উড়ে এসে বসল জুড়ে।

৮. দিবি উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা, এ নয় রে তোর কলম ঠেলা।

৯. এক কেঁড়ে দুধে গোবর দিলি কি ক'রে?

১০. গালে চুণ কালি।

১১. একাদশ বৃহস্পতি তোমার এখন শনির দশা।

১২ একি ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে যাদু, চাঁদ ধরি হাত বাড়ায়ে।

১৩. ভোলা সেকি কথার কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা।

১৪ কাটা ঘায়ের নুনের ছিটে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আর দিও না।

১৫. থাকতে হয় গো কাদায় জলে গুণ ফেলে।

১৬. ও দেশে রমণী যত কামাখ্যা ডাকিনীর মত।

১৭ সূচ বেচা কামারের কাছে সে যে মিছে সে যে মিছে।

১৮. কার বা মাথার উপর মাথা, তোমার কাছে করবে হেলা।

১৯. মন কলা খাও মনে মনে কালনেমির মতন।

২০. হৃদে বিষ মুখে মধু, কাষ্ট হাসি হাস।

২১. আমি কি ভাব বুঝতে পারি, তাই ভেবে যাই বলিহারি, ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি জানব কেমনে?

২২. মিষ্টি কথা বলে কয়ে, আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে, কুমীরকে কলা দেখায়ে ফাঁকি দিও না।

২৩. গাছে কাঁঠাল গোপেতে তেল তাকে কি আর আশা আছে।

২৪. গাছে তুলে মই কেড়ে লও, আচকা ফেল অথান্তরে।

২৫. পদ্মের মধু গোবরা খেলে।
২৬. ভেবে দেখ দুকুল মজে, ঘর থাকতে বাবুই ভেজে।
২৭. ঘুঘু দেখেছ চাঁদ, ফাঁদ ত দেখনি।
২৮. ঘোমটার ভিতর খেমটা খানি সাবাস ধনি।
২৯. হয়ে আছে চিনির বলদ সদা আজ্ঞাকারি।
৩০ পাকা আম কাকে খেলে, চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে।
৩১ আগে আমি নাহি জানি, শঠের পিরীতখানি জলের লিখন।
৩২. জলেতে করে ঘরবাড়ী কুমীরের সঙ্গেতে আড়ি।
৩৩. শঠে অশঠে যেমন, দন্তেতে জিহ্বাতে তেমন, জিহ্বা জানে দন্তের বেদন দন্ত জানে না।
৩৪. ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি।
৩৫ আপনি কাঠি পড়বে ঢাকে ঢেকে কি বা ফল।
৩৬. ঢেউ দেখে ছাড়িবে হাল আজি না হয় হবে কাল।
৩৭. তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।
৩৮. দু পক্ষতে আস যাও সমানে দুকাঠি বাজাও।
৩৯. পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের পর দুধের উপর চিনি দিলে।
৪০. দুহাত এক হয়ে যাবে, আই বুড়ো নাম খন্ডাবে।
৪১. বুঝা যায়না কান্না হাসি, অন্তরে গরল রাশি, লোক দেখালে দেঁতোয় হাসি মিষ্ট ভাষী।
৪২. দোটানায় পড়েরে প্রাণ, হবে না প্রেম উপাজ্জর্ন।
৪৩. নুন খেয়ে গুণ গাইলি এ কি।
৪৪ নেই বললে থাকে নাক সাপের বিষ যথা।

ঈশ্বর গুপ্ত

১ আগুনে আগুন দিয়া আগুন নিভাই।
২. পথে পথে মেগে খাবে, হাতে করে খোলা।
৩. এখন কি করে আর হবে মন ভোলা/বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়া খোলা।
৪ চাষার হাতে খোলা দিলে / নীলে সকল জমি নিলে।
৫. শাস্ত্র বলে পরামর্শে, আপন চক্ষে সোনা বর্ষে।
৬. এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতের মেলা।
৭. কঁখে কঁখে খাও আসকে গুণে গুণে ফোঁড়।
৮. উঠে-ধানে পাথ্য যেন না করিতে পারে।
৯. দিয়ে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে বাঙ্গালীকে কাটতে বলে।
১০. এক কানে কথাগুলি প্রবেশ করিয়া, বাহির হইয়া গেল আর এক কান দিয়া।

১১. এক কলসী দুধে ঘোলের ছিটে।

১২. এক হাতে কখনো কি বেজে থাকে তালি ?

১৩. একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব হল সেনা।

১৪. একে মনসার ফোঁসফুসুনি, ধুনোর গন্ধ তায়।

১৫. কোন রূপে দিও রক্ষা এটো কাটা খেয়ে।

১৬. কোষেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া।
কাঁঠাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া ॥

১৭. কলসী হইল শূন্য দেখে পাই ভয়।
গড়াতে গড়াতে জল কতদিন রয় ॥

১৮. কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙে।

১৯. কাকের বাসায় যথা কোকিলের ছানা।

২০. যেমন কাজীরে সুধালে পরে হিঁদুর পরব নাই।

২১. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, পোড়াড় উপর পোড়া।

২২. হরধ্যান ভাঁঙগবারে শবাশন করে, দুটো মানা ঘাড়ে বুঝি রতি নাথ ধরে।

২৩. কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে ?

২৪. লক্ষ্মী ছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়, কুলোর বাতাস দিয়ে করবে বিদায়।

২৫. খুঁড়িতে খুঁড়িতে কেঁচো যদি উঠে সাপ।

২৬. কাঁদিয়া ভিজায় মাটি নয়নের জলে।

২৭. আমার হয়েছে হায় হিতে বিপরীত, কোঁদল করিয়া শেষে কেঁদে কর জিত।

২৮. জান না ভাঙিগলে খাট সার হবে ভূমি।

২৯. খেদাই নে তোর উঠান চষি, বাস্তু বৃক্ষ রাখে নাক।

৩০. আপনি তুলিয়া গাছে কেড়ে লও মইগো।

৩১. দায়ে পড়ে গায়ে পড়ে করিস কোঁদল।

৩২ ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি।

৩৩. গোডিম ভাঙ্গেনি যবে উঠে নাই।

৩৪. পোড়ার উপর পোড়া, যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া।

৩৫. গোলমালে আমি কেন দিব হরিবোল।

৩৬ বৃথায় তিলক ধরে ছাইভস্ম খেয়ে। কসাই অনেক ভাল গোঁসাইয়ের চেয়ে।

৩৭. ঘণ্টা গরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন কাপোড় কাচ।

৩৮. বাহিরেতে কোঁচা লম্বা, আট রম্ভা ঘরে।

৩৯. ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে ঘটায় যত অঘটন।

৪০. আগেতে দেখেছ ঘুঘু,—শেষে দেখ ফাঁদ।

৪১. বাহিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি, এদিকে দুঃখের দায় মনে ঝোলে হাসি।

৪২. জমীদার সব কাছা ঢিলে, ঢিলের মুখে মাছ।

৪৩. খোঁপা বেঁধে পেটা পেড়ে, চোপা করে নথ নেড়ে।

৪৪. ছিলাম চক্ষের বালি আমি হে তোমার।

৪৫ চোরে-থেকো ছোয়া গরু।

৪৬. কথায় কথায় কহে জলে উঁচু নীচু।

৪৭ জলে নাহি তেল মিশে।

৪৮. ভোগা মেরে দাগা দিলে সাধের সময়, জাগা ঘরে চুরি আর এখন কি হয়।

৪৯ স্বভাবে বৈষ্ণব জাতি কি করিবে ভেকে।

৫০. রসনারে করে সদা দশন আঘাত।

৫১ ঠাটের ঠাকুর নট, নাটের গোঁসাই।

৫২. হল ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা।

৫৩. ডুব দিয়ে জল খায় শিব নাহি টের পায়।

৫৪ ডুবিয়াছি দেখিব পাতাল কতদূর।

৫৫. ঢেঁকি ভঁজে স্বর্গলাভ শুনে হাসি পায়।

৫৬ বদর বদর গাজী সুখে সদা বলে মাঝি।

৫৭ ললনা, তোমার কাছে ছলনা কি খাটে, তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে।

৫৮ তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায়, তোমার চাতুরী বোঝা যায় কিনা যায়।

৫৯. একেবারে থোতা মুখ হয়ে গেল ভোঁতা।

৬০. তারা মলেই দফা রফা এককালে সব ফুরায়ে যাবে।

৬১. গোচে গাচে বাবু হল পচা শাল খেয়ে।

৬২. পায়ে কত পড়িয়াছি দাঁতে করে কুটো।

৬৩. কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

৬৪ তখন কোঁদাল রাখ ধামা চাপা দিয়ে।

৬৫. ফুলায় বুকের ছাতি যেন নবাবের নাতি।

৬৬. নাকে খত কানে খত, ছলে সুদে লিখে যত আপাতত দূর করে ছল

৬৭. পর যাত্রা ভঙ্গ করি কেটে নিজ নাক।

৬৮. পরিণামে হরিনাম শাস্ত্রে এই রটে।

৬৯. নুন খেয়ে গুন গেয়ে কাছে থাকো তার।

॥ চার ॥

॥ আধুনিক বাঙলা কাব্যে লৌকিক উপাদান ॥

ঈশ্বর গুপ্ত

ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাংলার কবি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "খাঁটি বাঙালী কথায় খাঁটি বাঙালীর মনের ভাব তো খুঁজিয়া পাইনা তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাংলা।" ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালী আবার তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের অগ্রদূত। একদিকে প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতি অন্য দিকে আধুনিক বাঙালী-মানস ঈশ্বর গুপ্ত একত্রিত। লোক ঐতিহ্যের চিহ্ন ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিটি অংগে। তাঁর কাব্য সংগ্রহের অনেকটাই বাংলা গ্রাম্য সাহিত্য বা লোকসাহিত্য থেকে আহৃত, লোকায়ত উপাখ্যানে সমৃদ্ধ।

বাংলা বাউল গানে 'মনের মানুষ' একটি বিশিষ্ট প্রচলিত শব্দ।

যেমন,

> আমি খুঁজে বেড়াই তারে
> যে মনের মানুষ ওরে,
> হারায়ে সেই মানুষে,
> খুঁজে ফিরি দেশে বিদেশে।

অথবা,

> আছে যার মনের মানুষ
> মনে সে কি জপে মালা
> অতি নির্জনে বসে
> সে দেখছে খেলা।

ঈশ্বর গুপ্তের পরমার্থিক ও নৈতিক কবিতাবলীর একটি কবিতার নাম 'মনের মানুষ'।

> 'মনের মানুষ কোথা পাই'।

কিংবা 'মন হয়ে তুমি কার যোগাতেছ মন', ইত্যাদি বাউল গানে মনকে 'ভ্রমরের' সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের একটি কবিতায়—

> শুনরে ভ্রমর-মন কি ভ্রম,
> কি ভ্রমে কি ভ্রমে, কি ভ্রমে কি ভ্রম ॥
> করুণা কুমুদ—আমোদ ভুলে
> মজিলে কামনা—কমল-ফুলে ॥

অথবা বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র—

'চার টাকা'মন দর উঠেছে নূতন চেলে
কত আর চলবো নূতন চেলে ?
যাদের নাহি পুঁজিপাটা গিয়ে বেলেঘাটা
বাড়ীর পাটা বেচে পেটে খেলে ॥'

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক, তাই কৃষি সংস্কৃতি মানেই লোক সংস্কৃতি। পৌষপার্বণ এই কৃষিভিত্তিক সমাজের লোকসংস্কৃতির একটি লোকউৎসব। ঈশ্বর গুপ্তের পৌষপার্বণ কবিতায় এই লোকসংস্কৃতির ও লোকউৎসবের অনেক চিহ্ন বর্তমান। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন—

বাউঁলি আউঁলি ঝড়া পোড়া আখ্যা।
মেয়েদের নবশাস্ত্র অশেষ প্রকার ॥

অথবা

তাজা তাজা ভাজা পুলি ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে ॥
আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছি পিঠে পুলি অশেষ প্রকার ॥

লোকসংগীত প্রসঙ্গে H. E. Krebial বলেছেন, "The truest and the most intimate folk music is that produced by suffering. বারামাস্যা সংগীতের প্রসঙ্গে এই উক্তি বোধহয় সর্বাধিক প্রযোজ্য। বারামাস্যা গান বাংলার লোকায়ত জীবনের নারীমনের কামনা বাসনার সুর ভারতী। মিলনের চেয়ে বিরহে, সুখের চেয়ে দুঃখেই, লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের প্রকাশ স্ফূর্তি। প্রকৃতির পটভূমিকায় দাড়িয়ে বাংলার লোকনারী তার মনের কামনা বাসনাকে ঢেলে দিয়েছে বারমাস্যা গীতের মধ্যে।

'কইও কইও কোকিলারে কইও বঁধুর আগে
গাঁথামালা বাসি হইলে প্রাণে বড় লাগে
যদি নাহি যাওরে কোকিল আমার মাথা খাও,
অভাগিনী লীলার দুঃখ বঁধুরে বোঝাও।

ঈশ্বর গুপ্তের 'ঋতুবসন' শীর্ষক কবিতাগুলিতে পরিপূর্ণ বারামাস্যার অনুসৃতি। 'বসন্ত' বর্ণনায় দেখি লীলার হৃদয়ে মানসেরই প্রতিধ্বনি।—

বাউল গানে 'প্রাণপাখী', 'হৃদয় পিঞ্জর' ইত্যাদির উল্লেখ আছে। যেমন,

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন—বেড়ী দিতাম তার পায়।

ঈশ্বর গুপ্তের 'তত্ত্ববোধ' কবিতায় আমরা এই কথাটির উল্লেখ পাই। যেমন,

'হৃদয়ে পিঞ্জরে রাখি কপাট আঁটিয়া
তবু কোথা উড়ে যাও শিকল কাটিয়া ॥'

বাউল গানে অনেক সময় ভবকে পারাবারের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। যেমন,—

'ভব নদীর অকূল পাথার
আমি তো জানিনা সাঁতার
ওগো, আমারে মাইর না চুবাইয়া।'

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সেই লোক ঐতিহ্যের উদাহরণ। যেমন,—

'একূল ওকূল বুঝি হারায়ে দুকূল
আসিয়া ভবে কূলে ভাবিয়া ব্যাকুল
আগেতে না ভাবিলাম নামিলাম ঘাটে
অকূল পাথার হয়ে সাঁতার কি কাটে॥'

গম্ভীরা গান, সমসাময়িক বিষয় বস্তু নিয়ে রচিত। এটি উত্তরবঙ্গের একটি প্রচলিত লোকসংগীত। মহাদেবকে কেন্দ্র করে চৈত্র মাসের শেষে যারা বৎসরের দুঃখ কষ্ট শিবের কাছে নিবেদন করে। যেমন,—

'প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব গোলাতে নাই ধান
কি দিয়া বাঁচাবো ও শিব, ছেলে পিল্যা জান।
ও বুড়াশিব দয়া কর।'

ঈশ্বর গুপ্তের দুটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে বুড়োশিবের বদলে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তারই আড়ালে বিষয় বস্তু ও প্রকাশরীতির দিক থেকে গম্ভীরা গানের সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। যথা, নীলকর অত্যাচারের চিত্র—

'কোথা রইলে মা, ভিক্টোরিয়া, মাগো মা,
কাতরে কর করুণা।'

অথবা,

'তোমার সাধের বাংলা হল কাংলা
সহেনা অত্যাচার
বেগারে হয় রেয়ৎ সারা, জমিদার পড়ে মারা,
লাটের দিন খাজনা হয়না আর॥

অথবা 'বসন্তের বর্ণনায়'—

কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল কুহরে
শ্রবণে শ্রবণে বিহাগীর প্রাণ হরে।
তরুলতা মুঞ্জরে গুঞ্জরে অলিকুল
বেরবে কি রবে প্রাণে বিরহে আকুল॥

'বারমাস্যা' লোকসংগীতের শেষ অংশে গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতার কথা—

দারুণ গ্রীষ্মের তাপ জলন্ত অঞ্চল
ভূতলে শুইলো কন্যা পাতিয়া অঞ্চল।

ঈশ্বর গুপ্তের গ্রীষ্ম বর্ণনায়—

প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ
শূন্য হতে পড়ে যেন অনলের চাপ

'ঝুমুর' বাংলার লোকসংগীতের একটি প্রধানতম বিষয়, পুরুলিয়া বাঁকুড়া, মানভূমি ও সিংভূমের প্রত্যন্ত প্রদেশে এই ঝুমুর গানে প্রচলিত। ঈশ্বর গুপ্তের বহু গানে ঝুমুরের ঢং বর্তমান। বিষয়বস্তু ও রচনারীতির দিক থেকে কতকগুলিকে সত্যকারের ঝুমুর বলাই সঙ্গত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রচলিত ও জনপ্রিয় রূপই ঝুমুরের মধ্যে অনুসৃত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ প্রয়োজন।—

'হে নটবর সরো হে সরো
ছি ছি কি কর বসন ধরো।
আমি অবলা গোপের বালা
হলো কি জ্বালা ছুয়ো না কালা। [কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা]

কিংবা,

অসময় কেন আজ আমারে
ডাকো রসময় হে,
অবলা সরলা বালা, কত জ্বালা সয়
প্রাণে কত জ্বালা সয় হে ॥

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি আদিমতম বিষয় বস্তু। সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লোক-শ্রুতিবিদ বলেছেন,—অর্থাৎ ধাঁধা হচ্ছে পূর্ব অনুসৃত বা পূর্বজ্ঞাত ভাষা ও পরিণত চিন্তার একটি সংগীতময় রূপ যা একটি মাত্র রূপকের সাহায্যে এবং জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশ হয়ে থাকে। ঈশ্বর গুপ্তের বহু কবিতার মধ্যে বিষয়বস্তুগত রূপগত এবং শিল্পগত ধাঁধার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একদিন যা লোকজীবনের স্তরে স্তরে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল পরবর্তীক্ষেত্রে তা সাহিত্যিকের কলমে ধরা পড়েছে। মধ্য যুগের বহু কবির কাব্যে এই ধাঁধার প্রতি মোহ লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্ববিদ একেই Folk motife বলেছেন, এবং এইরূপ ধাঁধার নাম দিয়েছেন Literary riddle বা সাহিত্যিক ধাঁধা। মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল"-এ বর্ণিত আছে যে, বাকশক্তি সম্পন্ন এক শুকপাখী ব্যাধ কর্তৃক ধৃত হয়ে তারই নির্দেশ মত রাজসভায় আনীত হলে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে রাজাকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে লাগল, সভার পণ্ডিতগণ তাদের মীমাংসা করতে লাগলেন। ধাঁধাগুলি এই—

(১) বিধাতা নির্মাণ ঘরে নাহিক দুয়ার
তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার
যখন পুরুষবর হয় বলবান,
বিধাতার সৃজন ঘরে করে খান্ খান্ ॥ (ডিম্ব)

(২) মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যত্নবান,
অপরাধ বিনে তার করে অপমান।
অপমানে গুণ তার কখন না যায়
অবশ্য করিয়া দেয় সম্বল উপায়॥ (ধান)

(৩) বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছ পল্লব নয় কিন্তু অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডিত বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥ (পাখি)

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি রামকৃষ্ণ রায় রচিত 'শিবায়ন' বা শিবমঙ্গল নামক কাব্যে শিবের বিবাহ বর্ণনা উপলক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋষি পত্নীগণ বাসর-গৃহে শিবকে আটটি ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হল—

যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষণ
গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন॥
নারি সম্বোধন মাত্র নহে স্ত্রী জাতি।
শস্য উপজে তাহে নহে সেই ক্ষিতি॥
হর, বুঝ প্রহেলিকা, হর বুঝ প্রহেলিকা।
জিজ্ঞাসে তোমারে এক পাটলা বালিকা॥ (নারিকেল)
একরূপে দুই ভাই বৈসে দুই দেশে।
চিনা পরিচয় নাই জন্মের বয়সে॥
ও চলিতে এই চলে তার পাছে পাছে।
দেখা দেখি নাঞি মাত্র থাকে কাছে কাছে॥
তুমি বুঝহ হেঁয়ালী তুমি ব ঝহ হেঁয়ালী।
একপনা বলে নহে দিব হাত-তালি॥ [চক্ষু]

ঈশ্বর গুপ্তের 'পাঁঠা' কবিতায় এই ধাঁধার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—

'চাঁদ মুখে চাপদাড়ি গালে নাই গোঁপ,
শৃঙ্গ খাঁড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে খোপ।
সে সময় অপরূপ মনলোভা শোভা
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র কথা কয় বোবা॥

"এন্ডাওয়ালা তপসে মাছ" কবিতায়—

'কষিত কনক কান্তি কমনীয় কায়,
গালভরা গোঁপদাড়ি তপস্বীর প্রায়,,
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে,
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে
পাখী নও কিন্তু এর মনোহর পাখা
সুমধুর মিষ্টরস সব অঙ্গে মাখা॥

আনারস কবিতায়—

বন হাতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥
এমন মোহন মূর্ত্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপে অনুরূপ নাই ॥
ইষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু তার গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায় ॥

উপরোক্ত কবিতা তিনটির বর্ণনা ও ভঙ্গিমা ধাঁধার মতো, তিনটির উত্তর যথাক্রমে 'পাঁঠা' 'তপসে মাছ' ও 'আনারস'। কিন্তু কবিতার মধ্যে কোথাও তাদের নামোল্লেখ নেই। হেয়ালীর মাধ্যমেই তা বলা হয়েছে এবং মীমাংসাটি সুচতুর বর্ণনা দ্বারা গোপন করা হয়েছে।

Aristotle প্রবাদকে Fragments of an elder wisdom বলেছেন। অর্থাৎ Proverb is a short sentence based on long experience'. প্রবাদ দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম অভিব্যক্তি। একদিক দিয়ে প্রাচীন অন্য দিক দিয়ে আধুনিক। এই প্রবাদ বা প্রবচনের ব্যবহার আধুনিক যুগে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। অনেকে বলেন আধুনিক ভাষার সজীবতার লক্ষণ তার প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারে। ঈশ্বর গুপ্তের এই ব্যবহার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি ছোট তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে।

১. 'ওমা একে মনসার ফোঁস ফুসুনি
ধুনোর গন্ধ তায়।' [নীলকর ১ নং গীত]

২. 'যেখানেতে বাঘের ভয়।
সেইখানেতে সন্ধ্যা হয়।' [৩ নং গীত]

৩. 'এই তো কলির সন্ধ্যা।' [দুর্ভিক্ষ ১ নং গীত]

৪. 'একে রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব তায় মিতে।' [করণপুরের যুদ্ধ জয়]

৫. 'বংশে যেন বাতি দিতে নাহি থাকে কেহ।' [ঐ]

৬. 'হাড়ে মাটি ঘাড়ে দুর্ব হলো একেবারে।' [ঐ]

৭ 'মেকীর নিকটে লবে ধর্মের বিধান।' [ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম]

॥ পদ্মিণী উপাখ্যান ॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গলালের পদ্মিণী উপাখ্যান বাঙলা আধুনিক কাব্য সাহিত্যের আগমনী-সঙ্গীত। রঙ্গলালের পদ্মিণী-উপাখ্যান ঐতিহাসিকতার আড়ালে লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসরণ। বিশেষ করে ক্ষত্রিয়গণের রাজা ভীম সিংহের উৎসাহ বাক্যগুলি রাজপুতানার চারণ-

গীতির আকারে রচিত। এই চারণ-গীতি রাজস্থানের লোক সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে। চারণ-গীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য অতীত ঐতিহ্যের বর্ণনা, জাতির গৌরবের প্রতি আস্থা দান, জাতির মনে ও প্রাণে উদ্দীপনা সৃষ্টি। কবিতাংশটি উদ্ধৃত করলে এর সপ্রমাণ হবে। যথা :

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়।
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে
ক্ষত্রিয় তনয় ॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে
হৃদয় নিলয়।
নিমাইবে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে
বিলম্ব কি সয় ?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে
সাজ সাজ সাজ ॥
চল চল চল সবে, সমর সমাজে হে
সমর-সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে
ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে
রাজপুতানার।
সকল শরীরে ছুটে রুধিকের ধার হে
রুধিকের ধার
সার্থক জীবন আর বাহু বল তার হে
বাহু বল তার।

আত্মনাশে সেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার।
কৃতান্ত, কোমল কোলে আমাদের স্থান হে
আমাদের স্থান।
এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে
হইব শয়ান ॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের বিধান হে
ভয়ের বিধান ?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতিক্ষয় বেদের বিধান হে
বেদেব বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষাকু বংশে কত বীরগণ
কত বীরগণ।
পরহিতে দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাদের সব কীর্ত্তি বিবরণ হে
কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে ?
ক্ষত্রিয়-নন্দন ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাইহে
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মরি চিতোর না পাই হে
চিতোর না পাই।
স্বর্গ সুখে সুখী হব, এস সব ভাই হে
এস সব ভাই ॥" পৃঃ ৯৪

এ ছাড়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতি কুসুমাঞ্জলি' কাব্যসংকলনের অধিকাংশ কবিতা প্রাচীন শাস্ত্রাদি থেকে সংকলিত হয়ে অনুবাদিত হলেও এর বিষয় ও প্রকাশ রীতি নীতি মূলক ছড়ার পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণ উপস্থিত করলে এর সপ্রমাণ হবে, যথা :

১. রোহিত রোহিত দর্প গভীর পঙ্করে
একাঙ্গুল জলে পুষ্টি ছটফট করে ॥

২. শুভাশুভ কর্ম্মফল কালেতে উদয়
শরদেই আস্ত ধান্য বসন্তে না হয় ॥

৩. কভু ভূমি শয্যা কভু পালঙ্কে শয়ন।
কভু শাকাহার কভু পরান্ন ভোজন ॥
কভু ছেঁড়া কাঁথা কভু বিনোদ বসন।
ইথে সুখ দুঃখ জ্ঞানি না করে গমন ॥

মধুসূদন দত্ত

মহাকাব্যের অনুসরণ এ কথার সপ্রমাণ করে যে মধুসূদনের মধ্যে পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতির ধারাটি স্পষ্ট। কিন্তু আর একটি অস্পষ্ট ধারার স্রোত মধুসূদনের অন্তর্মানসে অলক্ষিতে প্রবহমান। সেটি লৌকিক ধারার স্রোত। আধুনিক সমালোচক হয়তো এ কথাতে বিস্মিত হতে পারেন। কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে খৃষ্টান হয়েও মধুসূদনের সেই হিন্দুত্বের একটা প্রচ্ছন্ন শাখা নিহিত আছে লৌকিক ঐতিহ্য অনুসৃতির মধ্যে।

কানু বিনা গীত নাই— বাংলা দেশের এই প্রচলিত প্রবাদটি মধুসূদনের ক্ষেত্রেও অপ্রযোজ্য নয়। কবি যতই পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হন না কেন কদম্বমূলে রাধিকার মনের মুরলীধ্বনি তাঁকে ব্যাকুল করেছে। শ্রীরাধার মত তিনিও সমস্ত সমাজ সংসারকে অতিক্রম করে বলে উঠেছেন—'যাক্ মান থাক কুল মনতরী পাবে কূল।'

'চলো ভাসি প্রেমনীরে ভেবে ও চরণ।' অর্থাৎ পাশ্চাত্য মনোধর্মী মধুসূদনকেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধুর মূর্তি রচনা করতে হয়েছে। আর এটাও স্থির স্বীকৃত যে এই রাধাকৃষ্ণ সংগীত রাখালিয়া প্রেম সংগীতেরই অনুবর্তন। লৌকিক জীবনের স্তরে স্তরে এর স্পন্দন। লৌকিক ঐতিহ্যের চিহ্ন এর সর্বাঙ্গে। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বাংলা দেশের ঝুমুর গানের অনেক প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। প্রত্যক্ষ প্রভাব এর আংগিকের মধ্যে আর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব এর ভাবে। কবির বিষয়বস্তু যে লৌকিক রাখালিয়া প্রেমসংগীতেরই অনুবর্তন একথা আগেই বলা হয়েছে। উদাহরণ দিলে একথাটি স্পষ্ট হবে।

একটি ঝুমুর গানে দেখা যায়—

"আমি যাইবে যমুনার জলে
দেখা হলো কদমতলে
মরি ওগো আমার সেই চিকন কালা।
একূল ওকূল ওই কালাচাঁদ ভব কুলের ভেলা
গৃহে আমার মন মানেনা বিনে কদমতলা ॥
কোথায় হে নিঠুর কালিয়া কেন রইলে
মোরে ভুলিয়া
আসিব বলে আশা দিয়ে গেল সে
আশাতে রইলাম বসিয়া।

চাতকিনী মত হেরিয়াছি পথ
দিবস রজনী কাঁদিয়া ॥

উপরোক্ত দুটি ঝুমুর গানের সঙ্গে মধুসূদনের একটি কবিতার অন্তর্নিহিত মিল লক্ষ্য করা যায়—

"নাচিছে কদম্ব মূলে বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকা রমন।
চল সখি ত্বরা করি, দেখগে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি সজনী শুনি জলধর ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকিলো এখন ?
যাক্ মান, যাক কুল মনতরী পাবে কুল
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবেও চরণ।"

ঝুমুর বাংলার লোক সংগীতের একটা প্রধানতম বিষয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মানভূমি ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ঝুমুর গান প্রচলিত। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার বহু কবিতায় ঝুমুরের ঢং বর্তমান। বিষয়বস্তু ও রচনা রীতির দিক থেকে কতকগুলি সত্যকার ঝুমুর বলাই সংগত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রচলিত ও জনপ্রিয়রূপই ঝুমুরের মধ্যে অনুসৃত। কয়েকটি উদাহরণ দিল একথার স্পষ্টতঃ প্রমাণ হবে। একটি ঝুমুরের গানে দেখা যায়—

'বৃন্দে সই
আসবে বলে প্রাণ কালিয়া নিশি জেগে রই
আজ আসবে কালা আসবে বলে
পথপানে চেয়ে রই।'

মধুসূদনের একটি কবিতার রীতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে উপরোক্ত ঝুমুরের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি।

"কি কহিলি কহ, সই, শুনিলো আবার মধুর বচন
সহসা হইনু কালা জুড়া এই প্রাণের জ্বালা
আর কি এই পোড়া প্রাণে পাবে সে রতন।
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ নালো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?"

একটি ঝুমুর গান—

শুন হে কালশশী,
কি জন্য বাজাও বাঁশীরে রে – অবলারে,
আবায় দিতে এলে জ্বালা য়ে—অবলারে।

কিংবা

"আমায় দিতে এলে জ্বালা
তোমার দ্বিগুণ জ্বলে
তোমার হয়েছি বামে—অবলারে,"

মধুসূদনের 'বংশীধ্বনি' কবিতার বিষয় বস্তু মূলতঃ একই—

"কে ও বাজাইছে বাঁশী, সজনী
মৃদু মৃদুস্বরে নিকুঞ্জ বনে,
নিবার উহারে, শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে,
এ আগুনে কেনে আহুতি দান ?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?

উপরোক্ত কবিতাগুলি আমরা বিচার করলে মধুসূদনের কাব্যভাবে ও কাব্যদেহে লৌকিক প্রভাব আবিষ্কার করতে পারব। প্রথমতঃ বিষয়বস্তুতে কদম্বমূলে রাধিকার-রমণের বংশীধ্বনি এবং তজ্জনিত শ্রীরাধার যে আর্তি ও বিরহ প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে ঝুমুর গানের মিল সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ আংগিকের দিক দিয়ে লক্ষ্য করা যায় বাংলা দেশের মধ্যযুগে যে বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছিল তার সঙ্গে এই পদগুলির মিল খুবই অল্প, বরং প্রচলিত লৌকিক গীতের সঙ্গে এর মিল খুব বেশী লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ভাষার ক্ষেত্রে বলা চলে ঃ 'সজনী, বৈরজ, পিরিত লো' ইত্যাদি ব্যবহার লৌকিক ভাষাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তৃতীয়তঃ একটি কবিতায় 'পীরিতের ফুল ফাঁদ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। বা অপর একটি কবিতায় 'মরণের ফাঁসী' অলংকার ব্যবহার করেছেন। এগুলি লৌকিক অলংকার রীতি। চতুর্থতঃ অনুপ্রাস ব্যবহারের মধ্যেও লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। যথা (১) 'চল সখি, ত্বরা করি', (২) 'যাক্ মান, যাক্ কুল', (৩) 'মনিহারা ফনিনী কি বাঁচে লো সজনী'? এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায়, যেমন একটি ক্ষেত্রে 'আমার প্রেম সাগর, দুয়ারে মোর নাগর' কথাটির মধ্যে ঝুমুর গানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঝুমুর গানে নাগর শব্দটির ব্যবহার খুব বেশী লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ

"শুন হে নাগর কালা, দিলি হে দারুণ জ্বালা।"

কিংবা

"তোমার লাজ নাই হে, খেয়েছো লাজের মাথা হে.
যাও নাগর নিশি ছিলে যেথা।"

কোন দেশ লৌকিক সংস্কৃতি থেকে খুব বেশী উর্দ্ধাচারী হতে পারে না। লৌকিক ঐতিহ্যের আবহাওয়াতে সে লালিত পালিত এবং সম্বর্দ্ধিত হয়। কবির অজান্তেই এই লৌকিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কাব্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। সুদূরে ফ্রান্সে অবস্থান করেও কবির অন্তর থেকে লোকজীবনের উপাদান সম্পূর্ণ বহির্গত নয়।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর নামকরণ থেকেই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। (১) কমলে কামিনী (২) অন্নপূর্ণার ঝাঁপি (৩) বৌ কথা কও (৪) দেবদোল (৫) আশ্বিন-মাস (৬) বিজয়া দশমী (৭) কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা (৭) বটবৃক্ষ (৯) শ্যামাপক্ষী।

কবি বঙ্গভাষা কবিতায় বলেছেন, পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি করে কমলকানন মনে করে তিনি শৈবালে কেলি করেছেন। আর 'মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণি জালে' তিনি আবদ্ধ হয়েছেন। পাশ্চাত্য ভাষাজগৎ থেকে ঐ যে দেশজ ভাষাজগতে কবির উত্তরণ, একে বলা যেতে পারে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি কবির শ্রদ্ধাবোধের পূর্ণ জাগরণ।

'কমলেকামিনী' কবিতায় কবির স্বপনে কালিদহে কমলেকামিনী দর্শন ও কবিকঙ্কনের প্রতি শ্রদ্ধাদান—

কবিতা পঙ্কজ রবি শ্রীকবিকঙ্কন
ধন্য তুমি বঙ্গভূমি।

'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' কবিতায় মোহিনী রূপসী বেশধারী ঝাঁপি সহ অন্নদার আবির্ভাবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাচ্ছেন। কিন্তু কবি যখন বলেন, 'চঞ্চলা ধনদা রমা ধন চঞ্চল' তখন লৌকিক প্রবাদের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

'দেবদোল' কবিতায় কবি যখন বলেন—

"আসিছেন সবে হেথা এই দোলাসনে
পূজিতে রাখালরাজ রাধা ধনোহর।"

'বিজয়া দশমী' কবিতাটি শাক্ত পদাবলীর ঐতিহ্য অনুসারী হলেও এর মধ্যে লৌকিক প্রভাব বা শাক্ত পদাবলীর জনপ্রিয় রূপটা এখানে লক্ষ্য করা যায়।

"বার মাস তিতি, সখি নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি। কি সান্ত্বনা ভবে—
তিনটি দিনেতে কইলো তারা কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ জ্বালা কেমনে জুড়াবে",

'কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা' কবিতাটির সর্বাংগে লোক সংস্কৃতির চিহ্ন। কবি জিজ্ঞাসা করেছেন, 'জান নাকি কোন ব্রতে, লো সুরসুন্দরী রত ও নিশায় বঙ্গ।

কিংবা কবি যখন বলেন,—

'পূজে কুতুহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এ বে, নিদ্রাপরিহরি
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল পরিমলে।
ধন্য তিনি ও পূর্ণিমা ধন্য বিভাবরী।'

এর মধ্য থেকে লোক সংস্কৃতির চিহ্নগুলি খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। লক্ষ্মী পৌরাণিক দেবী হলেও কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা আমাদের লৌকিক অনুষ্ঠান। শঙ্খধ্বনি সহকারে ধূপ ও ফুলসহ পূর্ণিমা তিথিতে দেবীর আহ্বান লোকজীবনের বন্দনা মাত্র।

লোক সঙ্গীত প্রসঙ্গে H. E. Krebial বলেছেন, "The truest and most intimate folk music is that produced by suffering." বারমাস্যা

সংগীতের প্রসঙ্গে এই উক্তি বোধ হয় সর্বাধিক প্রযোজ্য। বারমাস্যা গান বাংলার লোকায়ত জীবনের নারী মনের কামনা বাসনার সুরভারতী। মিলনের চেয়ে বিরহে, সুখের চেয়ে দুঃখে, লোকজীবনের ও লোকসাহিত্যের প্রকাশ-স্ফূর্তি প্রকৃতির পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মনের কামনা বাসনাকে ঢেলে দিয়েছে বারমাস্যা গীতের মধ্যে।

'কইও কইও কোকিলারে কইও বঁধুর আগে
গাঁথা মালা বাসি হইলে প্রাণে বড় লাগে ॥
যদি নাহি যাওরে কোকিল আমার মাথা খাও
অভাগিনী লীলার দুঃখ বঁধুরে বোঝাও।'

মধুসূদনের খণ্ড কবিতাগুলির মধ্যে আমরা কয়েকটি ঋতুবর্ণনামূলক কবিতা লক্ষ্য করি যার মধ্যে বারমাস্যার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। অবশ্য সকল ঋতুর বর্ণনা সেখানে নেই, কিন্তু কয়েকটি ঋতুবর্ণনামূলক কবিতায় লৌকিক বারমাস্যার প্রভাব বর্তমান। বর্ষাকালে কবিতায়—

"গভীর গর্জনে নদী করে কলরব,
উথলিল নদ নদী ধরণী উপর।"

লৌকিক বারমাস্যার আষাঢ়ের সেই মেঘের গর্জন—

"আষাঢ়ের নবীন মেঘ ডাকে গরজিয়ে
এত দুঃখ দিলে বিধি মোর মাথা খেয়ে ॥"

কিংবা 'হিমঋতু' কবিতায়—

"হেমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত
বামাগণ ভাবে মনে সকলে দুঃখিত।
মনাগুণে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিখিল প্রেমের অগ্নি নাই জ্বলে আর ॥"

একটি লৌকিক বারমাস্যায় এরই প্রতিধ্বনি—

"কার্তিকে কাটাল নারী কাতরে কাতরে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ প্রাণ বিদেশে ॥
অঘ্রাণে নয়া নতুন, পৌষে বাড়ে দ্বিগুণ
মাঘের শীত লাগল নারীর অঙ্গেতে পিঠেতে।"

Folk tale বা লোককথার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। উপকথা তার একটি শ্রেণীবিভাগ। এগুলিকে ইংরাজীতে বলা হয় Animal tale। সাধারণতঃ এগুলি পশুপক্ষী নিয়ে রচিত। সাধারণতঃ এতে পশুপক্ষীর নির্বুদ্ধিতার দ্বারা কৌতুক সৃষ্টি করা হয়। এই গল্পগুলির সঙ্গে নীতির (moral) যোগ থাকাতে ইংরাজীতে Fable এবং বাংলায় নীতিকথা বলা হয়। মধুসূদনের কতকগুলি শিশুপাঠ্য কবিতার নামকরণ হয়েছে নীতিগর্ভ বাক্য। কাব্যগুলির নাম 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগাল', 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'অশ্ব ও কুরঙ্গ', 'কুক্কুট ও মণি', 'সূর্য ও ধমনাকগিরি', 'মেঘ ও চাতক', 'পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু', 'সিংহ ও মশক' ইত্যাদি।

উপরোক্ত কবিতাগুলিতে উপকথা ও নীতিকথার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনকে অর্থের জন্য মাঝে মাঝে শিশুপাঠ্য কবিতা লিখতে হতো। হয়তো এই কবিতাগুলি লেখার সময় শৈশবের মাতৃমুখনিঃসৃত উপকথাগুলি তাঁর স্মরণপথে উদিত হয়েছিল। তাই এই কবিতাগুলির সর্বাংগে উপকথা ও নীতিকথার ছাপ বিদ্যমান। কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত, যার সংগে উপকথা ও নীতিকথার আশ্চর্য যোগ আছে। প্রথমতঃ কবিতাগুলি কাহিনীমূলক। দ্বিতীয়তঃ উপকথার মতই এই কাহিনীর অধিকাংশ চরিত্রগুলি পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা ইত্যাদি অর্থাৎ মনুষ্যেতর জগৎ থেকে আহৃত। তৃতীয়তঃ, উপকথার মত কোন কোন ক্ষেত্রে মনুষ্যকে পাত্র পাত্রী করা হয়েছে। চতুর্থতঃ উপকথার মতই এই কবিতাগুলি সংলাপপ্রধান অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে এই কাহিনীগুলি অগ্রসর হয়েছে। পঞ্চমতঃ এই মনুষ্যেতর জীবগুলির আচার আচরণ ও সংলাপ মনুষ্যকল্প। স্পষ্টতঃ প্রতিটি কবিতার শেষে একটা নীতিবাক্যও আছে, যা নীতিকথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে কবি এই ভনিতাটি ব্যবহার করেছেন। যেমন—'এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে'। নীতি-বাক্যগুলি নিম্নলিখিত ঃ

ময়ূর ও গৌরী—"নিজ অবস্থায় সদাস্থির যার মন
তার হতে সুখীতর অন্য কোন জন।"

রসাল ও স্বর্ণলতিকা- "উর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে
করিও ঘৃণা তবু নীচশির জনে।

কুক্কুট ও মণি--"মূর্খ যে বিদ্যার মূল্য কভু সে জানে
নরকুলে পশুবলি লোকে তারে মানে।"

মেঘ ও চাতক—"যাহা চাহ লহ তা সদা নিজ পরিশ্রমে।"

সিংহ ও মশক - "ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে
বহুবিধ সংকটে সে ফেলাইতে পারে।"

মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যের প্রয়োগোক্তিতে লোকায়ত জীবনধারার পরিচয় দিয়েছেন।

(১) একাকিনা বিরহিনী বিষণ্ণবদন
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।

(২) বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি
বিজয়া দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতে যে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রানন।

(৩) আহা মরি সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিশ।

(৪) কৌটা খুলি রক্ষোবধু যত্নে দিল ফোঁটা
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি ললাটে আহা তারা রত্ন যথা

(৫) কিম্বা দীপালী—
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্বণে
হর্ষমল্ল বঙ্গ যবে মায়েরে
চিরবাঞ্ছিত।

(৬) রাক্ষসবধূ মৃগাক্ষী গঞ্জিনী
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবর কূলে
সুবর্ণ কলসী কাঁখে মধুর অধরে
সুহাসি।

(৭) পরম যত্নে কুড়াইয়া যবে
ভস্ম অম্বুরাশি তটে বিসর্জিলা তাহে
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে

(৮) সাজিছে নন্দীর ছন্দে প্রভাতী বাজনা
হায়রে সুমনোহর বঙ্গ গৃহে যথা
দেয় দোলোৎসব বাদ্য।

(৯) কিম্বা রে যমুনে
ভানুমতে বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে
গোপবধূ সঙ্গে রঙ্গে তোর চারুমূলে।

এর মধ্যে থেকে একটি জিনিস দেখা যায়, মধুসূদনের চোখে বাঙলাদেশ কি নিবিড় ভাবে ধরা দিয়েছে। বাঙলাদেশের শক্তি ও ভক্তির মধ্যে যে যুগ্মধারা প্রবাহিত, শাক্ত বৈষ্ণব প্রাণের যে সম্মেলন, তা মধুসূদনের মধ্যে বৈষ্ণব প্রাণের কাছে যমুনাতীর, রাধাবিরহ, মাধবশূন্য ব্রজধামের যে ঐতিহ্য মধুসূদন তাকে গ্রহণ করেছেন; আবার বাঙালী প্রাণে দুর্গোৎসব, দীপাবলী যে ধর্ম তাও অস্বীকার করতে পারে নি।

মধুসূদনের কাব্যের বিভিন্নস্তরে লোক ঐতিহ্য বিদ্যমান। নাটকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়নি। শর্মিষ্ঠা তাঁর প্রথম নাটক। এই নাটকের কাহিনী পুরাণ সম্মত হলেও নাটকের বিভিন্ন অংশে গানেব ব্যবহার লোকসংগীতের সংগে বিষয়বস্তুগত ও আংগিকগত মিল লক্ষ্যণীয়। যেমন একটি গান ঃ

'আমি ভাবি যাব ভবে, সে তো তা
ভাবেনা।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হ'ল কি
লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, একি বিষাদ
ঘটনা।
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি
মিলিলোনা।

ভাবলাভ আশা করি, মিছে পরের
ভাবনা।
সেজে আছি ম্রিয়মান বুঝি প্রাণ
রহিলনা।'

রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন কৃষ্ণলীলার গান নামে পরিচিত। ঝাড়খণ্ডি কীর্তন বা ঝুমুরের কয়েকটি প্রধান বিভাগের মধ্যে কৃষ্ণলীলা ঝুমুর অন্যতম। উপরোক্ত গানটির সংগে কৃষ্ণলীলা ঝুমুরের কয়েকটি পদ্ধতির বিষয় ও আংগিকগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। যথা—

'জানলাম তোমায় প্রেমের সখা
আজকাল কেন দাও না দেখা
আগের ভাব আর নেই হে তোমার
ভুলিতে বসিছ,
তোমারে জানা গেল হে বধূ আস্তুতে
মজেছো।
আগে যত আসতে যেতে মিলিতে
জ্যোৎস্না রইতে
অন্যরকম স্বপন এখন, এই পথ
ভুইলেছ।'

অথবা,

'প্রথম পিরিতের কালে আর মনে
নাই কি বলেছিলে হে,
ভুলিব না কোন কালে কি ভুললে
হে অবজ্ঞা।'

'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' ইত্যাদি প্রহসনের মধ্যে বিভিন্ন সংলাপে প্রবাদ এবং প্রবচনের ব্যবহারের মধ্যে মধুসূদনের লৌকিক মনটি বিভিন্নভাবে ধরা পড়ে। এইসব প্রহসনের মধ্যে একদিকে যেমন ইংরাজী ভাষার ব্যবহার নব্য আবির্ভূত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব স্মরণ করিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি তারই পাশে যে একটি লোক সংস্কৃতির ধারা ভাষার মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছিল তার পরিচয় মেলে। যেমন—

(১) কালী—এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে ঘাটে এসে কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত? [সভ্যতা] (৩)

(২) কালী—এ বুড়ো ব্যাটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজার নষ্ট করতে এলো? (৪)

(৩) নবকৃষ্ণ—শীঘ্র নেও ভাই, এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোনার লঙ্কাও নাই। (৪)

(৪) ১ম বারবিলাসিনী --আহা মিনসের রকম দেখনা, যেন তুলসীবনের বাঘ। (১১)

(৫) বাবাজী —ভাল হয়েছে, এই একটা মুস্কিল আমার আসছে।

(৬) পয়োধরীর গান (ঝুমুর, আড় খেমটা)

'এখন কি আর নাগর তোমার
আমার প্রতি তেমন আছে।
নূতন পেয়ে পুরাতনে
তোমার কি সে যতন গিয়েছে ॥
তখনকার ভাব থাকত যদি
তোমায় পেতাম নিরবধি,
এখন ওহে গুণনিধি
আমার বিধি বাম হয়েছে।
যা হবার আমার হ'বে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন নতুনে মন মজেছে ॥'

এই গানের সংগে সীমান্ত বাংলার খেমটি নামে, পরিচিত একশ্রেণীর নৃত্য ব্যবসায়িনীর গানের সঙ্গে মিল লক্ষ্য করা যায়। এই গানের বিষয় প্রেম, কখনও লৌকিক ভাবে, কখনও রাধাকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ। খেমটি নাচ বিহার প্রদেশের লোকনৃত্যের প্রভাবযুক্ত হলেও খেমটি নাচের গান বাংলার নিজস্ব সংগীত। তারই প্রভাব মধুসূদনের গানের মধ্যে লক্ষ্যণীয়। এর তাল আড় খেমটা। আড় খেমটার বারো মাত্রার তাল, কিন্তু গড় খেমটায় ছ মাত্রার তাল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই কলকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারত থেকে আগত যে সকল গানের চর্চা হতে আরম্ভ করেছিল, তার মধ্যে খেমটা তালের গান অন্যতম। মধুসূদনের গানের সংগে একটা গান বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

'সরল দেখে প্রেম করিলে।
এত কেন নিষ্ঠুর হোলে ॥
আমি মরি তোমার তরে ;
বঁধু আমায় ফিরে চায়না ॥
অবলারে দুঃখ দিয়ে।
কখনই ভাল হয় না ॥
হেসে হেসে কইতে কথা।
বসতে আস্যে আমার হেথা ॥
দিবানিশি করে আনাগোনা।

আমার হতে কোন রমণী
আমায় ছেড়ে দেবেনা ॥'

এ ছাড়া মধুসূদনের কাব্য নাটকাদির মধ্যে ছড়িয়ে আছে এমন অসংখ্য প্রবাদ প্রবচনের লৌকিক উপাদান যে ভাষার দিক থেকে মধুসূদনকে দেশীয় ঐতিহ্যের অনুযায়ী সাহিত্য রচনায় সার্থক করেছে। যেমন—

(১) এই বুড়ো বেটা কি অকালের বাদলা হয়ে আমাদের প্লেজার নষ্ট কর্ত্তে এল। (একেই কি বলে সভ্যতা)
(২) একে যখন প্রসব করেছিলে তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারনি। (ঐ)
(৩) কালী আবার ওর চেয়ে এক কাঠি সরেস। (ঐ)
(৪) আমি হলে এতদিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম। (ঐ)
(৫) বিখ্যাত রাক্ষসকুল হেন কুলে কালি. দিব কি রাঘবে দিতে আমি মা, রাবণি ইন্দ্রজিৎ? (মেঘনাদবধ)
(৬) গতস্য শোচনা নাস্তি। (বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ)
(৭) এযে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে। (ঐ)
(৮) কর্ত্তাটি এখনি ক্ষেপে উঠলেই তো বাঁচি, গো-মড়কে মুচির পার্ব্বন। (ঐ)
(৯) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফললাভ হল তারপর আর কিছু না হয় জানলেম চোরের রাত্রিবাসই লাভ। (কৃষ্ণকুমারী)
(১০) ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গো। (বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ)
(১১) তুই বাবুদের মত তামাক খেতে কোথায় শিখলি রে? এযে ছাতারের নেত্য। (বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ)
(১২) আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়ব। (একেই কি বলে সভ্যতা)
(১৩) আ-হা-হা মিনসের রকম দেখনা, যেন তুলসী বনের বাঘ। (ঐ)
(১৪) হাজার হোক নেড়ের জাত কি না—কথায় বলে তেঁতুল নয় মিষ্টি,, নেড়ে নয় ইষ্টি। (বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ)
(১৫) এই নাকে কানে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়। (ঐ)
(১৬) এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে চক্ষের জলে করে ছেড়েছি। (একেই কি বলে সভ্যতা)

সুতরাং বলা যেতে পারে মধুসূদন খৃষ্টান হলেও ছিলেন সব চেয়ে বড় হিন্দু, বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেও সবচেয়ে বড় দেশীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাই কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের মধ্যে দুটি প্রধান প্রভাব। কিন্তু তারই অন্তরালে একটি লৌকিক মানসিকতা মধুসূদনের নাটক ও কাব্যের মধ্যে প্রবাহিত। লোক ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে কোন কবিই তার কাব্য রচনা করতে সক্ষম হবে না, মধুসূদনই তার সার্থক দৃষ্টান্ত।

লোক সাহিত্য একান্তভাবে লোকজীবন থেকে উদ্ভূত। যত না এর যোগ উচ্চমার্গের জ্ঞানের সঙ্গে তার চেয়ে বেশি যোগ জনমানসের সঙ্গে। তাই উচ্চতর সাহিত্যের এর ব্যবধান বিপুল প্রসারী, লোকসাহিত্য প্রকৃতিগত ভাবে নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল, কিন্তু উচ্চতর সাহিত্য অপরিবর্ত্তনীয় বা রক্ষণশীল। হেমচন্দ্রের প্রধানতঃ খ্যাতি মহাকবি হিসাবে। এই মহাকাব্য উচ্চতর সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। মহাকাব্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই নিয়মে, সংজ্ঞায়, রীতিতে ও বিষয়বস্তুতে অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু হেমচন্দ্রের মহাকাব্যের লোকসাহিত্যে সজীব মনের স্পর্শ আছে এবং লোকসংস্কৃতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। মহাকাব্য ছাড়াও আখ্যানকাব্য ও খণ্ড কবিতাবলীর মধ্যেও সেই লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রভাব লক্ষণীয়।

লোকশ্রুতিবিদ লোকসাহিত্যকে বা লোকায়ত সংস্কৃতিকে Humble sister of written art and tradition এবং seed of all future development বলে বর্ণনা করেছেন। তাই লোকসংস্কৃতি বা লোকায়ত ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্যেরই বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি সমস্ত উচ্চতর সাহিত্য বা সংস্কৃতির বীজস্বরূপ যাকে লোকশ্রুতিবিদ ভগ্নীস্বরূপা বর্ণনা করেছেন। হেমচন্দ্রের জীবন ও ভাবধারা যে লোকায়ত বঙ্গসংস্কৃতির আবহাওয়াতেই লালিত পালিত হয়েছিল তার চিত্র পাই 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কবিতাটিতে। কবি তার একটি জায়গায় বাঙ্গালীর মেয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন—

> 'ব্রতকথা উপকথা সেঁজুতি পালন
> কালিঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহন।'

কিংবা,

> 'চিত্রিকাজে চিত্রগুপ্ত—পিঁড়িতে আলপানা
> হল বাহাদুরি—ছিরি বিচিত্র কারখানা।'

কিংবা,

> 'ক্ষীরপুলি, পায়েস, পিঠা মিষ্টান্নের সীমা
> বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা।'

এছাড়াও কবিতাটির মধ্যে দাশরথির ছড়া, ঝুমুর গান ইত্যাদি বাংলার নানা লোকসাহিত্যের ও সংস্কৃতির উল্লেখ আছে। এসবগুলি প্রমাণ করে লোকায়ত ঐতিহ্যের প্রতি মহাকবি হেমচন্দ্রের সুগভীর সংবেদনশীলতা।

লোকসংগীতের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি সম্বোধন অর্থাৎ ফলফুল, তরুলতা ইত্যাদিকে সম্বোধন করে লোক কবি অনেক সময় তাঁর মনের কথাকে প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বাউলগানে এই প্রকৃতিগত বস্তুকে সম্বোধন করা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, অশোকতরু কবিতায় কবি যখন—'তরুরে আমার মন' বলে সম্বোধন করে বলেন তখন বাউলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সমসাময়িকতা লোকসংগীতের একটি প্রধান লক্ষণ। সমসাময়িক লোকজীবনের দুঃখ দুর্দশা ও আশা আকাংখার মূর্ত বাণীরূপ লোকসংগীত। পাশ্চাত্য সমালোচক লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, Folk songs are best defined as songs which are current repertory of a folk group. The study of their origin is another matter.

অর্থাৎ লোকসাহিত্যের রচনার উৎসটাই এর আসল কথা নয়, আসল হচ্ছে লোক গোষ্ঠীর সমাজমনের সমসাময়িক বক্তব্যের ধারক হিসাবে। বর্তমান কালে শহর ও সভ্য জনপদ থেকেও নূতন নূতন গীতি ধারা লোকসমাজে এসে মিশেছে। পরে লোকায়ত সমাজ তাকে সম্পূর্ণভাবে অংগীভূত করে নিয়েছে। যেমন টুসু গানের একটীতে দেখতে পাওয়া যায় সমাজ পরিবর্তনের চিহ্ন—

'কলিকালে রঙ্গ দেখে বাঁচিনা
গয়লায় পইতা পরলো আগে হে
শেষকালেতে টিকলো না।'

কিংবা

'আমার মনের মাধুরী
সেই বাংলাভাষা করবি কে চুরি
আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে মেঠো সুরের কোন চুয়া
বাংলা গানের ছড়া কেটে আষাঢ় মাসে ধান রুয়া।'

এই টুসুগানটিতে পুরুলিয়ার সঙ্গে বঙ্গবিচ্ছেদের বেদনাটি সমসাময়িক বিষয়বস্তু হিসাবে অন্তর্গত রয়েছে। হেমচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতা এই সমসাময়িকতার চিহ্নে ভারাক্রান্ত। 'কুলীন মহিলা বিলাপ' কবিতাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুলীনদিগের বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার উপলক্ষ্যে রচিত। যেমন—

'আয় আয় সহচরী, ধরি গিয়ে বৃটনেশ্বরী
করিগে তাহার কাছে দুঃখের রোদন
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন।'

কিংবা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিল উপলক্ষে রচিত—

'হুশিয়ার ইলবার্ট দেখো হে রিপন লাট
সাহেব রক্ষনী সভা সংগঠিত হয়েছে
দুপেঁচ তেপেঁচ মিলে লক্ষটাকা দেছে তুলে
চামড়া কটা কতগুলো এম্ফিরিয়স ফুটেছে।'

'হুতোম পঁ্যাচার গান' শীর্ষক কবিতাগুলির মধ্যে লোকসংগীতের প্রভাব বর্তমান। এই প্রভাব বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত। কবিগানের মতো এই কবিতাগুলি পালার আকারে রচিত। প্রথমে শহর বন্দনা, দ্বিতীয়তঃ আসর বর্ণনা, শেষে আসল বিষয় বস্তু। অন্যান্য কবিগানের মত 'কলির শহর কলিকাতাটির পায়ে নমস্কার' এই পদটি বারবার ভনিতার মত ঘুরে ফিরে এসেছে। যেমন—

'কলির শহর কলিকাতাটির পায়ে নমস্কার।
যার জাঁকজমকে ভাগীরথীর দুধার গুলজার।'

কিংবা আসর বর্ণন—

'এসো এসো সবার আগে ঠাকুরবাড়ী চাই,
বুল বুলি পাগ শিরে বাঁধা তালপাতা সেপাই।
পাথর ঘাটায় বাজগাঁজারি 'ঘার' মহারাজ নাম।
মুন্সী আনায় জেকে গেছে ছ্যাতলা ধরা থাম।'

চারণ কাব্য একধরনের লোককাব্য। চারণ কবি তাই লোককবি। চারণ কাব্যের সঙ্গে ইংরাজী Ballad-এর কিছু যোগ লক্ষ্য করা যায়। Ballad-কে ইংরাজীতে narrative folk song বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকে বলেন It is often magnificent with poetry চারণ কাব্যের মধ্যে এই 'narrativeness' এবং 'Magnificence' এই দুটি লক্ষণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'ভারত সংগীত' কবিতাটি একটি চারণ কবিতা। কবিতাটির ভূমিকাটিতে কবি বলেছেন—"ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করে তখন মাধবাচার্য্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সংগীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত এবং আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতসংগীত লিখিত হইয়াছে।" এই কবিতায় দেখা যায় কবি দেশবাসিকে উদ্দেশ্য করে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

যেমন—

'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মনের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥'

হেমচন্দ্রের কয়েকটি কবিতা ছড়ার আকারে লিখিত। আঙ্গিকের দিক দিয়ে তো বটেই বিষয়বস্তুর দিকেও মিল লক্ষ্য করা যায়। নিম্নলিখিত কবিতাটি কয়েকটি নীতি কথার প্রকাশ করলেও আসলে ছড়ার আকারে লিখিত। যেমন—

"নোংরা কথা বলতে নাই
নোংরা পথে যেতে নাই
পথিককে দেখাইও পথ
বাক্যে কাজে হইও সৎ।"

কিংবা 'নাকে খৎ' প্রহসনে—

'ওদের ওদের বেলা
তবে টাকার কেন খেলা
রাঙা ডোবার জলে
শুনি ছী নী নি চলে
ঢাকাই জালা পেট
চন্দ্রহারের সেট!
কাঁকাল গাদা বোট
তাইতে সোনার গোট
আমার বেলা যেই
অমনি হলো নেই।'

এইভাবে উচ্চতর সাহিত্যের প্রতিটি ছন্দে—চেতন ও অচেতন ভাবে লৌকিক ঐতিহ্য ধরা পড়েছে। তাই গীতিকবি হন আর মহাকবি হন কেউই এর প্রভাব থেকে বাদ পড়েননি।

নবীনচন্দ্র ও লোকঐতিহ্য

লোকসাহিত্য কথাটি ইংরাজিতে Folklore হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁরা Folklore কথার অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "The term Folklore and the definition given above clearly imply the co-existence of two traditions—a literary and artistic on the one hand, and a folk or popular tradition on the other" অর্থাৎ লোকশ্রুতি বলতে বোঝাচ্ছে পাশাপাশি দুটি ঐতিহ্যের অবস্থিতি—একটি হচ্ছে সাহিত্যিক ও শৈল্পিক এবং অপরটি হচ্ছে জনপ্রিয় ও লৌকিক। তাই মহাকবি হয়েও নবীনচন্দ্রের কাব্যে লৌকিক সংস্কৃতি ও উচ্চতর সংস্কৃতির ধারা পাশাপাশি প্রবহমান।

নবীনচন্দ্রের উপর লোকসংগীতের প্রভাব 'হৃদয়উচ্ছ্বাস' পর্যায়ের সমস্ত কবিতাগুলি ঝুমুর গানের সঙ্গে তুলনীয়। ঝুমুর প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'ক্রমে বাংলাভাষার সান্নিধ্যে আসিয়া আদিবাসীর ঝুমুর বাংলাভাষায় রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ভাষার পরিবর্তন হইলেও সুর এবং অন্যান্য আঙ্গিকের দিক হইতে তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। ক্রমে বাঙালির বিশিষ্ট লোকসংগীত এবং উচ্চ সংগীতের প্রভাব তাহার উপর বিস্তার লাভ করিবার ফলে তাহার রূপ, সুর এবং ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে।' কেবলমাত্র এই সুরের পরিবর্তনই নয়, সাহিত্যের মধ্যে এই পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। নবীনচন্দ্রের

কয়েকটি কবিতায় কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয় আঙ্গিকের দিক থেকেও ঝুমুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি ঝুমুর গানে দেখা যায়—

'তোমা বিনা বিধুমুখী চারিদিক শূন্যহে,
প্রাণে বিরহ জ্বালা হে
রাখ রাখ মোরে বিনোদিনী
তোমার ধরি দুটি পায়
ফুলশর হান হিয়া পরে মন জ্বরে মদনাই।
রাখ রাখ মোরে বিনোদিনী
তোমার ধরি দুটি পায় ॥'

নবীনচন্দ্রের একটি কবিতায় এরই প্রতিবিধান দেখতে পাওয়া যায়—

'সখিরে!
কি আর বলিব আমি মরিতেছি মরমে,
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে।
দিন দিন পল পল, জ্বলিছে বিরহানল
নিশিবেলা আর তাহা বুঝি এই জনমে
প্রিয় সখী মরিতেছি মরমে।'

'বুড়ামঙ্গল' কবিতাটি সাময়িকতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন। দোলের পরের মঙ্গলবারে কাশীতে বুড়ামঙ্গলের মেলা হয়। সন্ধ্যার পর গঙ্গার অমল বক্ষ সুসজ্জিত তরণী সমুদ্রে আচ্ছাদিত ও সুরাস্রোতে কলুষিত হয়ে থাকে। এইরূপ উৎসব দর্শনে লেখকের এই কবিতাটির উৎপত্তি—

'হাসে বারানসী, নাচে ভাগীরথী
মলয় মারুত দেয় প্রেমারতি।
বসন্তের রাজ্য, রাণী আজ রতি
বুড়ামঙ্গলেতে সুরা ভাগীরথী।

'ডিউক ও এডিনবরার প্রতি' কবিতাটি ঐ একই শ্রেণীর কবিতা। এর মধ্যে যে অভাব অভিযোগের কথা যে রীতিতে জানানো হয়েছে তা আমাদের গম্ভীরা গানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়—

'কি কুগ্রহ ভারতের অদৃষ্ট আকাশে
কয়েক বৎসর হতে হয়েছে সঞ্চার
দুর্ভিক্ষ-অনল, আর মারিভয় গ্রামে
মরেছে সহস্র প্রজা, তাহাদের হাতে
একত্র করিলে হবে সমাধি ভবন
"বিডনের" "লরনমের" কীর্তি নিদর্শন।'

গম্ভীরা গানে শিবকে লক্ষ্য করে এই একই অভিযোগ—

'শিব কি করিব হে এবার বাঁচবে না প্রাণ,
টাকা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেল টান
বাঁচবে না আর প্রাণ ॥'

কিংবা

'উড়া জাহাজে হাওয়া খায়,
বাপরে বাপ জান বাঁচান হল দায়।
চার্চিল ছদ্মেরই বেশে
(ওসে) অট্টালিকাতে বসে
চপ কাটলেট চুষে
এটালীকে ফের কেটলী বানাইয়্যা
সেই জলেতে চাহা খায় বাপরে।'

নবীনচন্দ্রের কাব্যে গীতিকার প্রভাব

নবীনচন্দ্রের 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' কবিতাটির মধ্যে গীতিকার একটী অন্তর্নিহিত ঐতিহ্যগত মিল লক্ষ্য করা যায়। গীতিকার প্রসঙ্গে বলা হয়, 'A ballad is a folk song, that tells a story with stress on the crucial situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech, and tells it objectively with little comment of intrusion of perxonal bias.' এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে গীতিকায় একটি সংকটপূর্ণ ঘটনামুখী কাহিনী থাকবে। দ্বিতীয়তঃ ঘটনা এবং সংলাপের ভিতর দিয়ে এই কাহিনী অগ্রসর হবে। তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হয়ে লেখক একান্ত বস্তুধর্মী একটী কাহিনী বর্ণনা করবেন। এছাড়াও এর মূলে উপজীব্য প্রেম। পঞ্চমতঃ গীতিকার পরিণতিতে হত্যা, মৃত্যু ইত্যাদি বিষাদাত্মক ভাব প্রকাশিত হয়। পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনীর একটী কাহিনী আছে, সে কাহিনীটি ঘটনাপ্রধান। এই কামিনী একটী পার্বত্যপ্রদেশের একটী ধনী ব্যক্তির দুহিতা, তার শৈশবকালে জনক-জননী অসভ্য জাতির অত্যাচারের ভয়ে পলায়ন সময়ে অনাহারে মৃতপ্রায় তৃতীয় বর্ষীয়া বালিকাকে অর্থ প্রলোভনসহ একজন কৃষকের হাতে সমর্পণ করে যান। পরে তাঁদের কি হল, কেউই বলতে পারেনা। সকলের অনুমান, তারা অসভ্যদিগের খড়্গে নিহত হয়েছিলেন। এই হতভাগিনী কৃষকগৃহে পালিতা। একদিন এক যুবকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তৎসঙ্গে পরস্পর হৃদয়বিনিময় হয়। যুবক কৃষকের কাছে সবিশেষ অবগত হয়ে জানতে পারলেন, এই যুবতী তাঁর পিতার 'পরম বন্ধুর কন্যা'। পিতৃসমক্ষে আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করলেন। পিতা শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে উভয়ের পরিণয় বিধান

করলেন। এর পরিণতি বিষাদান্তক। পরিণতিতে দেখি, নায়িকা পতি বিচ্ছেদের বেদনায় ছুরিকাহত হয়ে আত্মহত্যা করেছে।

'শানিত ছুরিকা দিয়া সুন্দর গ্রীবায়,
ছিন্ন স্বর্ণলতা আহা! হইল পতন।
নিঃসৃত শোণিত স্রোত পড়িয়া শিখায়,
গৃহদীপ প্রাণদীপ নিবিল তখন।'

এই পংক্তিগুলি মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালার কয়েকটি অংশ স্মরণ করিয়ে দেয়। এ পালারও শেষে মহুয়াকে যখন বিষলক্ষের ছুরি দিয়ে স্বামী নদ্যার চাঁদকে হত্যা করবার আদেশ দেওয়া হয়েছে তখন—

'গর্জিয়া উঠিল কালা দেওয়া হাতে লইয়া ছুরি
মহুয়ার হাতেতে দিল বিষলক্ষের ছুরি।
একবার চায় কন্যা পালং সইয়ের পানে
একবার চাহিল কন্যা পতির বদনে॥'

পরিশেষে ছুরিকাঘাতে মহুয়ার আত্মহত্যা ও হুমরা আদেশে বেদের দল দ্বারা নদ্যার চাঁদের প্রাণবধ।

লোকঐতিহ্য ও Ballad প্রসঙ্গে কোনো এক সমালোচক গীতিকার সম্বন্ধে tradition-এর উল্লেখ করেছেন সংগীতকার। এই tradition লোকসাহিত্যের ভিত্তি। পরবর্তী যুগের উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যেও এই tradition বা ঐতিহ্য এসেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পুনরায় বলা চলে, 'গাছের শিকড়টা যেন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ নিম্ন সাহিত্য অর্থাৎ লোকসাহিত্যের একটা যোগসূত্র লক্ষ্য করেছেন এবং যা বোধ হয় পুরোটাই ঐতিহ্যগত। তাই R. V. Williams যখন বলেন, 'It is like the forest tree with its roofs deeply buried in the past but which continually puts forth new branches new leaves, new fruits !' তখন একথার সত্যতা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাই ঈশ্বর গুপ্তই হ'ন আর মহাকবি হেমচন্দ্রই হন, অথবা মধুসূদন কিংবা নবীনচন্দ্রই হন লোকঐতিহ্যকে অস্বীকার কেউই করতে পারেননি। লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে তাঁরা উচ্চতর জীবনচর্চার জীবন রস পরিবেশন করেছেন।

বিহারীলাল ও লোকঐতিহ্য

বিহারীলাল বাংলা গীতিকাব্যের আগমনী। অর্থাৎ যে গীতিমূর্ছনা অন্তঃসলিলভাবে বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছিল বিহারীলালে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলাল আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের স্রষ্টা হলেও লোকঐতিহ্যের

ধারা তাঁর কাব্যে সদা প্রবহমান বলা যেতে পারে। বিহারীলালের কাব্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসংগীতেরই রূপান্তর মাত্র।

বিহারীলাল ও লোকসংগীত :

১. 'সংগীত শতকের' কয়েকটি গানের সঙ্গে ঝুমুর গানের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

(ক) 'একি একি সোহাগিনী।
কেন বসে ধরাসনে ?
অধোমুখে মনোদুঃখে
ধারা বহে দু-নয়নে।' [৩৪]

(খ) 'ছি ছি হে প্রেমিক
তুমি বড়ই অধীর !
বুঝিতে-তো জানো নাক
মনোভার কামিনীর।' [৩৫]

(গ) 'তেজো মান ত্যেজিব না—
সহিতে হলেও বিষম যাতনা
যদিও প্রেয়সী হৃদাকাশ শশি
তোমার বিহনে সব তমোনিশি
কাঁদি দিবারাতি বিরলেতে বসি,
দরশন-আশী তুবু হইব না।' [৪৩]

বিহারীলাল ও বাউল :

'বাউল বিংশতি' শীর্ষক কবিতাগুলি লোকসংগীতের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে যে লেখা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। এর অনেকগুলি গানই বাংলার লোকসংগীত বাউলের ঐতিহ্যানুসারী, যথা—

(ক) 'ভবে কেউ দুষী নয়, আমিই দুষী
বিরোধ বিষম লেঠা, ভালবাসি হাসি খুসি
বিধাতা নহেন বাম
সুখ ভরা ধরাধাম
হৃদয় আনন্দ-ধামে নিরানন্দ কেন পুষি ?'

কিংবা,

(খ) 'ভবের খেলা চমৎকার।
এর, কোথাও ফাঁসি, কোথাও হাসি
কোথায় ওঠে হাহাকার।'

(গ) 'প্রেমের মানুষ চেনা যায়
তার, হাসি হাসি মুখ-শশী, খুশি ফোটে চেহারায়
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর
কেহ নাহি আপন পর,
সে জানেনা দুনীয়ারি, ভালবাসে দুনীয়ায়।'

(ঘ) 'বেলা নাই, বেলা নাইরে, হয়েছে যাবার বেলা
ভাঙ্গা হাটে নবীন ঠাটে আরও কত খেলবি রে—
ও পাগল মন খেলবি রে রসের খেলা
এ কেমন ভালবাসা।'

(ঙ) 'বল, কোন্ ভাবেতে মন ভুলাতে দেখা দিয়ে ছলতে আসা
অধরে উদার হাসি সুধারাশি হরে অভিমান।
নয়নে বাজে বীনা মধুর তানে, আলসে অবশ করে প্রাণ
জগতে রূপ ধরেনা, চোক্ ফেরে না, মেটেনা প্রাণের পিয়াসা।'

॥ পাঁচ ॥

রবীন্দ্রকাব্য ও লৌকিক ঐতিহ্য

'ছেলেভুলানো ছড়া' আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণাটি কিরূপ স্পষ্ট ছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রমানসের উৎসসন্ধানে বহির্গত হলে দেখা যাবে একদিকে যেমন তিনি উপনিষদের দার্শনিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, যেমন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনেক প্রত্যক্ষ প্রভাবও পড়েছিলো, ঠিক তেমনি লৌকিক সংস্কৃতির ভাবধারা তার অন্তরের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিলো। একদিকে শাস্ত্রীয় ভাবধারা অন্যদিকে লৌকিক ঐতিহ্য তাঁর অন্তরে সদাজাগ্রত ছিল। তাই রবীন্দ্র কাব্যে আছে লৌকিক সংস্কৃতির নানা উপাদান, লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের স্পর্শ।

রবীন্দ্রকাব্যে লৌকিক ঐতিহ্য ও লোক উপাদান আবিষ্কার করতে গেলে তাকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করতে হবে, ছড়া, রূপকথা, লৌকিক বিশ্বাস, ইতিকথা, লোকগীতি, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি। নানা লৌকিক উপাদানের ব্যবহারের মধ্যে একটি লৌকিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করা হয়েছে, কবিতায় বহু জায়গায় ছড়ার ছন্দ ছড়ার উদ্ভব বিষয়কে যেমন রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে রূপকথার নানা চিত্রকল্প বা ইমেজ ব্যবহার করেছেন। আবার লৌকিক বিশ্বাসের বহু বস্তুকে কাব্যের বিষয় বস্তুর অঙ্গীভূত করেছেন। এছাড়া আছে রবীন্দ্রগীতিতে লোকগীতির সুর, কথা ও আঙ্গিকগত ব্যবহার, প্রবাদ প্রবচনের অসংখ্য ব্যবহার হয়েছে রবীন্দ্র কাব্যে।

রবীন্দ্রনাথ রূপকথার জগৎটিকে এত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন যে তাঁর কাব্য সৃষ্টির রসলোকে রূপকথার অলৌকিক জগৎ প্রায়শই কাব্য-ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সাহায্য করতো, লোককথার বিশেষ করে রূপকথার জগৎটাকে যে কিরূপ পনুধাবন করেছিলেন তার পরিচয়টি এই "এক যে ছিল রাজা"।

"তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না, কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিরা গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালীবাহন,-কাশী, কাঞ্চী, কনোজ, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাঁহার রাজত্ব এ সকল ইতিহাস—ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, আসল কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে— এক যে ছিল রাজা······"

গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে চক্ষু প্রান্ত দুটি আপনি মুদিয়া আসে তখনো

তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিঃস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তারপর ভোরের বেলায় যে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্ট স্বরে শুনিতাম—

"আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো !"

কড়ি ও কোমলে'র যুগ পার হয়ে, মানসীর যুগে এসে রবীন্দ্রনাথ-এর কাব্যজীবনের অভ্যুদয়। বিভিন্ন সমালোচক বলেছেন মানসী সন্ধিযুগের কাব্য অর্থাৎ মানসীতেই যথার্থভাবে রবীন্দ্র কাব্য চেতনার পথ মুক্তির সন্ধান আছে। বাংলাদেশের নগর কেন্দ্রিক জীবন থেকে মুক্তি পাবার, বাংলার সহজ পল্লীপ্রকৃতির মাঝখানে ছুটে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। এ যুগের কবিতায় আমাদের নাগরিক জীবন যে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিরূপ নির্জীব হয়ে পড়েছে তা বর্ণিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ কীট—নাই কো ভালোবাসা নাইকো স্নেহ,"— এর থেকে রবীন্দ্র কবি প্রাণ মুক্ত হতে চেয়েছে শিশিরে ঝলমল উদার পথঘাটে পাখীর গানে বনের ছায়ায়, বাঁশবনের অন্ধকারে বেগুনী ফুলে ভরা সবুজ লতাবিতানে, দীঘির গভীর কালো জলের বাঁধাঘাটে কিংবা অশ্বত্থতলে। সঙ্গে কবিমন লৌকিক-সাহিত্যের রূপকথার জগতে রসসন্ধান করেছেন। 'বধূ' কবিতায় তারই প্রকাশ—

'কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁগো,
উঠিলে নবশশী, ছাদের পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি নাগো।'

বাংলার জীবন ও রূপকথা যে একই সূত্রে প্রবাহিত, রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। গ্রাম্য প্রকৃতির সঙ্গে গ্রাম্য কথাসাহিত্য যে অবিচ্ছিন্ন, বাংলার পথঘাট, আকাশে বাতাসে চাঁদের আলোয় বাঁশবনের শিহরিত হাওয়া, এর সবগুলিতেই রূপকথার স্পর্শ আছে।

'সোনার তরী' রচনার যুগেই 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এ যুগেই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক লৌকিক জীবন-ধারা ও লোক সাহিত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন বলেই এ যুগের কবিতায় লৌকিক ঐতিহ্যের চিহ্ন ও উপকরণ সর্বাধিক। 'সোনারতরী' কাব্যের দ্বিতীয় কবিতাই বাংলাদেশের রূপকথা অবলম্বনে রচিত। 'বিম্ববতী' কবিতাটি লৌকিক রূপকথার রোমান্টিক কাব্যময় প্রকাশ, যথা ঃ

'সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরন বিরাজে
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে

মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতিনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।'

বাংলাদেশের রূপকথার একটি প্রধান অভিপ্রায় সপত্নী বিদ্বেষ, এই কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে। সতীনের মেয়ে বিম্ববতী সবার চেয়ে রূপসী, এটি ছোট রানীর অন্তরে বিষজ্বালা সৃষ্টি করেছে। পরের দিন রানী নিজে প্রবালের হারে নিজেকে সজ্জিত করলেন, বিম্ববতীকে বিষফুল মালা পরালেন। তারপর মন্ত্র পড়ে দর্পণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ধরামাঝে সবচেয়ে কে আজ রূপসী', কিন্তু মুকুরে বিম্ববতীর মুখ ভেসে উঠলো। রানী হিংসায় উন্মত্ত হয়ে বিম্ববতীকে বনে পাঠালো, তাতেও কিছু হলোনা। পরিশেষে —রানী কহিল জ্বলিয়া—

'বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।—'

কবিতাটিতে রূপকথার ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক অভিপ্রায়টি প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। রূপকথাকে কেন্দ্র করে যে রোমান্টিক আধুনিক কবিতা লেখা সম্ভবপর বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই তার পথপ্রদর্শক। 'সোনার তরী' কাব্যের 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাটি রূপকথার চিত্রকল্পে রচিত। রাজপুত্র ও রাজকন্যার দেখাশুনা, প্রেম পরিণয়ের একটি নিখুঁত ছবি এঁকেছেন রূপকথার চিত্রকল্পে, প্রভাতে রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে পাঠশালায় যেত, দুজনের দেখা হ'ত পথে, সেখানে—

'রাজার মেয়ে দূরে সরে যেত
চুলের ফুল তার পড়ে যেত
রাজার ছেলে এসে তুলে দিত
ফুলের সাথে বনলতা।'

'মধ্যাহ্নে' উপরে বসে রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে, খসে যাওয়া পুঁথিটি রাজপুত্র দেয় তুলে। কবি বলেন,

'দুপুরে খরতাপ, বকুল
কোকিল কুহু কুহরিছে
রাজার ছেলে চায় উপর পানে
রাজার মেয়ে চায় নিচে।'

তারপর 'সায়াহ্নে' রাজার মেয়ের ভুলে যাওয়া মোতির মালা কুড়িয়ে রাজার ছেলে ফিরিয়ে দেয় রাজার মেয়েকে। নিশীথে—

'রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে
স্বপনে দেখে রূপরাশি;

'রুপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখছে কার সুধাহাসি।'

বাঙলাদেশের রূপকথা একটি গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করে যখন প্রাণহীন হয়ে পড়েছিলো তখন রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মনোভঙ্গিতে তাকে অনুধাবন করে তার মধ্যে রোমান্সের মালমশলা স্বপ্ন, কল্পনা ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। রূপকথা যে কিরূপ আধুনিক রোমান্সে রূপান্তরিত হতে পারে রবীন্দ্রনাথ 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাটির মধ্যে তা দেখিয়েছেন। বাঙলা-দেশের লৌকিক রূপকথা পুষ্পমালার কাহিনীকে মানব জীবনের চিরন্তন প্রেমকাহিনী রূপে প্রকাশ করেছেন। 'চিত্রিতা' কবিতাটিতেও রূপকথা রূপক—

'রাজার ছেলে ফিরিছে দেশে দেশে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।' (পৃঃ ৩৪৮)

কিংবা,

সেই ঘুমন্তপুরীর বর্ণনা ঃ—

'সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।'

অথবা,

'ঘুমায় রাজা ঘুমায় রানীমাতা
কুমার সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা
একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।'

রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেই রূপকথার রাজপুত্র, তাই 'যেখানে যত মধুর মুখ আছে, বাকি তো কিছু রাখিনি দেখিবার।' এ ত কবিরই আত্মকথন, রূপকথার রাজকন্যা যেন নিত্য সৌন্দর্যের দেশের সৌন্দর্যের দেবী। তাই কবি বলেন, তাঁর এই কাব্যলক্ষ্মী বা নিত্য সৌন্দর্যের দেবীর সন্ধানে—

'এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে,
অনেক দূরে তেপান্তর শেষে
ঘুমের ছেলে ঘুমায় রাজবালা
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।'

'সুপ্তোত্থিতা' কবিতায় কবি এই রূপকথার ঘুমদেশের ঘুম ভাঙ্গিয়েছেন—

'ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর
গাছের সাথে জাগিল পাখি কুসুমে মধুকর,
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া হস্তিশালে হাতি।'

'পুরস্কার' কবিতাটি রূপকথার আঙ্গিকে লেখা—

'রাজা শুধু-মৃদু নাড়িল হস্ত
নৃপ-ইঙ্গিতে মহাতটস্থ
বাহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল।' (পৃঃ ৪২৪)

'সোনার তরী' 'চিত্রার' যুগ পার হয়ে কণিকা কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় 'চুরি নিবারণ' কবিতাটি আসলে নীতিমূলক কবিতা হলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে রূপকথার রূপক ব্যবহার করেছেন, যথা :

"সুয়োরানী কহে, রাজা দুয়োরানীটার
কত মৎলব আছে বুঝে ওঠা ভার
গোয়াল ঘরের কোণে দিলে ওরে বাসা
তবু দেখো অভাগীর মেটে নাই আশা
তোমারে ভুলায়ে শুধু মুখের কথায়
কালোগরুটিরে তব দুয়ে নিতে চায়।
রাজা বলে, ঠিক ঠিক, বিষম চাতুরী।
এখন কী করে ওর ঠেকাইব চুরি।
সুয়ো বলে, একমাত্র রয়েছে ওষুধ,
গোরুটা আমারে দাও, আমি খাই দুধ।" (পৃঃ ৫৮৯)

'কল্পনা' কাব্যের 'উন্নতি লক্ষণ' কবিতাটি লৌকিক তরজা গানের, আঙ্গিকে লেখা। 'তরজা গানে' যেমন 'চাপান' ও 'উতোর' আছে তেমন রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি প্রথমে 'চাপান' অর্থাৎ প্রশ্ন করেছেন, এবং তারপর 'উতোর' অর্থাৎ উত্তর দিয়েছেন এবং এই ভাবে প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়েই কবিতাটি লেখা হয়েছে, যথা :

(চাপান)

"লোকটি কে ইনি, যেন চিনি চিনি
বাঙালি মুখের ছন্দ—
ধরণে ধারণে অতি অকারণে
ইংরাজী তরো গন্ধ।
কালিয়া বরণ, অঙ্গে পবন
কালো হ্যাট কালো কুর্তি।"

উত্তর— 'এঁরা সবে বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি বলে গণ্য
কোট-পরা কায় সঁপেছেন হায়
শুধু স্বজাতির জন্য।।"

ইতিপূর্বে 'মানসী'র যুগে লেখা 'ধর্মপ্রচার' কবিতাটিরও কবিআঙ্গিকে লেখা : অতিরিক্ত আর্যত্বের উপর ব্যঙ্গ করে কবিতাটি প্রকাশিত।

"ওই শোন ভাই বিশু
পথে শুনি 'জয় বিশু' !
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্য শিশু।" (পৃঃ ৩৫৫)

কিংবা ঃ

'পুলিস আসিছে গুঁতো উচাইয়া,
এই বেলা দাও দৌড়।
'ধন্য হইল আর্য ধর্ম
ধন্য হইল গৌড়।"
(উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন। বাসায় ফিরিয়া)
"সাহেব মেরেছি! বঙ্গবাসীর কলঙ্ক গেছে ঘুচি,
মেজ বউ কোথা, ডেকে দাও তারে কোথা ছোকা, কোথা লুচি।"

'কথা ও কাহিনী'র বহু কবিতায় ইতিহাস ও রূপকথা অতীত ও কল্পনার সমবায়ে রচিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা, তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক একটি খন্ড খন্ড দৃশ্য,' [সূচনা, কথা ও কাহিনী, পৃঃ ৬০৮] একটি উদাহরণ উপস্থিত করলে ব্যাপারটি সুপরিস্ফুট হবে—

"কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে—
'যতদিন তুমি আছ রাজ-রানী
দীনের কুটিরে দীনের কি হানি
বুঝিতে নারিরে জানি তাহা জানি
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।'
রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া
অরুণ বরণ অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি
দিল রানী দেহে তুলিয়া।"

এ ছাড়া কথাও কাহিনীর বহু কবিতায় গাথাকাব্য বা জাতীয় রচনা। যেমন 'বিচারক' কবিতাটির পূর্বে ভূমিকায় কবি বলেছেন—'আক্ওয়ার্থ সাহেব প্রণীত Ballads of her Maraths—নামক গ্রন্থে 'রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠি গাথার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে,' যথা ঃ

'রুধিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও
কহিলা করিয়া হাস্য

নূপতি কাহারো বাঁধন না মানে—
চলেছি দীপ্ত মত্ত কৃপাণে
শুনিতে আসিনি পথ মাঝখানে
ন্যায় বিধানের ভাষা।'

শিশু কাব্যের জগতে এসে রবীন্দ্রনাথ আরও রূপকথার কাছাকাছি এসেছেন। শিশু-মনের রহস্য উদ্ঘাটন করতে রূপকথার অরূপের জগতে প্রবেশ করেছেন—

"শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকিজ্বলা বনের ছায়ে,
দুলিছে দুটি পারুল-কুঁড়ি।
তাহারি মাঝে বাসা
সেখান থেকে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া আসা। [খোকা]

খোকার জগৎ হচ্ছে রূপকথার জগৎ—সকল উদ্দেশ্যে হারা, সকল ভুগোল ছাড়া অপরূপ অসম্ভব দেশ। কবির ভাষায়—

"খোকাদের গল্পলোক মাঝে
সেথা ফুল গাছ পালা
নাগকন্যা রাজবালা
মানুষ রাক্ষস পশু পাখি।" [খোকার রাজ]

'সাত ভাই চম্পা'র প্রতীক এসেছে—

"চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে এমনি ভানে
যেন তারা সাতে ভায়েরে কেউ না জানে।" [ভিতর ও বাহির]

বাবার লেখা শিশুর পছন্দ নয়, খোকার লৌকিক জগতে বাবা কোন স্বপ্ন কল্পনার ছবি আঁকতে পারে না। তাই ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করে—

"ঠাকুমা কি বাবাকে কক্‌খনো
রাজার কথা শোনায়নিকো কোনো?
সে সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি?"

'রাজার বাড়ি' কবিতাটি পরিপূর্ণ রূপকথার বিষয়বস্তুতে লেখা, রূপকথার চিত্রসৃষ্টি, রূপকথার অভিপ্রায়ে পুষ্ট। যথা:

সাত মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী
সাত রাজার ধনমানিক গাঁথা গলার মালাখানি।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।
দু'হাতে তার কাঁকন দুটি দুই কানে দুই দুল,
খাটের থেকে মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।

ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে।
সতে তার মানিকগুলি পড়বে ঝরে ছুঁয়ে।

শিশু চিরকালের নিরুদ্দেশের যাত্রী। তার অনির্দেশ্য যাত্রা চলেছে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে, তেপান্তরের মাঠ অতিক্রম করে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর সঙ্গী হয়ে, রাজকন্যার সন্ধানে। এখানে শিশু নিজেই যেন রাজপুত্র—

"রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে একলা ঘোড়ায় চেপে
গজমোতির মালাটী তার বুকের 'পরে নাচে—
রাজকন্যা কোথায় আছে খোঁজ পেলে কার কাছে
মেঘে যখন ঝিলিক মারে আকাশের এক কোণে
দুয়োরানী-মায়ের কথা পড়ে না তার মনে?
দুখিনী মা গোয়াল-ঘরে দিচ্ছে এখন ঝাঁট
রাজপুত্তুর চলে সে কোন তেপান্তরের মাঠ। [ছুটির দিনে]

রবীন্দ্রকাব্যে লৌকিক ছড়ার প্রভাব অপরিসীম। জীবন স্মৃতিতে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এল বান' ছড়াটি তার কাব্যজীবনের উৎস এবং ছন্দ গুরু। সেই ছন্দেই লেখা কবিতা—

বাদলা হাওয়ায় / মনে পড়ে / ছেলেবেলার / গান
'বিষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদেয় এল / বান।'
'মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা।
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
কবে বৃষ্টি পড়েছিলো বান এল সে কোথা।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, কবেকার সে কথা।
সেদিনও কি এমনি তরো মেঘের ঘটাখানা
থেকে থেকে বাজবিজুলি দিচ্ছিলো কি হানা
তিন কন্যে বিয়ে করে কি হল তার শেষে
না জানি কোন নদীর ধারে না জানি কোন দেশে।'

'সাত ভাই চম্পা' কবিতায় বাঙলাদেশের বিখ্যাত রূপকথা সাত ভাই চম্পার রূপকে এক রোমাণ্টিক প্রকৃতির অপরূপ চিত্র অঙ্কন করেছেন। এখানেই অন্যান্য কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব যে তিনি প্রচলিত রূপকথাকে রোমাণ্টিক স্বপ্ন কল্পনার জগতে নিয়ে গিয়ে এক আধুনিক রোমান্সের জগৎ তৈরী করেছেন।

'সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে সাতটি চাঁপা ভাই
রাঙা-বসন পারুল দিদি তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে সাতটি সোনা মুখ,
পারুল দিদির কচি মুখটি করতেছে টুকটুক।'

ঈশ্বরই হোন আর কবির জীবন দেবতাই হোক—রূপকার রাজাই কবির প্রতীক কল্পনায় বারবার ভেসে উঠেছে, 'খেয়ার আগমন' কবিতায় তারই প্রকাশ।

ওরে, দুয়ার খুলে দেরে, বাজা শঙ্খ বাজা
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।

কেবল শিশুর জগতে নয়, ছড়া নূতন জগতেও ছড়া আর রূপকথা আছে, তাই কবি বলেন,—

ছায়াময় সে ভাবনখানি স্বপন দিয়ে গড়া
রূপকথাটি—ছাঁদা
কোন সে পিতামহীর বাণী—নাইকো আগা গোড়া
দীর্ঘ ছড়া বাঁধা। [অনাহুত]

কোকিলের ডাকে তিনশ বছর আগেকার বাংলাদেশের প্রাণেভরা পল্লীর জীবন, গোলায় ভরা ধান, ফুলবাগানের হেনার গন্ধ, দখিন হাওয়ার সঙ্গে কবির মনে হয়—

'ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে ফেটেছে সেই ছাদ—
রূপকথা আজ কাহার মুখে শুনবে সাঁঝের চাঁদ। [কোকিল]

'খেয়া' কাব্যেরই কবি 'সবপেয়েছির দেশে'তে যাত্রা করে সেই রূপকথারই রাজ্যে পেঁচেছেন,—

'সবপেয়েছির দেশে কারো নাইরে কোঠাবাড়ি—
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়, হস্তিশালায় হাতি
স্ফটিক দীপে গন্ধ তৈলে জ্বালায় না কেউ বাতি।
রমণীরা মোতির সিঁথি পরে না কেউ কেশে,
দেউলে নেই সোনার চূড়া সব-পেয়েছির দেশে।

'খেয়া' কাব্য আলোয় আঁধারির কাব্য—কিছুটা বাস্তব কিছুটা অতীন্দ্রিয় জগৎ এখানে পাশাপাশি প্রবাহিত। তাই 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'বলাকা'র যুগ আধ্যাত্মিকতা ও তত্ত্বের যুগ। 'পলাতকা'য় আবার কবি বাস্তব জগতের সুখদুঃখময় জগতে নেমে এলেও রূপকথার স্বপ্নরাজ্যের কল্পনাকে কবি বাদ দিতে পারেননি। পলাতকায় 'মালা' কবিতাটি তার প্রমাণ ঃ

'আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে
সিংহাসনে রানীর হাতে
ছিল সোনার থালা
তারি পরে একটি শুধু ছিল মণির মালা।'

'শিশু ভোলানাথের' জগতে এসে কবি আবার রূপকথার রহস্য ও রোমাঞ্চময় রাজ্যে ফিরে এলেন। একটা জিনিষ বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে—অরূপ উপলব্ধির জগতই হোক আর বিশ্বতত্ত্বের কোন গভীরতম জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেই হোক, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসত্তা সেখান থেকে বারবার সরে এসে লৌকিক কল্পনার জগতে রূপকথার আলো আঁধারির স্বপ্নময় মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছেন। শিশু ভোলানাথ-এর জগতে আছে চাঁদের বুড়ীর সন্ধান কবি সেই লৌকিক চাঁদ বুড়ীর ছবি আঁকেন বাংলাদেশের প্রচলিত লৌকিক ধ্যান ধারণার—

'এক যে ছিল চাঁদের কোনায় চরকা কাটা বুড়ী
পুরাণে তার বয়স লেখে সাতশ হাজার কুড়ি।
সাদা সুতোয় জাল বোনে সে হয় না বুনন সারা
পণ ছিল তার ধরবে জালে লক্ষ কোটি তারা।' [বুড়ী]

কবির শিশু ভোলানাথ নীলমেঘের অন্ধকারে সাত সমুদ্র তেরো নদীর কল্পনা করে বলে—

'দেখছ না কি, নীল মেঘে আজ আকাশ অন্ধকার।
সাত সমুদ্র তেরো নদী আজকে হব পার
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ নাইকো হরিশ খোঁড়া
তাই ভাবি যে কাকে আমি করব আমার ঘোড়া।' [সাত সমুদ্র পারে]

শীতের বেলায় শিশু ভোলানাথ কাদের ছাতের রোদ্দুরে দেওয়া বেগনি রঙের শাড়ি দেখে ভাবে—

'তেপান্তরের পার বুঝি ঐ
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ী।
থাকত যদি মেঘে ওড়া পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়া
তক্‌খুনি যে যেতেম তারে লাগান দিয়ে কষে।
যেতে যেতে নদীর তীরে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি গাছের তলায় বসে।' [খেলা-ভোলা]

বাঙলাদেশের লৌকিক ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এ ছাড়া তিনি জানতেন বাঙলা দেশে কতকগুলো লৌকিক ভয়, বিশ্বাস ও কুসংস্কার আছে। শিশুদের আছে ভূতের ভয়, 'জুজুবুড়ি'র ভয়। 'পথহারা' কবিতাটির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে বাঙলাদেশের লৌকিক ছড়ার ছ-পণকড়ি, শিশুর ভৌতিক বিশ্বাস, জুজুবুড়ি, উপকথার শেয়াল ভায়া, সিঙ্গিমামা ইত্যাদির চিহ্ন। যথা ঃ

(ক) ছড়া ঃ জামতলাতে বুড়ি ছিল, বললে 'খবরদার'।
আমি বললেম বারণ শুনে "ছ-পণকড়ি এই নে গুণে,"
যতক্ষণ সে গুণতে থাকে হয়ে গেলাম পার। [পথহারা]

(খ) লৌকিক বিশ্বাস ঃ যতই চলি যতই চলি বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোশ পরা আঁধায় সাজল জুজুবুড়ী। [ঐ]

(গ) ভৌতিক বিশ্বাস ঃ খেজুর গাছের মাথায় বসে দেখছে কারা ঝুঁকি
কারা যে সব ঝোপের পাশে একটুখানি মুচকে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো কেবল মারে উঁকি।

(ঘ) উপকথার শেয়াল ঃ ফুরোয় না পথ ভাবছি আমি ফিরব কেমন করে।
সামনে দেখি কিসের ছায়া ডেকে বলি "শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ দেখিয়ে দেনা মোরে।"

(ঙ) উপকথার সিঙ্গিমামা : কল্পনা কিছুই, চুপটি করে কেবল মাথা নাড়ে

সিঙ্গিমামা কোথা থেকে হঠাৎ কখন এসে ডেকে

কে জানে, মা হালুম করে পড়্‌ল যে কার ঘাড়ে।

শিশু ভোলানাথের পথ হারানোর মাঝে কবি বাঙলার ছড়া উপকথার বিচিত্র জগতে পর্যটন করেছেন। 'এক যে ছিল রাজা' দিয়ে যেমন রূপকথার সূচনা হয়ে থাকে বাঙলাদেশের কিছু লৌকিক ছড়ায় তেমনি—'এক যে ছিল শেয়াল' দিয়েই আরম্ভ হয়, যেমন, একটি লৌকিক ছড়া—

'এক যে ছিল শেয়াল
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল
তার বাপের নাম রতা
আমার ফুরিয়ে গেল কথা—' [২৪ পরগণা]

রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াটিকে অবলম্বন করে 'রাজা ও রানী' কবিতাটি রচনা করেছেন। যথা :—

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে গিয়েছিলুম ছুটে
দেখতে ডালিম গাছে পিরভু কেমন নাচে।

রূপকথা উপকথার জগৎ আর শিশুর ঘুমের জগৎ এক। তাই শিশু ভোলানাথ বলে, জাগার থেকে ঘুমোই, আবার ঘুমের থেকে জাগি, তখন মনে হয়, রাজকন্যে থাকে আমার সিঁড়ির নীচের ঘরে। তারপর ভিড় করে এসেছে রূপকথা উপকথার মনুষ্য ও মনুষ্যেতর নানা চরিত্র—

'নাপিত ভায়া, শেয়াল ভায়া ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমী
ভিড় করে সব আসবে যখন কী যে করবে তুমি।' [ঘুমের তত্ত্ব]

কিংবা ভৌতিক জগতের নানা চরিত্র :

"গাছের ডালে পাতার লালে আকাশ রাঙা
সেথা বেড়ায় যক্ষী বুড়ী গুঁড়ি গুঁড়ি আম শেওড়ার ঝোপে ঝোপে
ফুলের গাছে দোয়েল নাচে ছায়া কাঁপে।" [মর্তবাসী]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় বাংলার রূপকথা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়ে অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন চলিয়া আসিয়াছে। ইহার উৎস সমস্ত বাংলা-দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলেই শুক্র সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুম পাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত। অতএব বাঙালীর ছেলে—

যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলা-দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।" 'শিশু ভোলানাথ'-এর 'বাণী-বিনিময়' কবিতায় শিশু মাকে বলে মা যদি আকাশ হত, সে হত চাঁপার গাছ, তাহলে—

'সেই হত তোর বাদল বেলার রূপকথাটির মতো,
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায় পেরিয়ে রাজ্য কত,
সেই আমারে বলে যেত কোথায় আলেখ-লতা
সাগর পারের দৈত্যপুরের রাজকন্যার কথা,
দেখতে পেতেম দুয়োরানীর চক্ষু ভর-ভর,
শিউরে উঠে পাতা আমার কাঁপত থর থর।'

'পূরবী' কাব্যের 'শিলভের চিঠি' কবিতাটি ছড়ার ছন্দে লেখা—

ছড়া কিংবা / কাব্য বস্তু / লিখবে পরের / ফর মাসে /
রবীন্দ্রনাথ / ঠাকুর জেনো / নয়কো তেমন / শর্ম্মা সে /

'মহুয়া' কাব্যের নাম্নী পর্যায়ের ঝামরী কবিতায় নায়িকার অদৃশ্য বাধা অতিক্রমের জন্যে রূপকথার রাজপুত্রের স্মরণ করেছেন, যথা ঃ

'জানে না কিসের বাধা তার
অদৃষ্টের মায়া দুর্গদ্বার
কোন রাজপুত্র এসে
মন্ত্রবলে ভেঙে দেবে শেষে।'

রবীন্দ্রনাথ বহুক্ষেত্রে রূপকথাকে বাস্তব সংসারের উপর প্রয়োগ করে প্রত্যক্ষ সংসারের কাঠিন্যকে রূপকথার কল্পলোক দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। 'পরিশেষ' কাব্য-গ্রন্থের 'রাজপুত্র' কবিতাটি এড়টি রূপক কবিতারূপে দেখা দিয়েছে, রাজপুত্রকে কবির মনে হয়েছে, তার ভাষা প্রাণে দেয় আনি, সমুদ্র পারের কোন অভিনব যৌবনের বানী', । কিংবা যখন তিনি বলেন—

"বলি তার পদযুগ চুমি, 'রাজপুত্র তুমি
এতদিন আত্মপরিচয় হীন
জড়তার পাষাণ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা
দুর্গ-মাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা
কোন মন্ত্রগুণে সে দুর্ভেদ বাধা যেন দহিলে আগুনে,
বন্দিনীরে করিলে উদ্ধার, করি নিলে আপনার,
নিয়ে গেলে মুক্তির আলোকে।

তখন রূপকথার রূপকে প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রণার কথাই প্রকাশিত হয়।

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের যুগে এসে গৃহস্থ পাড়ার ভাষায় গদ্য ছন্দে কাব্য দেখা দিল, ভাষার গান আর ভাষার গৃহস্থলী এক হয়ে গেল, কবি কিন্তু লৌকিক ঐতিহ্যকে ত্যাগ

করতে পারলেন না। 'ছেলেটা' কবিতার সেই ছেলেটির বাস্তব জীবন যতই বেদনাদায়ক হোক্‌-না কেন, স্বপ্নে কিন্তু জেগেছে রূপকথার রোমান্টিক আমেজ।

তলায় পাতা ছড়িয়ে শেওলাগুলো দুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা করে,
আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা ?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল
আঁকাবাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে।

ঐ কাব্যেরই 'খেলনার মুক্তি' কবিতাটিতে জাপানী খেলনার মধ্যে রূপকথার রাজকন্যা রাজপুত্রের সন্ধান পেয়েছে মনিদিদি। পুতুল রাজপুত্র হানাসান পরেছে জাপানী পেশোয়াজ ফিকে সবুজের পরে ফুলকাটা সোনালী রঙের। বিলেতের হাট থেকে এল তার বর। সেকালের রাজপুত্র কোমরেতে তলোয়ার বাঁধা, মাথার টুপিতে উঁচু পাখির পালক। জাপানী পুতুল রাজকন্যা হানসান-এর সঙ্গে হবে বিলাতী পুতুল রাজপুত্রের বিয়ে। একদিন রাজকন্যা হানসান চামচিকের উপর চড়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পাড়ি দিল মেঘের দেশে। মনিদিদিও তাকে খুঁজতে বেরুলো বটগাছের আঙিনায় বাস করে যে ব্যাঙ্‌গমা, তার পিঠে চড়ে—

ব্যাঙ্‌গমা মেলে দিলে পাখা,
মণিদিদি উড়ে চলে সারা রাত্রি ধরে।

কিন্তু পুতুল রাজকন্যাকে মণিদিদি খুঁজে পেলো না। মেঘেরা বলল, ঐ চেয়ে দেখো হানসান হল নানাখানা। ওর ছুটি নানা রঙে নানা চেহারায় নানা দিকে বাতাসে বাতাসে আলোতে আলোতে। খেলনায় রাজকন্যা রাজপুত্র কবির রোমান্টিক দৃষ্টিতে এক নোতুন সৌন্দর্যের রাজ্য তৈরী করেছে। পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 'শাপমোচন' কবিতাটি পুরাণ ও রূপকথার সংমিশ্রণে রচিত। প্রেয়সী চিন্তামগ্ন উদাসী গন্ধর্ব সৌরসেন এর ইন্দ্রের তাল গেল কেটে, উর্বশীর নাচে পড়ল বাধা, ইন্দ্রানীর কপাল উঠল রাঙা হয়ে, স্খলিত ছন্দ সুর সভায় অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হল, অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হল গান্ধার রাজগৃহে, আর মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম হল কমলিকা। তারপর সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্বে বিচ্ছেদ এল কমলিকা চলে গেল বহু দূরে বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্য নির্দিষ্ট রাজগৃহে। সেখানে ঝিল্লি ঝংকৃত রাতে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রালোকে রাণী অনুভব করলো—

দেখা মানুষ আজ না -দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে
পাঠিয়ে দিলে সাত সমুদ্র পারে রূপকথার দেশে
সেখানকার পথ কোন দিকে।

তারপর একদিন চোখের দেখা শেষে হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃত রূপকে অনুধাবন করে পুনরায় রাজা ও রানী মিলিত হল।

যৌবন যে উদ্দেশ্যহীন অজানা দুর্গম পথে বেগবান 'শেষ সপ্তকে'র, ১৯ কবিতায় তাকে প্রকাশ করতে ঘোড়সওয়ার রাজপুত্রের রূপক আনা হয়েছে। যথা :

তখন বয়স ছিল কাঁচা, কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,
বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার, জিন নেই, লাগাম নেই,
ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে
ভর সন্ধেবেলায়।

'ভালবাসা' আর 'প্রিয়া'র সান্নিধ্য যে অজানা জগতের রহস্যময় যৌবনের দূতের কাছে তাকেও প্রকাশ করে দেয় রূপকথা, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার। রাজকন্যা, মায়ার ঘুম, সোনার কাঠির দ্বারা। যথা ঃ

ভালবাসা সম্ভবের মধ্যেই
নিয়তই অসম্ভব, জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।

কিংবা—

ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।

একজন যুবকের কাছে তার প্রেয়সী স্বপ্ন কল্পনার সাত সমুন্দুর পারে ঘুমন্ত রাজকন্যার মতোই অলব্ধা রহস্যময়ী। তাকে জাগাতে গেলে চাই প্রেমের সোনার কাঠি।

পুরাকাহিনী বা 'লিজেন্ড' লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম বিষয়বস্তু। শেষ সপ্তকের ৩২ নং কবিতায় বাংলাদেশের রঘু ডাকাতের একটি পুরাকাহিনী অপূর্ব নাটকীয় ভাবে কবি পরিবেশন করেছেন। পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ, হাতির দাঁতের মতো কোমল সাদা পঙ্খের কাজ করা মেজে, তার উপরে খান দুয়েক মাদুর পাতা ছোট ছেলেরা জড়ো হয়েছে ঘরের কোণে মিট্‌মিটে আলোয়। বুড়ো মোহন সর্দার কলপ লাগানো চুল বাবরি করা মিশকালো রং বসেছে আমাদের মাঝখানে বলছে রোঘো ডাকাতের কথা। আমরা সবাই গল্প আঁকড়ে বসে আছি। "অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিত কথা।

তত্তরত্নের ছেলের পৈতে,
রোঘো বলে পাঠাল চরের মুখে,
"নমো নমো করে সারলে চলবে না ঠাকুর
ভেবো না খরচের কথা।"
মোড়লের কাছে পত্র দেয়
পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে ব্রাহ্মণের জন্যে।
রাজার খাজনা—বাকির দায়ে বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে
হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে
দেনা শোধ করে দেয় রঘু।

বলে—"অনেক গরীবকে দিয়েছে ফাঁকি,
কিছু হালকা হোক তার বোঝা।"

তারপর একদিন মাঝরাত্রিরে রোঘো ফিরছে লুটের মাল নিয়ে। শুনতে পেলো বিয়েবাড়ীতে কান্নার ধ্বনি, বর ফিরে চলেছে বচসা করে, কনের বাপ পা আঁকড়ে ধরেছে বরকর্তার।

এমন সময় পথের ধারে ঘন বাঁশের বনের ভিতর থেকে
হাঁক উঠল, রে রে রে রে রে রে।

পাল্কি থেকে টেনে বার করলো বরকে, বরকর্তার গালে মারলো প্রচণ্ড চড়, দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়াল সভায়। উলঙ্গ প্রায় দেহ সবার। তেলমাখা সর্বাঙ্গে মুখে ভূসোর কালি।

বিয়ে হল সারা তিনপ্রহর রাতে
যাবার সময় কনেকে বললে ডাকাত
"তুমি আমার মা,
দুঃখ যদি পাও কখনো স্মরণ করো রঘুকে।"

পরিসমাপ্তিতে লেখক আশ্চর্যভাবে যুগ পরিবর্তনের ছবিটি এঁকেছেন। রূপকথা-উপকথার দিনগুলি যে শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার যুগে লোক জীবন যে নির্বাসিত তার ছবি এঁকেছেন—

তারপরে এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা শোনা নিভৃত সন্ধ্যেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি আর নিবে যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি কবির আত্মনিরীক্ষা বা আত্মদর্শন। সমগ্র জীবনকে তিনি পর্যালোচনা করেছেন। যৌবন ও শৈশবকে উপস্থিত করেছেন দুটি লৌকিক রূপকে। যৌবনে তিনি বাউল, তিনিই ছিলেন শৈশবে রূপকথার রাজপুত্র। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ পথিক, পথচলাই ছিল তাঁর কাব্য জগতের একমাত্র আনন্দ। রূপকথার রাজপুত্র ও বাউলের পথ চলার মধ্যে যে অনির্দেশ্য অকারণ অবারণ গতি আছে রবীন্দ্র কাব্যজীবনে তা একটি অন্যতম প্রেরণা হিসেবে দেখা দিয়েছে। 'শেষ সপ্তকে'র ৪৩ নং কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে এর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে। কবি বলেছেন, একদিন ছিলেম বালক। কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে সেই যে—লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া তোমরা তাকে কেউ জান না, একমাত্র কবিই তাকে জানতেন।

সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।
সন্ধ্যেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড়

সে দিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই
জানা না-জানার সংশয়ে।
সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলে আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

অপর দিকে যৌববনের ক্ষণে পঁচিশে বৈশাখ তারপরে দেখা দিল আর এক কালান্তর, ফাল্গুনের প্রত্যুষে। কবির কথায়—

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে
ডেকে বেড়াল নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।

'ছেলে ভুলোনা ছড়া' প্রবন্ধে ছড়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"ইহাদের বাল্য সরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে আমাদের দেশে এমন চিত্রকর কোথায় এবং বোধ করি সর্বত্রই দুর্লভ।"

[লোকসাহিত্য, পৃঃ ২০]

বাল্য সারল্য, উজ্জ্বল নবীনত্ব, সংশয়হীনতা ও অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করে। ছড়া রচনা সত্যিই দুর্লভ। তাই 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অতি সহজেই ছড়ার অসংলগ্নতার অর্থহীনতার বৈশিষ্টগুলি নিয়ে 'খাপছাড়া' গ্রন্থে কিছু নিজস্ব ছড়া লিখেছেন। যথা :

১. ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়,
কোন দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জানলায়
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে,
চুন দেয় তারা ডালনায়।

ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ির পাঁচ বোনের যে সব কান্ড-কারখানা উপস্থিত করা হয়েছে

তার মূলে রসই হচ্ছে অসংগতি। যথাযথ আচরণের বৈপরীত্যের ফলে যে সংগতিহীন চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তাতে শিশুর মনোরঞ্জন-এর প্রচেষ্টাটি সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। কিংবা ২নং ছড়াটিতে দেখা যাচ্ছে দামোদর শেঠের অসম্ভবের চাহিদার তালিকায় অসম্ভবের সম্ভবতায় একটি কৌতুকরস সৃষ্টি করেছে—

অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি,
মুড়কির মোয়া চাই, চাই ভাজা ভেটকি।
আনবে কটকি জুতো মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়ানো,
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি।

রাজপুত্র ও রাজকন্যা নিয়েও পরিহাস করা হয়েছে ৪নং ছড়াটিতে—

কাঁচড়াপাড়াতে এক ছিল রাজপুত্তুর
রাজকন্যারে লিখে পায় না সে উত্তর
টিকিটের দাম দিয়ে রাজ বিকাবে কি এ,
রেগেমেগে শেষকালে বলে ওঠে—দুত্তোর!
ডাক বাবুটিকে ছিল মুখে ডাল কুত্তোর।

ছড়ায় রূপকথার ছবি এঁকেছেন—

রাজা বসেছেন ধ্যানে বিশজন সর্দার
চীৎকার রবে তারা হাঁকিছে—খবরদার।
সেনাপতি ডাক ছাড়ে, মন্ত্রী সে দাড়ি নাড়ে,
যোগ দিল তার সাথে ঢাকঢোল- বর্দার।
ধরাতল কম্পিত, পশুপ্রাণী লম্ফিত,
রাণীরা মূর্ছা যায় আড়ালেতে পর্দার।

কিংবা,

খবর পেলেম কল্য
তাঞ্জামেতে চড়ে রাজা
গঞ্জামেতে চলল।
সময়টা তার জলদি কাটে,
পেঁছিল যেই হলদি ঘাটে
একটা ঘোড়া রইল বাকি,
তিনটে ঘোড়া মরল
গবাসহাটায় পেঁছে সেটা
মুচের ঘাড়ে চড়ল।

ভৌতিক বিশ্বাসের ছবি এঁকেছেন ছড়াতে—

ভয় তার বাহিরেতে, ভয় তার অন্তরে,
ভয় তার ভূত-প্রেতে, ভয় তার মন্তরে।

দিনের আলোতে ভয় সামনের দিঠেতে,
রাতের আঁধারে ভয় আপনারি পিঠেতে।

'খাপছাড়া'র ছন্দ পুরোপুরি লৌকিক ছড়ার ছন্দ, শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দেই সমস্ত কাব্যটি রচিত। যথাঃ—

ভূর্ত হয়ে / দেখা দিল / বুড়ো কোলা / ব্যাঙ
8+8+8+২
এক পা টে / বিলে রাখে / কাঁধে এক / ঠ্যাঙ
8+8+8+২

'ছড়ার ছবি' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ছড়ার ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন—"ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘারাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমিপ্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্র সমাজে সভা যোগ্য হবার কোন খেয়াল এর মধ্যে নেই।……এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমর রাখে। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সবচেয়ে কম সহজ।"

'ছড়ার ছবি' কাব্যগ্রন্থে 'যোগীনদা' কবিতাটি ছড়া ও রূপকথার রসে ভরপুর। লৌকিক ছড়ার ছন্দে যোগীনদাদার বানানো অসম্ভব আজগুবি কাহিনী উপস্থিত করা হয়েছে। রূপকথা আর বাস্তব রসে মিলে এক অসামান্য গল্পরস জমে উঠেছে কবিতাটিতে। যোগীনদা গল্প বলেছেন, বুলন্দশর পার হয়ে ফিরোজাবাদ গাড়ী যখন পেঁছুলো তখন যোগীনদাদার বিষম খিদে পেল। আর তারপরই—

ঠোঙায় ভরা পকৌড়ি আর চলছে মটর ভাজা
এমন সময় হাজির এসে জৌনপুরের রাজা
পাঁচশো-সাতশো লোকলস্কর, বিশ-পঁচিশটা হাতি
মাথার উপর ঝালর দেওয়া প্রকান্ড এক ছাতি।
মন্ত্রী এসেই দাদার মাথায় চড়িয়ে দিলে তাজ,
বললে, 'যুবরাজ
আর কতদিন রইবে প্রভু, মোতিমহল ত্যেজে',
বলতে বলতে রান শিঙা আর ঝাঁঝর উঠল বেজে।
ব্যাপারখানা এই—
রাজপুত্র তেরো বছর রাজভবনে নেই।
সদ্য করে বিয়ে
নাথ ছোয়াবার সেগুন বনে শিকার করতে গিয়ে
তারপরে যে কোথায় গেল, খুঁজে পায় না লোক।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল রাণীমায়ের চোখ।

'ছড়াছবির' কাব্যগ্রন্থের 'বালক' কবিতাটিতে বাল্যজীবনের স্বপ্ন কল্পনার ছবি

এঁকেছেন। বাল্য কৈশোর জীবনের আনন্দ-বেদনার মুহূর্তগুলি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কিশোর কল্পনার চিত্রে রূপকথার ব্যঞ্জনা উপস্থিত হয়েছে। যথা :

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিমঝিমনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথ হারা।

আসলে ছড়ার ছবিতে লৌকিক ছন্দে জীবনের সহজ চিত্রকে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছেন।

'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লোক সাহিত্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন—'বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়,—তাহারাই ইহার ভাঙ্গা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে সেই জন্যেই বাঙালীর কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।" [লোকসাহিত্য, পৃঃ ৫৭] তাই—

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিবসাগর ॥

ইত্যাদি লৌকিক ছড়াটি কবিকে সেই প্রাচীন লোকজীবনের প্রান্তে নিয়ে গিয়েছে। সেঁজুতি কাব্যের 'নতুন কাল' কবিতাটিতে লৌকিক ছড়ার 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর' পদটি ধ্রুবপদের বা ধুয়ার কাজ করেছে এবং সঙ্গে পুরাতন কাল এবং নূতন কালের সন্ধিস্থলে কবিকে নিয়ে গেছে। সেকালের প্রাচীন লৌকিক জীবনের নানা বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংস্কার, কুসংস্কার, ছড়া রূপকথার জগতে চলে গেছে কবি—

(১) কোন সেকালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।'
তখন যে-সব ছেলেমেয়ে শুনেছে এই ছড়া
তারা ছিল আর এক ছাঁদে গড়া।
প্রদীপ তারা ভাসিয়ে দিত পূজা আগত তীরে
কী জানি কোন্ চোখে দেখত মকর বাহিনীরে।

(২) কুসংস্কার : আয়ু লাভের তরে
বলির পশুর রক্ত লাগায় শিশুর ললাট পরে

(৩) লৌকিক বিশ্বাস : ও দিকেতে মাঠে বাটে দস্যুরা দেয় হানা
ও দিকে সংসারের পথে অপদেবতা লনা।

আজকে ঐ কুসংস্কার আর লৌকিক বিশ্বাসের যুগ অতিক্রান্ত হলেও কবির ভাষায় :—

তখনো সেই বাজবে কানে যথা যুগান্তর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।'

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটি বিখ্যাত লৌকিক ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন তার প্রথম পর্দাটি এই।

"যাদু এতো বড় রঙ্গ, যাদু, এতো বড় রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥"
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেল,
তাহার চেয়ে অধিক কালো, কন্যে তোমার মাথার কেশ।

রবীন্দ্রনাথ প্রহাসিনী কাব্যগ্রন্থে ঐ একই লৌকিক ছড়াটির ছন্দে, আঙ্গিকে ও বিষয়-বস্তুতে রচনা করলেন 'রঙ্গ' কবিতাটি। কবিতাটি নামের রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন 'এ তো বড় রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে লিখিত। এই কবিতাটির প্রথম ছত্রটি উপস্থিত করলে বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে। যথা:

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু এ তো বড় রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোনপাপড়ি—
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।

লৌকিক ছড়াটি পাঁচ ছত্রে লিখিত। রবীন্দ্রনাথও তার অনুকরণেই পাঁচটি ছত্রেই কবিতাটি সম্পূর্ণ করেছেন, 'প্রহাসিনী' কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লৌকিক ছড়ার ছন্দে লিখিত। 'ভাই দ্বিতীয়া' অনুষ্ঠানটি যেমন একটি লৌকিক অনুষ্ঠান তেমনি তাকে প্রকাশও করেছেন লৌকিক ছড়ার ছন্দে। যথা:

সকলের শেষ ভাই সাত ভাই চম্পার
পথ চেয়ে বসেছিল দৈবানুকম্পার,
মনে মনে বিধি সনে করেছিল মন্ত্রণ
যেন ভাইদ্বিতীয়ার পায় সে নিমন্ত্রণ।

'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'যাত্রাপথ' কবিতাটিতে পুস্তক পাঠ, অজানাকে জানার আকাঙ্খা ও জীবনের যাত্রাপথকে উপলব্ধির করার পরিচয় প্রকাশ করার জন্য কবি গ্রহণ করেছেন রূপকথার প্রতীক। জীবনে চলার পথ কখনও সোজা, কখনও বাধা, কখনও বা আঁকাবাঁকা। রাজপুত্র কিংবা সদাগর পুত্র এখানে চলমান মানবের প্রতীক হিসেবে উপস্থিত, আর তার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার, তেপান্তরের মাঠ—অজানাকে জানবার আকাঙ্খা নিরুদ্দেশ যাত্রার। কবির ভাষায়—

শুরু হইতে এইটে গেল বোঝা,
হয়তো বা এক বাঁধা রাস্তা কোথাও আছে সোজা
যখন তখন হঠাৎ সেথায় ঠেকে
আন্দাজে যায় ঠিকানাটা বিষম এঁকেবেঁকে।

জীবনের এই বন্ধুর যাত্রাপথের পাশেই কবি এঁকেছেন রূপকথার অনির্দেশ্য যাত্রাপথ:

সব-জানা দেশ এ নয় কভু, তাই তো তেপান্তরে,
রাজপুত্তুর ছোটায় ঘোড়া না-জানা কার তরে।

সদাগরের পত্র সেও যায় অজানার পার
খোঁজ নিতে কোন সাত-রাজা-ধন গোপন মাণিকটার।
কোটাল পত্র খোঁজে এমন গুহায় থাকা চোর
যাকে ধরলে সকল চুরির কাটবে বাঁধন ডোর।

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ছেলে ভুলানো ছড়া প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই।" [পৃঃ ৩] 'পরবর্তী' জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু ক্ষেত্রেই এমনিই স্বীকার করেছেন যে লোকসাহিত্য তাঁর সাহিত্য জীবনের ভাব ও কল্পনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ ভাবমূর্তি কল্পনায় রূপকথার রাজপুত্র, রাজকন্যা, সোনার কাঠি, তেপান্তরের মাঠ সহায়তা করেছে, তেমনি লৌকিক ছড়াও কোন কোন জায়গায় একটি কল্পনা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। 'আকাশ প্রদীপে'র 'বধূ' কবিতাটিতে কবি স্বীকার করেছেন বাল্যকালের ঠাকুমার কাছ থেকে শোনা একটি ছড়াই 'নারী ও বধূ' সম্পর্কিত ধারণা ও ভাব কল্পনা তৈরী করেছে। কবির ভাষায় ঃ—

ঠাকুমা দ্রুত তালে ছড়া যেত পড়ে—
ভাবখানা মনে আছে—"বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আম কাঁঠালের ছায়ে
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণ চক্রপায়ে।"
বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে

সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।

তারপর থেকে নারী ও বধূ সম্পর্কিত চেতনা তৈরী হয়ে বাঁধা পড়েছে ঐ ছড়াটির সঙ্গে। কবির চেতনায় অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা ফিরিছে সে চির-পথভোলা জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে। গলায় মোতির মালা, সোনার চরণ চক্র পায়ে।

'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বুঝিতে পারিনা, কেন এর মহাকাব্য এবং খণ্ড কাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে অথচ এই সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছার কৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। [লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩] রবীন্দ্রনাথ 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'বধূ' কবিতাটির মত 'সময় হারা' কবিতায় বাল্যস্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে শৈশবের শোনা অর্ধবিস্মৃত

ছড়াগুলির সাহায্য নিয়েছেন। এখানে পুরানো ভুলে যাওয়ার দু' একটি টুকরো ছড়ার মধ্য দিয়ে সমস্ত শৈশবের জীবনটাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করেছেন। যথা :

চেটায় পেতে শুয়ে ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আউড়ে চলি শুধু আপন মনে
"উড়কি ধানের মুড়কি দেব, বিন্নে ধানের খই
মরা ধানের চিড়ে দেব, কাগ মারে দই।"

কিংবা,

রাতের বেলায় ডোমপাড়াতে কিসের কাজে
তাক ধুমাধুম বাদ্যি বাজে
তখন ভাবি একলা বসে দাওয়ার কোণে মনে-মনে
ঝড়েতে কত জারুল গাছের ডালে ডালে
পিরভু নাচে হাওয়ায় তালে।

কিংবা,

সজনে গাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে
গোধূলিতে সুর্যিমামার বিয়ে।

কিংবা,

'কুলুদফুল' যে কাকে বলে, ঐ যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে।

উপরোক্ত কবিতাংশের মধ্যে 'উড়কি ধানের মুড়কি থেকে কাগ মারে দই', তাক ধুমাধুম বাদ্যি বাজে, পিরভু নাচে, 'কমলাপুলির টিয়ে, সুর্যিমামার বিয়ে', 'কুলুদফুল' ইত্যাদি অংশগুলি লৌকিক ছড়ার অংশ। এই ছড়ার অংশগুলির মধ্য দিয়ে কবি হারানো শৈশব স্মৃতিকে ফিরে পাবার চেষ্টা করেছেন। কবির কাছে হারানো সময়টাকে মনে হয়েছে 'এটা নেহাত স্বপ্ন কি নয়, এ কি নিছক সত্যি'। বাঘনা পাড়া পেরিয়ে সখীর সঙ্গে যে রাজার মেয়ে আসছে তাকে তাকে কবির মনে হয়েছে—

নব যুগের রাজকন্যা অর্ধেক রাজ্যসুদ্ধ।

'ছড়ার' টুকরো বার বার ফিরে এসেছে রবীন্দ্রকাব্যে। এই কাব্যগ্রন্থেরই 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি লৌকিক ছড়ার বিষয়বস্তুতে লেখা। কবির ভাষায়—

ঘুমলাগা রোদ্দুরে ঝিমঝিমানি সুরে—
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাত দলের।

এই লৌকিক ছড়াটি কবিকে এক অজানা মানবীর বেদনায় মুখর করে তুলেছে—

আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে
যৌবনতায় চলে গেছে, জীবন গেছে চুকে

বুক-ফাটানো এখন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।

সেকালের একটি ছড়ায় এমন অনেক 'বুক-ফাটানো খবর' লুকিয়ে আছে যা রবীন্দ্র কবি মনকে উদ্দিপ্ত করেছিলো। তাই কবি বলেন—

অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দ মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

ছড়ার জগত থেকে কবি মাঝে মাঝে ছুটে গেছেন রূপকথার জগতে। 'সানাই' কাব্য-গ্রন্থের 'রূপকথায়' সেথা কবি মনে মনে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন রূপকথার জগতে—

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে
মেলে ছিলাম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই রূপকথার
পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা
মনে মনে।
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশ কুসুম তুলি
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে
পরীর দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে।

কবির কাছে রূপকথার রাজ্য হচ্ছে রোমান্সের রাজ্য। আর রাজ কন্যা হলো সেই রোমান্সের রাজ্যের মানসী-প্রতিমা। কবি মাঝে মাঝে সেই মানস সুন্দরীর সন্ধানে তাঁর স্বপ্ন ঘোড়ায় ছুটেছেন—

'অচিণ কবি, তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যেত একটি ছায়াছবি—
স্বপ্ন ঘোড়ায়-চড়া তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ
তোমার মানসীকে সীমাহীন তেপান্তরে,
রাজপুত্র তুমি যে রূপকথার।

কবি এখানে নিজেকেই রূপকথার রাজপুত্রের প্রতিবিম্বিত করেছেন। লোকসাহিত্যের মধ্যে বিশেষ করে বাঙলা দেশের লোকসাহিত্যে নায়ক বা নায়িকাদের বারমাস্যা প্রচলিত আছে। বিরহের একটি বিশেষ মুহূর্তে নিজেদের সুখ-দুঃখ বা বিরহী মনের ব্যথা

বেদনার কথা মূর্ত করে তোলাই এসব বারমাস্যার প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও আছে বারমাসের প্রাকৃতিক নানা অবস্থা ও সামাজিকে রীতি নীতির ইঙ্গিত। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের ১৮নং কবিতাটি একটি বারমাস্যার সার্থক নিদর্শন। সমগ্র কবিতাটি কিয়দংশ উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। যথা ঃ

শ্রাবণ আমার গেছে চলে, নাই বাদলের ধারা,
অঘ্রাণ সে সোনার ধানের দিন করেছে সারা,
চৈত্র আমার রোদে পোড়া, শুকনো যখন নদী,
বুনো ফলের ঝোপের তলায় ছায়া বিছায় যদি,
জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয়নি ফাঁকি,
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনের সূচনায় শৈশবকালে একটি ছড়া দিয়ে কাব্য জীবনের সূচনা হয়েছিলো।

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিই তাতে
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিকে নিঃশব্দ।
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আর জীবিত কালের শেষ মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ 'ছড়া'। যে কবির কাব্য জীবনের উৎসে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ছড়াটি ছিল মোহ মন্ত্রের মত সে কবির জীবনে লোক-সাহিত্যের প্রভাব যে কতখানি সহজেই অনুমেয়। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কবি যেন ছড়া রচনার মধ্যেই জীবনের ভাললাগা মন্দলাগাকে উপলব্ধি করলেন। 'ছড়া' কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় [৫ই জানুয়ারী, ১৯৪১] কবি বলেছেন—

এলোমেলো ছিন্ন চেতন টুকরো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন্ স্বপ্নরাজের শুনতে যে পায় ডাক।
ছেড়ে আসে কোথা থেকে দিনের বেলার গর্ত—
কারো আছে ভাবের আভাস কারো বা নেই অর্থ—
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি, বাঁধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল শূন্যেতে দিক্‌হারা।

কবিও তাই জীবনের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে এলোমেলো ছিন্নভিন্ন টুক্‌রো কথার ঝাঁকে স্বপ্ন রাজ্যে উড়ে যেতে চাইলেন, বাঁধনহীনতার মাঝখানে জীবনকে নূতনভাবে আস্বাদ করতে চাইলেন—

কদমাগঞ্জ উজার করে মাল মালদহে,
চড়ায় পড়ে নৌকোডুবি হল যখন কালদহে,
তলিয়ে গেল অগাধ জলে বস্তা বস্তা কদমা যে
পাঁচ মহনার ক্যানুঘাটে ব্রহ্মপুত্র নদ-মাঝে। [২নং কবিতা]

৫নং ছড়াটিতে প্রকৃতি বর্ণনায় রোমান্টিকতার সঙ্গে লৌকিক মনোভঙ্গির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। যথা :

বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে লক্‌লকি।
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে ঝক্‌ঝকি।
চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ঐ ড্যাড্যাং ড্যাঙ।
মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে ডাকছে ব্যাঙ।

গ্রাম্যলৌকিক জীবনের সৌন্দর্যগুলিকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন লোকজীবনের প্রতীক ও চিত্রকল্পের সাহায্যে ৬নং ছড়াটিতে। যথা :

মেঘের শিঙে বসে ফিঙে লেজ দুলিয়ে নাচে--
শুধোয় নাচন,—সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্ মাছে।
মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে দুলে,
রোদ পড়েছে নাচন মণির ভিজে চিকণ চুলে।

॥ ছয় ॥

রবীন্দ্র পরবর্তী ও সমসাময়িক বাংলাকাব্য ও লৌকিক ঐতিহ্য

অতি আধুনিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে একজন বাঙালী আধুনিক কবি বলেছেন : "নিজের দেশের কবিতার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ভিতর স্থিত হয়েও আজকের মুখ্য কবি পৃথিবীর, বিশেষত পশ্চিমের শ্রেষ্ঠকাব্য উপলব্ধি করতে পেরে বাংলা কবিতাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন যে তার ভবিষ্যৎ পরিনতির প্রশ্ন। বৈষ্ণব পদাবলী মঙ্গলকাব্য পূর্ববঙ্গের গীতিকা বা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সত্যের ভিতরেই শুধু আটকে নেই—কিন্তু যেখানেই মানুষ তার স্বতন্ত্র আধুনিক চেতনাকে মহান কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছে সে সবের সঙ্গেও যুক্ত।" ১ অর্থাৎ আধুনিক কবি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে নিজের দেশের কবিতার সঙ্গে প্রথম ও প্রধান যোগ দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং তাই বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, পূর্ববঙ্গ গীতিকা মধুসূদনেরও রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেও আজকের আধুনিক কাব্য পশ্চিমী কবিতার সঙ্গে যোগসূত্র করেছে। তাই অতি আধুনিক বাংলাকাব্য ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এসেও যে তার লৌকিক যে গল্প এটি হারিয়ে ফেলোনি তার প্রমাণ আছে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের বংলা কাব্যে ও অত্যাধুনিক বাংলা কবিতায়।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের ৬টি ভাগ, (১) রবীন্দ্র ভাবানুসারী কবিবৃন্দ, (২) রবীন্দ্র প্রভাবযুক্ত অথচ স্বতন্ত্র কল্পনা বিশিষ্ট কবিমন্ডলী, (৩) অতি আধুনিক বাংলাকাব্য, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধন, সতেন্দ্রনাথ ও কালিদাস রায়, রবীন্দ্র ভাবানুসারী কবীর দল। এদের মধ্যে গ্রামীণ চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট বলে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত লৌকিক উপাদান এদের কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন কুমুদরঞ্জন ও করুণানিধনের কবিতায় বিষয়বস্তুতে আর সতেন্দ্রনাথের কাব্য আঙ্গিকে—

রবীন্দ্র পরবর্তী কবিগোষ্ঠী

॥ কুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

কবি মোহিতলাল একবার বলেছিলেন, বাংলার মাটিজল, বাংলার হৃদয়ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যদিও এ দেশের কোন কবির কাব্যের গভীর সংযোগ না থাকে, তবে তিনি বিশ্বকবি হ'তে পারেন বাঙালীর কবি নয়। কুমুদরঞ্জন বাংলার আসল কবি। কুমুদরঞ্জনের কাব্যসৃষ্টির মূলে আছে—জন্মভূমির প্রতি, বাংলার প্রকৃতি

সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি গভীর প্রেম। তাই তাঁর কবিতার উপাদান ও উপজীব্য—সম্পূর্ণভাবে বাংলার মাটি, জল. আকাশ বাতাস, তরুলতা এবং খাঁটি বাঙালীর ভাবনা-ধারনা ও সংস্কৃতি থেকে আহৃত। কুমুদরঞ্জনের কাব্যে বৈষ্ণবিকতার সঙ্গে লৌকিক জীবনের স্পন্দন—লৌকিক ঐতিহ্যের স্পর্শ। বাউল কবিতায় তারই প্রকাশ :

বাউল আমি, আমিই রাজা—আমি যুবরাজরে
'আঙরাখা' মোর সখের পোশাক অভিষেকের সাজরে
ও হাট গায়ে নুপুর পায়ে
গান গেয়েছি বাদল বায়ে
আমার সাধের গাবগুবাগুব সঙ্গে নাহি আজরে।

আসলে কুমাদরঞ্জনের মনটি ছিল পরিপূর্ণভাবে লৌকিক মানসিকতার দ্বারা পরিকীর্ণ। তাই নিজেকে তিনি 'বাউল' এর সঙ্গে উপমিত করে বলেছেন, 'মনের বাউল লুকিয়ে আছে আজও উহার মাঝরে।' এ জন্যে গোপীচন্দ্রেরও গুণগান করেছেন, আত্মকথায় প্রকাশ করেছেন,

ধনী মানীর আদর পেতে করিনাকো প্রানান্ত
সহজিয়া সহজ খুঁজি সহজে পাই আনন্দ
দু দণ্ডেরি আলাপেই খুব
বাজিয়ে যাব গাবগুবাগুব
অকুলের কোন কেঁদুলিতে করবো গিয়ে পারণ গো ॥

গ্রাম্য জীবনে আছে অসংখ্য লোক উৎসব ও মেলার পর্ব। তার মধ্য দিয়ে যে জীবনধারা বয়ে চলেছে, কুমুদরঞ্জন তার সন্ধান রাখেন। 'হংস খেয়ারী' কবিতায় দেখি :

চণ্ডীমায়ের 'সোনার কেগোঁ', তার বুকে যে থাকে,
ভোরে উঠেই 'লোচন-দেবে'র চরণ ধুলো মাখে।
গাজন, চড়ক রেতে হৃদয় উঠে মেতে
সুখে দুঃখে 'মঙ্গলারে' হৃদয় ভরে ডাকে ॥ [ঐঃ পৃঃ ৮৪]

একটি দিনের মেলাতে :—

বেচা কেনা লেনা দেনা চুকিয়ে যাবে সব,
নীরবতায় তলিয়ে যাবে মেলায় কলরব,
রাঙা কাগজ, ভাঙ্গা চুড়ি, টুকরো কাঁচের ছবি :
পটকা পোড়া রইবে পড়ে, দেখবে সাঁজের রবি। [ঐঃ ১০৭]

॥ কালিদাস রায় ॥

বাংলাদেশের ভাদু উৎসবের স্মৃতি একটি কবিতা। 'ভাদুরাণী এস ঘরে'

নিভায়ে তপনভাদের গগন ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে,
সঘনে গরজি বিজলি চমকে ভ্রূকুটি হানে সে রেগে

হেরি বাদলের ক্ষণিক ক্ষান্তি পাখী কলতান ধরে
এ হেন বাদরে আদাবিনী-মেয়ে ভাদ্‌রাণী এস ঘরে।

॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ॥

যতীন্দ্রনাথের কবিতা যতই বাংলাদেশের প্রচলিত রোমান্টিক সুরের বিরোধী হোক, যতই তাঁর কাব্য দুঃখবাদের সহায় হোক লৌকিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেনি, আর সেই সূত্রেই তার কাব্যে এসেছে নানা লৌকিক উপাদান। 'শিবের গাজন' কবিতায় রূপকের মাধ্যমে জগৎ জীবন সম্পর্কিত একটি গভীর বক্তব্য প্রকাশ পেলেও সেখানে প্রতীক ও রূপক হিসাবে শিবের গাজন, ফুলে খেলা, চড়কের পাকখাওয়া ইত্যাদি লৌকিক বিষয়বস্তুতে নিয়ে আসা হয়েছে। যথা ঃ

পাগলা শিবের বছুরে গাজন বেজেছে ডাক
কাল হবে দেনা-পাওনার কথা আজকে থাক।
আগুন জ্বালিয়ে সংন্যাসী সবে
ওই 'ফুল' খেলে ব্যোম ব্যোম রবে,
পিঠে মোড়া রাধা খায় ওরা বুঝি চড়ক পাক
থেকে থেকে থেকে বাজে ঝোকে ঝোকে গাজনে ঢাক।

বাংলাদেশের সাহিত্য বিশেষ করে লোকসাহিত্যের মধ্যে নায়িকার 'বারমাস্যা' লেখার রীতি প্রচলিত। আধুনিক যুগেও তারাশঙ্কর তাঁর কবি উপন্যাসে অতি আধুনিক কবি বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় বারমাস্যার রীতিতে কাব্য রচনা করেছেন। যতীন্দ্রনাথের 'পথের চাকরী' কবিতাটি বারমাস্যার রীতিতে রচিত। এখানে ইনার্জিনিয়ার কবির বারমাসের সুখ দুঃখের ছবি আঁকা হয়েছে। যথা ঃ

বৈশাখে চুত ডাকে পিকফুল
তরু ছায়ে মধু বায়ে ফুটে কত ফুল।

২. জৈষ্ঠে দেশটা যবে তৃষ্ণা বিকল
ছুটি নাই ছুটে তবু এ বাই সিকল'।

৩. আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে জোয়াদা
দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা।

৪. শ্রাবণে আমন কিছু হয়েছে রোয়া
নূতন পাটের ডগা সবুজে ধোয়া।

৫. আশ্বিনে আসমানে আলোর খেলা
নদীকূলে কাশফুলে শাদার মেলা।

৬. কার্তিকে চারিদিকে পেকে উঠে ধান
মাঝ পথে ছুটে মোর দ্বি-চক্র যান।

৭ অঘ্রান পেয়ে প্রাণ ক্রমে দিল পাশ,
আমা ছাড়া সকলেরই এল পৌষ মাস।

৮. চৈত্রে ক্ষেত্রে যা ফলিল ফসল
কেটে মেড়ে মেপে দেখি—উঠেনি আসল

বাঙলা দেশের রূপকথার 'সাত ভাই চম্পা এক বোন পারুল' প্রতীক এসেছে পারুলের আহ্বান কবিতায়—

সাত ভাই চম্পা, হা-গো—
জা-গো—জাগো মোর সাত ভাই!
নিদাঘের ভোরে শোন্
ডাকিছে পারুল বোন্,
অরণ্য মাঝে আর রাত নাই!
চম্পা গো চম্পা গো, জাগো ভাই।

কিংবা—

দিকে দিকে সাত দ্বীপ কাঁদে সাত সাগরে,
গরবিনী পারুলের সাত ভাই জাগোরে।
ভাঙি সুন্দর তনু
সৌরভী জয় ধনু
টঙ্কারি চম্পা গো, জা-গো।

বাউল সুরে একতার গান 'শাওনিয়া'—

শাওন এল ওই
থৈ-থৈ শাওন এল ওই
পথহারা বৈরাগী বে তোর
একতারাটা কই?
থৈ-থৈ শাওন এল ওই!

অতি আধুনিক বাংলা কাব্য

॥ জীবনানন্দ দাশ ॥

জীবনানন্দের অতি আধুনিক বাঙলা কবিতায় এসেছে লৌকিক ঐতিহ্যের স্পর্শ। অবচেত মনের অন্ধকার পথ পেয়ে তিনি যেমন জীবনের মধ্যে পেয়েছেন 'শিশুর মুখের গন্ধ' ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ আবার বলেছেন।

পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর, আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝতে চাই আর? জানিনা কি আহা, সব রাঙা কামনার শিয়রে যে

দোয়েলের মত এসে জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ, একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল সোনা ছিল যাহা নিরুত্তর শান্তি পায়, যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজন লাগে। [মৃত্যুর আগে]

অথবা রূপকথার 'শঙ্খমালার' ছবি এঁকেছেন :

কড়ির মতন সাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম,
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে ; দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার
স্তন তায়
করুন শঙ্খের মতো — দুধে আদ্র – কবেকার শঙ্খিনী মালার,
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর ॥ [শঙ্খমালা]

॥ অজিত দত্ত ॥

অতি আধুনিকতায় একদিকে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট পশ্চিমী কাব্য সাহিত্যের ছাপ আবার অন্যদিকে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি লৌকিক উপাদান ও ঐতিহ্যের প্রভাবও অত্যন্ত বলিষ্ঠ। কবি অজিত দত্তের পাতাল কন্যার (১৯৩৮) নামকরণেই যে রূপ-কথায় অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যে যে আলোড়ন তুলেছিলো কাব্যের বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে যতই এগিয়ে গেছি ততই বিস্মিত হয়ে অনুভব করেছি কবির মনোজগতে— রূপকথার সেই ছেলেবেলাকার মায়াময় রাজ্যের প্রভাব কত গভীর। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে এক রাজকন্যার স্বপ্ন দেখে রাজপুত্র। কে এই রাজপুত্র? হয়ত কবিই সেই রাজপুত্র যার চেখে স্বপ্ন ভাসে এলায়িত চুল, কালো আঁখি সুদূরে উধাও, পাষানপুরী। মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে। কবি সেই পাশানবতীর স্বপ্ন দেখেন :

'যেখানে রূপালী ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
যে দেখে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,
কুচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা, কালো আঁখি সুদূরে উধাও,।'

তারপর কবি সেই রূপকথার দেশের স্বপ্ন আঁকেন রেখার পর রেখা চিত্র :

যে দেশে পাষাণ-পুরী মানুষের চোখের পাতাও
অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ইষৎ স্পন্দনে,
হীরার কুসুম ফলে যে—দেশের সোনার কাননে,
কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও।

সেই রাজ্যে আছে পালবতী, সে মায়ার পালাতে যেই জিনে লয় মানুষের প্রাণ,
মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে।

কবির এই রূপকথার চিত্র কল্পটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'পাতাল কন্যা' কবিতায়। রাজপুত্র শুনছে রূপকথা—পাতাল কন্যার কথা— সাপের নিঃশ্বাসে হিম-পাতালের অবশ প্রাসাদে কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে। সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন, তাকে কি ফেরানো যায়। কবি একটি সুন্দর চিত্রকল্প দিয়ে সেই অজানা অচেনা গভীর অতল তলের নীচে সেই রূপকথার পাতল পুরীর ছবি আঁকছেন ঃ

সাপের দেবাল ছাঁদ মণিকোঠা সাপের মণির,
লাল কালো ঝিক্ মিক্ সাপদের শীতল বিছানা,
চুনির মণির মত লাল চোখে কাল—নাগিনীর
বাতাস বিষাক্ত সেথা, মানুষের সেথা যেতে মানা।

আর সেই পাতাল কন্যার রূপ ঃ

কন্যার সোনার দেহে রাজার ময়ূর কণ্ঠী সাপ,
কন্যার বুকের পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলী,
সাপেরা মেলিয়া ফণা দূর করে গরলের তাপ,
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশলাখ ফণা ওঠে দুলি,

কবি সেই পাতাল কন্যার রূপকথার ছেলের অবস্থানও নির্ণয় করে বলেন ঃ—

গভীর সমুদ্র-তলে প্রবাল—দ্বীপের সীমা ছাড়ি,
তিমিরা যেখানে থাকে তারো নীচে সাপের দালান
সাত-ডিঙা মধুকর যে—দূরে সাগরে দেয় পাড়ি,
যেখানে সমুদ্র-তলে মরকত মণিকের থান,
তারো দূরে—তারো ঢের নিচে,
লক্ষ ফণা নিঃশ্বাসে দুলিছে
একেলা সোনার কন্যা সেই দেশে অঘোরে ঘুমায়
ঝিলমিল ফণার ছায়ায়।

তখন চেতনার কোন গোপনস্তরে ছেলেবেলার সেই পাতালকন্যার অনুভূতিটি লুকিয়ে ছিলো তা উপলব্ধি করতে দেরী হয়, আর সঙ্গে যখন বলা হয়—

কুমারের উদাসীন মন
সেখানে বেঁধেছে বাসা, তাহারে ভুলাবে কোন জন?

তখন এই 'কুমার'টি যে কবি সেটি বুঝতে দেরি হয় না পরীর রাজ্য (Fairy Land) যেমন মানুষের কাছে বিস্ময়ের বস্তু, লোককথাকারের কথাকাব্যের প্রধানতম বিষয় তেমনি আধুনিক কবির কাছেও। তাই কবি জিজ্ঞাসা করেছেন বারবার পরীতে বিশ্বাস কর?' পরে নিজেই উত্তর দিয়ে বলেছেন পরী আমাদের নিত্য সঙ্গী। কারণ ঃ

দেখেছ কি মানুষ যখন
আঁধারে একাকী চলে পিছনে সে নাহি চায় ফিরে ?
পদশব্দ শুনে কার পিছে পিছে ছায়ার মতন ?
জানো কে পিছনে চলে মানুষের সে ঘোর তিমিরে ?
পরীতে বিশ্বাস কর ? পরী যারা শীতল শিশিরে
সাঁঝ হ'লে মুখ ধোয় দিবসের ঘুম থেকে উঠে,
আকাশের সব তারা যে পরীরা নিয়ে যায় লুটে।

তারপর কবি 'পরীর' এক সুন্দর চিত্রকল্প (Image) তৈরী করেছেন বাস্তবের পৃথিবীর পটভূমিকায়।

এ ধরা গভীর বন, নিশাচরী এখানে বিহরে
অন্ধকারে পদধ্বনি নৃত্যে মত্ত সহস্র পরীর,
এ বনে পরীর মায়া মানুষের প্রাণ লয় হ'রে
অমার হওয়ার মত তাহাদের ছায়ার শরীর।

আবার সঙ্গে সঙ্গে ওই 'পাতাল কন্যা' কাব্যগ্রন্থেই ছড়া লেখার প্রচেষ্ঠা, ছড়ার-ছন্দ ও বিষয়বস্তুতে উদ্ভট রস।

বদ্যিনাথ ও পদ্য লেখে
আপন চোখে আর্সিচ দেখে
চোদ্দ খানা ডিক্‌সনারি
চলন্তিকা সঙ্গে তারি।

কিংবা---

সার্মনে থার্কে / তার উর্পরে
দুর্জর্ন ডি-লিট / মার্ইনে ক'রে।

পণ্ট চাঁদ কাব্যগ্রন্থের 'পলাতক' কবির চাঁদের রাজ্যে সন্তরণ। বাংলাদেশের লৌকিক ছড়ায় যেখানে শিশুর চাঁদের স্বপ্ন রাজ্য সেখানেও কবির সঞ্চরণ।

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ জ্বালিয়ে
গেল পালিয়ে।
গেল চাঁদ, গেল কোথা কন্দুর ?
পেরিয়ে সমুদ্দুর
পেরিয়ে আকাশ ভরা তারা—
পার হয়ে গেল চাঁদ চোখের পাহারা।
মনের খুকুকে চুপে ঘুম পাড়িয়ে।
গেল চাঁদ দেশ ছাড়িয়ে।

এরপর কবি তাঁর ভাবনাকে চাঁদের রহস্য সন্ধানে ব্যপৃত রেখেছেন শিশুর কপালে

চন্দ্রমোর টিপে লিখন এঁকে চাঁদ কি পশ্চিমের তুষার দেশে চলে গেল? তাই কবির আবার প্রশ্ন।

সেই শাদা দেশে বুঝি শাদা কপালে
চাঁদ মামা টিপ লাগিলে?
গেল চাঁদ। গেল পালিয়ে
আধার কপালে টিপ দীপ জ্বালিয়ে।

ছড়ার চাঁদের রাজ্য কবির চিত্তে এক নূতন ভাবনার সৃষ্টি করেছে। চাঁদ কবির কাছে আশা আকাঙ্খার প্রতীক, শিশুর কাছে চাঁদ স্বপ্নে প্রতীক। তাই মানুষ বড় হলেও মনের মধ্যে এক ছোট্ট শিশু কিন্তু ঘুমিয়ে থাকে যেখানে চাঁদ স্বপ্নের জগত থেকে আশা—আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে দাড়ায়ঃ

রাত আরো কতই বাকি?
মনের খুকুর ঘুম ভাঙ্‌বে নাকি?
কালো রাত কাটবে নাকি?

আধুনিক কবি ছড়া লিখেছেন, ছন্দ ও ভাষা একেবারে লৌকিক ছড়ার মত। বিষয়বস্তু ও লৌকিক মনে হলেও আসলে লৌকিক সহজিয়া ছড়া ভঙ্গীতে আধুনিক জন জীবনের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার দুর্বিষহ রূপটিকে। নাগরিক জীবনের জীবন—ধারণের বিড়ম্বনা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বিধৃত হয়েছেঃ

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে
ট্রামে না চড়ে
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস্‌ করেছে কি দৌড়ে?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আর ভোঁ-উড়ে?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা
তাড়া ক'রে বাড়ী থেকে বাড়িয়োনা পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস?
নইলে

রইলে
ভাত না খেয়ে
চাল ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা ?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

আসলে ছড়াটিতে শহরের যানবাহনের অপ্রার্যুতা রাস্তা চলায় দুর্ঘটনা, খাদ্যে ভেজাল ও বস্ত্রের দুর্মূল্যতা দেখানো হয়েছে লৌকিক ছড়ার ঢঙে।

আধুনিক কবিরা অনেকেই ছড়া লিখেছেন। কেন লিখেছেন সে কথা যদি আবিষ্কার করতে হয় তাহলে একথাই বলতে হয় যে প্রত্যেক কবি শিল্পী সাহিত্যিকেরই অন্তরের মধ্যে থাকে লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা। ছেলেবেলায় মায়ের কোলে শুয়েই প্রত্যেক কবি ছড়া শুনেছে। সেই ছন্দ তার মনে প্রথম নৃত্যের দোলা এনেছে আর ছড়ার বিক্ষিপ্ত চিত্রগুলির ছবি এঁকেছে। তাই পরবর্তীকালে কবি পরিণত মন ও লৌকিক ছড়ার প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। রচনা করেছে অসংখ্য সাহিত্যিক ছড়া। 'ছড়ার বই' (১৯৫০) গ্রন্থখানি উপরোক্ত প্রভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দু'একটি উদাহরণ দিলে এ কথার সপ্রমাণ হবে ঃ

১. ছড়ায় ছড়া কে
বনের গাছে ঢেউয়ের নাচে
পাখির আওয়াজে
বৃষ্টি ধারায় কে গেয়ে যায়
ঘুম-পাড়ানি ছড়া
মুখের হাসি মনের খুশি
কোন ছড়াতে গড়া।

কবি প্রকৃতির বুকে ছড়ার মালা দেখতে পেয়েছেন—

শিশির ঝরার হাল্কা ছড়া
মেঘের গুরু গুরু
গাছের পাতার ঝির ঝিরি আর
বুকের দুরু দুরু।

তাই কবি বলেন :

ভোর বিকেলে নানান সুরে
হরেক ছড়া শুনি,
টুকরো গুলি কুড়িয়ে এনে
ছড়ার মালা বুনি।

২ সোনালী মেঘটা যেন রাজ পুত্তুর
মেঘ—দৈত্যটা ওর মহা শত্তুর,
নীলাকাশে হানা দিতে মেঘ যদি আসে
তলোয়ারে কেটে দিয়ে রোদ্দুর হাসে।

ভৌতিক বিশ্বাস (ghost belief) বা প্রেত সম্পর্কিত ধারণাটি একটি লৌকিক সংস্কার মাত্র যার প্রভাব আধুনিক জীবনেও বর্তমান। আধুনিক চিন্তায় ও যে ভৌতিক অনুভূতি ও প্রেত বিশ্বাসের ফল কিরূপ তার প্রমাণ পাওয়া যায় আধুনিক কবিকেও 'প্রেত চরিত' কবিতা লিখতে হয়। যদিও এখানে 'প্রেত' মনিষাও প্রতিভার চিত্রকল্পে উপস্থিত হয়েছে :

পৃথিবীর অন্ধকার আনাচে কানাচে
হিজিবিজি চিন্তার বাঁকের কাছে কাছে,
প্রেতের মতন অশরীরী, অসহায়
মনীষা ও প্রতিভার ভুতুড়ে ছায়ারা মিলে
ভয়ংকর জটলা জমায়।
অসম্ভব কথা সব বলে তারা দুর্বোধ্য ভাষাতে
করে তারা কিচির মিচির,
কল্পনায় ভূতিনীরে চুলের মুঠোয় ধরে
নিয়ে এসে খেলাঘর পাতে
অন্ধকারে অন্তরালে অশরীরী মস্তিষ্কেরা করে মহা ভিড়।

রূপকথার উপমা আবার এসেছে 'জানালা' (১৯৫৯) কাব্যগ্রন্থের 'পাথর পুরী' কবিতায় :

কোন দূর রাজ্য থেকে এসে
রাক্ষসেরা হানা দিলো মানুষের দেশে।
সোনা-রূপো দুই কাঠি দিয়ে
সকল মানুষ তারা রেখে গেছে পাথর বানিয়ে।

রূপকথার প্রতীকে এসেছে বর্তমান জীবন যন্ত্রনার কথা :

এখনো হয়তো আছে মাঠে চাষী, ডিঙ্গিতে জেলেরা
তারা দেখে অস্ত্রে মোড়া পরিখায় ঘেরা
রাজধানী প্রাসাদের উঁচু চূড়াগুলি।

ভয়ে ভয়ে দূর থেকে বাড়ায়ে অঙ্গুলি
পরস্পর বলাবলি করে
জীবন্ত মানুষ ছিল একদিন ওখানে শহরে।
সেই যে রাক্ষস এসি কি মন্ত্র পড়েছে
রাজ-প্রজা সবই আছে, শুধু তারা কেউ নেই বেঁচে ॥

॥ বিষ্ণু দে ॥

আলেখ্য (১৯৫২-৫৮) কাব্যগ্রন্থে কবি এক সময় বলেছিলেন, 'কোথায় যাবে তুমি? যেখানে যাও সেই একই মাটি জল একই নীলাকাশ জন্মভূমি যেন', এই জল মাটি আর মানুষ নিয়েই জন্মভূমি। তাই যে যেখানেই থাকুক না কেন জন্মভূমির জল আর মাটির প্রভাবকে যেমন অতিক্রম করতে পারে না। তেমনি পারে না তার লৌকিক প্রভাবকে অস্বীকার করতে। কবি বিষ্ণু দে ইংরাজী সাহিত্যের কেবল ছাত্রই নন, পেশাও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা। কিন্তু কবিত্বের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন উন্নত ধরনের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে, ক্লাসিক্যাল গ্রীক, রোমান প্রতীক ব্যবহার করেছেন সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক রূপকথা ছড়া ইত্যাদির ছড়া অনুপস্থিত দেখা গেছে, বাংলাদেশের সোনার সুজলা সুফলা স্মৃতিতে কখনও তিনি অতীতাচারী ঃ

দু—চোখ ছায় বাংলা দেশের মাটি
নদী ও খাল খামার তেপান্তর
পৌষ মাসে বাঁধি সোনার আঁটি
অনেক পরব, দেশ যে উর্বর।

শিল্প সভ্যতায় কোন আহ্বানে কেন মরীয়া হয়ে পথ ভুলে সব কলকাতার পথে এসে সমাজ প্রাণ ইত্যাদি সব শিকেয় তুলে দিয়ে লোক সব কিসের ধান্ধায় ছুটেছে? কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ জীবনকে ভুলিয়ে দিচ্ছে কিসের আকর্ষণ।

নানান রীতি, নানা রকম রথে
ঘরের কাজে আপিস ঘরে কেউ;
রূপোর টানে সকাল সন্ধ্যায়
মজুতদারের চোরা বাজারে ঢেউ।

কিন্তু 'সাত ভাই চম্পাকে' কবি ভুলতে পারেন না। কবির স্মৃতি সেই স্বপ্নময় রূপকথার রাজ্যে সঞ্চরণে ব্যস্ত ঃ

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কতনা পারুল রাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার!

আর সেই রূপকথার প্রতীকে বাংলার জীবন যন্ত্রণার ছবি, প্রাণ চাঞ্চল্যের ইতিকথা রচনা করেন :

বিরাট বাংলাদেশের কতনা ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে—
চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলাদেশ
কতনা শাওন রজনী পোয়ালে বলো।

কেবল তাই-ই নয়, আরো প্রতীক এসেছে রূপকথার কড়ির পাহাড়, কাঞ্চনমালা ইত্যাদি। যথা :

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই,
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই,
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ—
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ।

অর্থাৎ সাত ভাই চম্পার প্রতীক হয়ে উঠেছে সুদূরের রহস্যময়তার ও অনির্দেশ্যতার এবং তারই আড়ালে বাংলাদেশের যুগ যন্ত্রণা ও জীবন যন্ত্রণার ছবি ফুটিয়েছেন কবি। 'মৌ ভোগ' কবিতায় কৃষকের জীবনের কথা বলেছেন কবি রূপকথার প্রতীকে, বাংলাদেশের লালকমল নীলকমলের কাহিনী কবির মনে রেখাপাত করেছে কৃষকের ব্যথা বেদনার কথায়।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরী হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্ত রাগে
—কার এসেছে কাল ?

তারই মধ্যে আবার চোরাকারবারী ও মজুতদারের ছবি এঁকেছেন লৌকিক বিশ্বাসের ইঙ্গিতে।

চোর-ডাকাতে মুখোশ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল, ঢাকে কালো কানায়
মরীয়া যত রাণীর গুনোতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক-পুজো নরবলিতে জানায়।

ওঁড়াও' গানেও ঐ একই আদিবাসী জীবনের কথা :

১ বাঁশ পাহাড়ে আগুন জ্বলে
মেঘে মেঘে ব্রজের হাঁক
মরদরা সব নিকারে যায়
মেঘে মেঘে বজ্রের হাঁক।

'বারমাস্যার' মাধ্যমে সুখ দুঃখের কাহিনী বিবৃত করা লোকসাহিত্য ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটি প্রচলিত রীতি। বিষয় বস্তুতে গতানুগতিক ভাবে বারমাসের প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়ে তারই পটভূমিকায় মানবজীবনের দুঃখময় সুখানুভূতির বর্ণনা। লোকসাহিত্যের মৈয়মন সিংহের গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা থেকে ফুল্লরার বারমাস্য সনকা ও বেহুলার বারমাস্যার মধ্য দিয়ে অত্যাধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় আধুনিক কবি বিষ্ণু দের 'অনিষ্ট' কবিতায় ঃ

শ্রাবণের মেঘে মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়
হেমন্ত হাওয়ায়, শীতের স্ফটিক দিনে হীরক সন্ধ্যায়
ফাল্গুনের চঞ্চল আবেগে
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে-লেগে।

বৈশাখে 'তাই সৌরকক্ষে শুধু অনির্বাণ আকাশ অন্দরে শ্রাবণে 'মেঘে মেঘে লেগে খেতে-খেতে ফেটে পড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে উতরোল দীঘির ছায়ায় বান ডাকা পাড়ে পাড়ে উদগ্রীব আকাশে' আর 'আশ্বিনের সন্ধ্যাকালে পাকা ধানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনময় নীলে সোনালী হৃদয়ে হালকা হাওয়ায় সহজ মেঘের গায়ে উন্মুক্ত উদার স্বচ্ছ শরৎ নিখিলে,' ভাদ্রে ঃ আকাশে ময়লা বর্ষা গোপন বর্ষা বাহারে একঘেয়ে, ভাদুরে ঘোলাটে এক ঘেয়ে দিন। কিংবা,

ভাসিয়ে শরৎ ঝর্ণা ধানে গানে কিশলয় কাশে
খেতের আষাঢ়-বন্যা সোনালী ফসলে
গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে স্বাধীনতা ঘরে ঘরে হাতে হাতে খামারের।

'সাঁওতাল কবিতায়' বিষয়বস্তুতে আদি সাঁওতালদের জীবন ও আঙ্গিকে সংক্ষিপ্ততর আদিবাসী গীতের লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে ঃ

(১) দুটি ছেলে
তারা লাঙল চালায় লাঙল
লাঙল চালায় তিন পাহাড়ের গায়।

(২) ঘাস কাটি ঘাস বড়ো পাহাড়ের পরে
প্রেয়সী ক্লান্ত কণ্ঠে তৃষ্ণা ভরে
প্রেয়সী আমাকে নিয়ে চলো ফাটে গলা
তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঝর্ণা তলায়।

(৩) হে প্রিয় আমার
পাহাড়ে বাজাও বাঁশি
ঝর্ণার ধারে শুনবো বলে তা আসি,

কলসী ফেললে লোকে বলে হলো কি ও,
যদি না-ই আসি, বকাবকি করে প্রিয়।

কিংবা 'ছত্তিশ গাড়ী গান'-এ আদিবাসী ছত্তিশ গাড়ীদের প্রেম ও জীবনের কথা ঃ

১. কি করে ভাঙলে
সোনার কলসিখানি
বলো তো কোথায়
হারালে তোমার জ্বলজ্বলে যৌবন ?

২. যেন বা বাতাসে
পিয়াল গাছের শাখা
ও তনু শরীর
আমার বাতাসে দোলে।

৩. পূবে মেঘ জমে
দক্ষিণে বারি ঝরে
তোমার সদ্য যৌবন ও গো প্রিয়া
অগ্নি বৃষ্টি করে।

এই 'অনিষ্ট' কবিতাতেই আধুনিক জীবন যন্ত্রণার ছবিকে কবি প্রস্ফুটিত করতে গিয়ে রূপকথার সুয়োরাণী রাক্ষসী, দুয়োরাণী বন্দিনী রাজকন্যা। ইত্যাদি ইমেজগুলি ব্যবহার করেছেন। রূপকথার সুয়োরাণী যেমন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে দুয়োরাণীকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেছিলো, পরে দুয়োরাণীর অমর ছেলে কিশোর রাজকুমার অনেক কষ্টের পর বন্দিনী রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গিয়ে, উদ্ধার করে মা দুয়োরাণীকে যন্ত্রণাময় বঞ্চিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। তাই কবির ভাষায়—

দুয়োরাণী সেজে রাক্ষসী জাল বোনে
তবু দুয়োরাণী পেয়েছে অমর ছেলে
তরুণ-কিশোর বনে যায় অবহেলে
আরেক রাজার কন্যা যে দিন গোনে।

অথবা ঃ বন্দিনী রাজকন্যা যে দিন গোণে
মহলে মহলে ঘুরে ফিরে করে গান
কখনও অশ্রু মোছে বা ঘরের কোণে
স্বপ্নে কখনও ভাঙে বর্তমান।

আধুনিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'গাজনের গান'-এ বলেছেন,

মেঘে মেঘে ঢ্যাম কুড় কুড়
বাজনা বাজে গাজনের

বাবুই তোমার বাসা উড়ুক
নূতন দিনের বাতাসে।

গাজনের বাজনা কবির কাছে আগামী দিনের নবসম্ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। কিংবা 'এক যে ছিল' কবিতায় অতীতের রূপকথার রূপকে বর্তমান শাসন ব্যবস্থার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করেছেন।

এক যে ছিল রাজা
রাজত্বটা মস্ত
উঠতে বললে উঠত লোকে
বসতে বললে বসত।

কিংবা— একদিন সেই রাজার
রাজ্য গেল উল্টে
শূলে চড়ার আগেই রাজা
গেলেন পটল তুলতে।

'আট কবিতার দেশ' কবিতায় রূপকথার আমেজ ও গল্প বলার ভঙ্গীটি লক্ষণীয়—

কাল্না ফুল তুলতে গিয়ে ডালনা খেলো মাসি
চৈত্র মাসের গাজনা বাজে ঢোলটা হ'ল বাসি।
ঝি শত্তুর মা শত্তুর আর শত্তুর কারা
বাট্না বাটে নন্দা বুড়ী বড় যে কেঁদে সারা।
ঝামর ঝুমুর রূপোর নূপুর রাত জাগিয়ে যায়
জানলা খুলে ঘোমটা তুলে সাত বৌরা চায়
আগ ডিঙ্গোলো বাগ ডিঙ্গোলো ডিঙ্গোলো পরীর দেশ,
যেতে যেতে পেলো রাণী আট কবিতার দেশ।

কিংবা— 'একা' কবিতাটিতে ঃ

কেউ কি আছে, দিতে পারে
পুপের সঙ্গে টেক্কা ?
বাঘা বলে ঘেউ ঘেউ—
ঠিক বলেছে, নেই কেউ
সেদিক থেকে একেক বারে
আমার মেয়ে একা।

বাণী রায়ের 'রাজপুত্র' কবিতায় রূপকথার রাজপুত্রের চিত্রকল্প রূপ পেয়েছে ঃ

রাজপুত্র। রাজপুত্র। পক্ষীরাজ তব
গেছে চলি বহুদিন তেপান্তর ধরি,

সুদূরে আকাশ প্রান্তে দিক্ চক্রবাল
অশ্বারোহী মিলায়েছে কৃষ্ণ বিন্দু যেন।

অথবা— নহি আমি রাজকন্যা
তবু আনিমিখ
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি দিগন্তের সীমা
ধূল ওঠে ঝড় হয়ে, শুষ্ক পত্র খসে
ধূসরে মিলায়ে যায় সুদূর নীলিমা
ওঠেনা অশ্বের ধূলি শুধু চক্র বালে
রাজপুত্র এ নয়ন ঢাকে বাষন জালে।

॥ রঙ্গ ॥ **প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ**

১. এ-তো বড় রঙ্গ যাদু
এ তো বড় রঙ্গ
নিজেই আগুন জেবলে
আবার
নিজেই হই পতঙ্গ
উপর তলায় আসর মেলা
চলছে সতরঞ্চ খেলা
ঘুঁটি কিন্তু নীচের তলায়
যা নড়ে তার ব্যঙ্গ!

এ বড় আফশোষ যাদু
এ বড় আফশোষ
এ মন জমি চষি
ফসল আগাছায় আপোষ
বিনা ফাঁদেই ধরি পাখি
শিকল দিয়ে বেঁধে রাখি,
শিকল কেটে যায় না উড়ে
মানেও নাকো পোষ!

এ তো বড় ধন্দ যাদু
এ তো বড় ধন্দ
তরী হওয়া

শিকড় গাঁথা তরারই নির্বন্ধ
নাও ভাসিয়ে তুলে দি পাল
ঘাট খুঁজলেই যত বেচাল
হাল ছাড়লেই পালে লাগে
বাতাস মৃদু মন্দ !

এ বড় আশ্চর্য যাদু
এ বড় আশ্চর্য
সিঁধ না কেটে নিজের ঘরের
মেলেনা তাৎপর্য
প্রাণের এমন তে জারতি
না হাতালেই অধোগতি
শোধ লাগেনা সুদ পড়ে না
করো যতই কর্জ !

॥ সাত ॥

আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় লোকায়ত অনুষঙ্গ

অতি আধুনিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একজন বাঙালী আধুনিক কবি বলেছিলেন, নিজের দেশের কবিতার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ভিতরস্থিত হয়েও আজকের মুখ্য কবি পৃথিবীর, বিশেষত পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ কাব্য উপলব্ধি করতে পেরে বাংলা কবিতাকে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড় করাতে পেরেছেন যে তার ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রশ্ন বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল কাব্য, পূর্ববঙ্গের গীতিকা বা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সত্যের ভেতরেই শুধু আটকে নেই—কিন্তু যেখানেই মানুষ তার স্বতন্ত্র আধুনিক চেতনাকে মহান কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছে, সে সবের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ আধুনিক কবি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে নিজের দেশের কবিতার সঙ্গে প্রথম প্রধান যোগ দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং তাই বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, পূর্ববঙ্গ গীতিকা মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেও আজকের আধুনিক কাব্য পশ্চিমী কবিতার সঙ্গে যোগসূত্র সৃষ্টি করেছে। তাই অতি-আধুনিক বাংলাকাব্য ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এসেও সে তার লোকায়ত যোগসূত্রটি হারিয়ে ফেলেনি—তার প্রমাণ আছে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের বাংলা কাব্যে ও অত্যাধুনিক বাংলা কবিতায়।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের দুটি ভাগ ঃ— (১) রবীন্দ্র ভাবানুসারী কবিবৃন্দ। (২) রবীন্দ্র প্রভাবযুক্ত স্বতন্ত্র কল্পনা বিশিষ্ট কবি মন্ডলী।

অতি আধুনিক বাংলা কাব্যে কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, সত্যেন্দ্রনাথ ও কালিদাস রায়—রবীন্দ্র ভাবানুসারী কবির দল। এদের মধ্যে গ্রামীণ জীবন চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট বলে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত লৌকিক উপাদান এদের কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন কুমুদরঞ্জন ও করুণানিধানের কবিতার বিষয়বস্তুতে আর সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য আঙ্গিকে, যতীন্দ্র বাগচীর কাব্য বিষয়ের ব্যঞ্জনায় লৌকিক উপাদানের সন্ধান মেলে।

রবীন্দ্র প্রভাবযুক্ত স্বতন্ত্র কল্পনাবিশিষ্ট কবি গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে নজরুলের কোন কোন কবিতায় গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির বর্ণনায় লোকায়ত উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে ; যেমন 'চৈতী হাওয়া' কবিতায় 'থলকলমী আউরে যেত তপ্ত ও গাল ছুঁই ! বকুল শাখা ব্যাকুল হ'ত টলমলাত ভুঁই।' কিংবা 'পিয়াল বনের পলাশ ফুলের গেলাসভরা মউ, খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ।' 'অঘ্রাণের সওগত' কবিতায় 'হল্লা করিছে ফিরছে পাড়ার দস্যি ছেলের দল, / ময়না মতীর শাড়ি পরা মেয়ে গয়নাতে ঝলমল ! / নতুন পৈঁচি বাজুবন্ধ পরে / চাষা বউ কথা কয়না গুমরে, / জারি গান আর গাজীর গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল। / বৌ করে পিঠা 'পুর'—দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল।' লোকায়ত প্রকৃতির থলকমলী থেকে শুরু করে বকুলের শাখা, সাঁওতালিয়া

বউ, ময়নামতীর শাড়ী, জারী গান, গাজীর গান, মিঠাপুর দেওয়া পুলি পিঠে—লোক সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানে ভরপুর। সুতরাং এভাবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগের অনেক কবির কাব্য ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে লোকায়ত সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটা।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে একেবারে আধুনিক কবিতার আসরে এলে জীবনানন্দ থেকে শুরু করে সুধীন দত্তের মধ্য দিয়ে যদি বাংলা কবিতার বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে এর মধ্যেও ছড়িয়ে আছে অজস্র লৌকিক উপাদান। ইংরাজী ভাবনা সম্পৃক্ত ইউরোপীয় কাব্যকলার অতি আধুনিকতার প্রভাবযুক্ত এইসব কবিরা দেশীয় ঐতিহ্যকে লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাকে অস্বীকার করতে তো পারেন নি, উপরন্তু তাঁদের কাব্য দেহের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে লোক সংস্কৃতির নানা উপাদান।

॥ জাদুবিদ্যা— ডাকিনী বিশ্বাস—লোকসংস্কার ॥

পৃথিবীর লোকায়ত জীবনধারার সঙ্গে জাদুবিদ্যা, লোকবিশ্বাস, ও লোক-সংস্কারের প্রবাহ অনাদিকাল থেকেই চলছে। 'ডিক্সনারী অব ফোকলোর এ্যাণ্ড মিথিওলজি' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে জাদুবিদ্যা হচ্ছে প্রধানতঃ অতীন্দ্রিয়কে বশ করার বিদ্যে এবং সেই সঙ্গে অতীন্দ্রিয় উপায়ে প্রকৃতিকে বশ করার শাস্ত্র। আসলে ইংরাজী 'Magic' শব্দটি ফার্সী 'Magi' শব্দ থেকে এসেছে। ম্যাজিরা ছিলেন পুরোহিত শ্রেণীর মানুষ এবং এঁরা যেসব ক্রিয়াকর্ম পালন করতেন গ্রীকরাই তাকেই ম্যাজিক বলেই অভিহিত করতো। বাংলায় এই ম্যাজিকেয় প্রতিশব্দ হিসাবে জাদু বিদ্যার চলতি আছে। যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত ঘটে স্যার জেমস্ জর্জ ফ্রেজার ও স্যার ই. বি. টাইলারের হাতে। এঁদের মতামত কতটা বৈজ্ঞানিক, তা পরে বিবেচনা করা যাবে। আপাততঃ এ প্রসঙ্গে ফ্রেজারের বক্তব্য অনুধাবন করা যেতে পারে। মানুষের যে চিন্তাধারার ওপর জাদুবিদ্যা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে বিশ্লেষণ করলে, ফ্রেজারের মতে---দুটি নীতি-নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) সদৃশ ঘটনা সদৃশ ফলাফলের সৃষ্টি করে, অথবা ফলাফল সর্বদা কারণের অনুরূপ হয়।

(খ) যে সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, সেই ব্যক্তি বা বস্তু পরস্পরের সঙ্গে শারীরিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে গেলেও উভয়ে উভয়ের ওপর ক্রিয়াশীল থাকে। ফ্রেজার এই নীতি নিয়মের প্রথমটিকে জাদুবিদ্যার সদৃশ বিধান (Law of Similarity) ও দ্বিতীয়টিকে জাদুবিদ্যার সংক্রামক বিধান (Law of Contact or Contagion) নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন যে সমস্ত তাবিজ (মাদুলি এবং কবচ) জাদুবিদ্যার সদৃশ বিধান অনুযায়ী তৈরী হয়, তাকে সদৃশ বিধানের তাবিজ (Homiopathie of Imitative Magic) এবং অন্যদিকে যেগুলো সংক্রামক বিধানকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়---সেগুলোকে সংক্রামক বিধানের তাবিজ (Contagious Magic) বলা যায়। ফ্রেজার জাদুবিদ্যাকে 'প্রাকৃতিক

বিধান' (Natural Law) বলেও মনে করেন। কারণস্বরূপ তিনি যুক্তি দেখান যে জাদুবিদ্যার অধিকারী (আমাদের দেশের ভাষায় গুণিন, গুণী, গুণীজ্ঞানী, ফকির) মাত্রই বিশ্বাস করে যে জাদুবিদ্যার সদৃশ ও সংক্রামক বিধানদ্বয় ব্যক্তি ও বস্তু নির্বি-শেষে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমানভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং জাদুবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিধান ধরে নিয়ে ফ্রেজার জাদুবিদ্যাকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমটিকে তিনি তত্ত্বগত জাদুবিদ্যা (Theoretical Magic) বলেছেন। কারণ 'প্রাকৃতি বিধান' অনুযায়ী বিশ্ব চরাচরের সমস্ত ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব—এই লোকবিশ্বাস আন্তর্জাতিক। কিন্তু বিশ্বাসকে যে মুহূর্তে কার্যোদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়, তখন সৃষ্টি হয় ফলিত জাদুবিদ্যা (Practical Magic)।

সাহিত্যে, বিশেষ করে লিখিত সাহিত্যে, লোকায়ত জাদুবিদ্যার বিষয়গুলি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ডাকিনী বিদ্যা বা Witch craft পৃথিবী ব্যাপী নাটক ও কথা-সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রিয় উপাদান। জাদুবিদ্যার বিভিন্ন অনুসঙ্গ ইন্দ্রজাল, মায়াদণ্ড, মায়াবিনী, মৃতের অস্থি-খুলি, প্রেত-পুরী, ডাকিনীর রুক্ষ অট্টহাসি, কঙ্কাল, ডাকিনী, ক্ষুধি প্রেত প্রভৃতি। জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্যে অতি আধুনিকতার অগ্রগামী হলেও পাশ্চাত্য প্রভাবে পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যে অনুবর্তন ঘটালেও আসলে লোকায়ত জীবন চর্যার বাতাবরণকে কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেননি : বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্য প্রকরণে প্রতীক, চিত্রকল্প ইত্যাদি ব্যবহারে বারবার জাদুবিদ্যা ও জাদু বিশ্বাসের অনুষঙ্গ গুলিকে টেনে এনেছেন। যেমন 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থের নীলিমা কবিতায় রূপকথার ইমেজ জাদুবিশ্বাস ব্যাপারটি খুব সহজেই এসে গেছে তাঁর অন্য কবিতা 'নবনবীনের লাগি'-তে চারিদিক ঘিরে শীতের কুহেলি, শ্মশান পথের ছাই, / ছড়ায়ে রয়েছে পাহাড় প্রমাণ মৃতের অস্থি খুলি, / কে সাজালে ঘর দেউলের পর কঙ্কাল তুলি তুলি. / । এছাড়াও 'কিশোরের প্রতি' কবিতায় আছে—রুধির নিঙাড়ি তব আজো দেবী মাগে নাই রক্তিম চন্দন। কিম্বা, জাগে সেই মৃত্যু প্রেত পুর. ডাকিনীর রুক্ষ অট্টহাসি সভ্যতার বীভৎস ভৈরবী /। আরও একটি 'জীবন-মরণ' কবিতায় আছে—নেচেছে তাহারা, মায়াবীর যাদুজালে । অন্য আর একটি কবিতা 'নাবিক'-এর মধ্যে হিমকৃষ্ণ অঙ্গুলির কঙ্কাল পরশ। অন্য আর একটি কবিতা 'বনের চাতক'-এ আছে – কোন ডাকিনীর বুকের চিতায়/। 'মনের চাতক' কবিতায়—আকাশ টাটে আয়রে ফিরে দামোয় পাওয়া আয়রে তাড়াতাড়ি ।— আসলে কবিমন যখন কোন রহস্যের সন্ধানে কিম্বা অলৌকিকতার মোহ আবেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হতে চায় সেখানে জাদু বা ম্যাজিকের অনুষঙ্গগুলি স্বাভাবিক প্রবণতার পথেই কবির লেখনীতে এসে যায়, কারণ কোন মানুষই লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেকে স্বতন্ত্র বা আলাদা করে রাখতে পারে না। তাই যখন কোন জাদুবিশ্বাস অলৌকিকতার পরিবেশ সৃজনে কবির মানসিকতায় পরিস্ফুট হতে চেষ্টা করে তখন বাঙ্গালী লোকায়ত লোকচারণিক জাদুক্রিয়ার ব্যাপার-গুলি, আচার আনুষ্ঠানিকতার বৈশিষ্ট্য চিহ্নগুলি স্বাভাবিক পথেই এসে যায়। তাই মায়াদণ্ডে ইন্দ্রজালের রহস্য দূরীভূত হয়ে জাদুপুরের অলৌকিক রহস্যের বাতাবরণ

উন্মুক্ত হতে থাকে। শ্মশানের ডমরু ধ্বনিতে মৃত্যুপূর্ণ প্রেতপুরীর ডাকিনীরা যে রুক্ষ অট্টহাস্যে মেতে ওঠে সেখানে কবি সভ্যতার বীভৎস রস-এর সঙ্গে মিল খুঁজে পান। তাই নাবিক খুঁজে পায় হিমরুক্ষ অঙ্গুলিত কঙ্কালের স্পর্শ।

জীবনানন্দের কাব্যদেহের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে লোকায়ত সংস্কৃতির অজস্র সম্পদ। সেখানে জাদু বিশ্বাস অলৌকিকতার অনুষঙ্গগুলি বারবার নিজেদের অস্তিত্বকে ছড়িয়ে রেখেছে কাব্য দেহের সর্বত্র। কবির 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থের যে অনুষঙ্গগুলি আকর্ষণ করে 'নীলিমা' কবিতায় তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছে মায়াবী কোন দূরে যাদুপুর রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি /। 'কিশোরের প্রতি' কবিতায় আছে 'রুধির নিঙাড়ি তব আজো দেবী মাগে নাই রক্তিম চন্দন /। জাগে সেই মৃত্যু, প্রেত পুর, ডাকিনীর রুক্ষ অট্টহাসি / সভ্যতার বীভৎস ভৈরবী /। 'নাবিক' কবিতায় হিমবৃক্ষ অঙ্গুলির কঙ্কাল পরশ।' 'বনের চাতক' কবিতায় 'কোন ডাকিনীর বুকের চিতায় পশ্চিম আকাশে।' 'সাধের বলাকা' কবিতায় 'রে মুসাফের, পাতাল প্রেত পুরের মরীচিকা ডাইনে তোমার ডাইনী মায়া, পিছে আকাশ যিকা /' 'চলছি উধাও' কবিতায় 'প্রেতের মত আসছে ভেসে ত্রিশূল মূলে, — দেউল দ্বারে কাটিয়েছে সে দুরন্তকালে ব্যর্থ-পূজার পুষ্প ঢেলে হালভাঙগা এই ভূতের জাহাজটারে /'। 'মোরে রাজার দুলাল' কবিতায় ' ক্ষুধিত প্রেতের মত চুষিয়াছি আমি, বাঁধিয়াছি দেউলিয়া বাউলের ঘর, শুনিয়াছি একাকিনী কুহকীর সুর কঙ্কালের কাঁকলের চুমা /'। 'মরু বালু' কবিতায় 'হাড়ের মালা গলায় গেঁথে — অট্টহাসি হেসে তোদের জ্বলছে যমের চিতায় গেলাস চুমি মড়ার কপাল ভৈরবেরি গলে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হাপর খিঁচে খিঁচে /'। এখানে 'হাড়ের মালা' অর্থানুভূতিতে জাদুবিদ্যার সঞ্চার রস সৃষ্টি হয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবি হিসাবে ক্ল্যাসিক্যাল জীবন চেতনার কবি হলেও লোকায়ত জীবন চর্যার বৃত্ত থেকে কখনই বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাই লোকায়ত চেতনার অনুষঙ্গগুলি তাঁর কাব্যে বারবার এসেছে কখনও জাদুবিদ্যার আচার ক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসাবে, কখনও বা লোকবিশ্বাসের গভীর গহন অন্ধকার পথ ধরে। তাই তিনি 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থে যখন বলেন 'আসফালি উদ্ধত অসি, নির্জিতের মুণ্ডমালা গলে' কিম্বা 'পুনর্জন্ম' কবিতায় কবি যখন বলেন — 'গৌরী কাপালিকা দাঁড়াল সম্মুখে আসি, নরমেধ প্রলয়ের শিখা', 'মহাসত্য' কবিতায় — 'বন্ধ দ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ', 'বিস্মরণী' কবিতায় 'বলেছি পিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা'; কিম্বা 'অর্কেস্টা' কবিতায় কবি যখন বলেন …

বুঝি উদ্ঘাট দ্বার নরকের যত
তৃষিত পিশাচ মড়কের তারা
মেতেছে গাজনের চড়কের সাড়া
বিশ্বের স্থিতি টুটেছে ওই
রসাতলে যায় ত্রিভুবন আজ
প্রলয়েন জেগে উঠেছে—

তখন বোঝা যায়—কবি যে চেতনার জগৎ থেকে উপাদানগুলি সংগ্রহ করে এনেছেন স্মৃতির অতল থেকে, তা হচ্ছে তার নিজস্ব মূলের ক্ষেত্র থেকে অর্থাৎ বাংলার লোকসংস্কৃতির জগৎ থেকে। সেখানে তিনি উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন নরকের দ্বার, যেখানে তৃষিত পিশাচ মড়কের মহোৎসবে গাজনের চড়কে, লোকপর্বের অনুষঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জাদুবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পিশাচের ভূমিকা আছে যেখানে আদিম অন্ধকারে সে ঘুরে বেড়ায় মানুষের অকল্যাণের মূর্ত প্রতীক হিসাবে। 'বিস্মরণী' কবিতায় তিনি রূপকে পিশাচকে এনেছেন। বলেছেন 'পিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা'। 'সর্বনাশ' কবিতায় বৈধব্যকে প্রেতাত্ম শ্মশানের রূপকে এনেছেন। বলেছেন—'তোমার সাহস কাড়ে বৈধব্যের প্রেতাত্ম শ্মশান'। আলোকে এনেছেন প্রেতের রূপকে ঐ একই কবিতায়। বলেছেন 'গতায় আলোর প্রেম বিচরিছে স্তবকে স্তবকে'। 'সংবর্ত' কাব্যে 'কাণ্ডে' কবিতায় বিপ্রলব্ধ প্রেতের আর্তনাদ। 'সংবর্ত' কবিতায় সেই প্রেতের ইমেজ ঘুরে এসেছে 'প্রেতাত' অভাবে—রক্ষিত মঙ্গলদীপ'। 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থে ঐ প্রেত অলৌকিকতার রূপকটি এসেছে নূতন রূপে—

'মৃগ তৃষ্ণিকার প্রেত অলৌকিক মরীচিকারূপে
স্বর্গান্বেষী সোপানের ধ্বংসধূলি স্তূপে'।

—কিম্বা 'মৃত্যু' কবিতায়—'প্রেতগণ জটলা পাকায় হেথা বৈতরণী তীরে / জন্মান্তরের খেয়াঘাটে ভিড়ে / পরপারে কপি সেনা করে সেতু বন্ধের সূচনা'। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যে 'গ্রহতারা' কবিতায় প্রেতের এবং কবন্ধের অনুষঙ্গ এসেছে—'প্রেতস্ফীত শোকাতুর কবন্ধ মেঘের স্তূপে'। 'সন্দ্বীপের চর' কাব্যে 'হাসনাবাদী' কবিতায় রাক্ষসীর মায়া এসেছে জাদুবিশ্বাসের রূপক হিসাবে—'রাক্ষসী মায়া হানে, ঘুমে জাগে সব।' আর একটি কবিতায় 'কত রাক্ষসী মায়া না ছড়ায় বন'।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্য 'বন্দীর বন্দনা'-য় জাদু সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সেখানেও প্রেত, অদেহী প্রেত, অতৃপ্ত আত্মা, কায়াহীনতা ইত্যাদি জাদু ও প্রেত বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলি কবি চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়েছে। 'অপর্ণার শত্রু' কবিতায়।

'অদেহী প্রেতের মতো আসিয়া ··
বসিব তব পাশে,
হৃদয়ের রক্ত তব ক্ষণে ক্ষণে
করিব শোষণ কায়াহীন বুভুক্ষু
অধরে / অতৃপ্ত আত্মার মতো অজানিত
অন্ধকার হতে / শত শত অমঙ্গল
বীজ বহি আনি সঞ্চারিয়া দিবো
তব বসন্ত ভুবনে / ফুল তব ভস্ম হবে,
শীর্ণ হবে শস্যের সম্ভারী তোমার
আন-দস্যুরা বিষ হয়ে যাবে মোর তিক্ত

অমিষাতে / তিলে তিলে আমি তব
মৃত্যু হবো।

'নতুন খাতা' কাব্যগ্রন্থে 'বিচ্ছেদের দিন' কবিতায় 'অলৌকিক বিশ্বাসে'র প্রভাব দেখা যায়—

'তোমার চুল পিঠ বেয়ে পড়েছে
ডাইনির চুলের মতো আর
চাপা গলায় তুমি গান করছো,
ভাঙ্গা গলায়, ডাইনির গানের মতো'।

আবার অলৌকিক বিশ্বাস এসেছে 'তবু কোকিল ডাকে' কবিতার পংক্তিতে—'পৃথিবীর পিশাচ শক্তির নিষ্ঠুরতায় দ্বিখণ্ডিত'। আবার 'জন্ম' কবিতায় জাদু অনুষঙ্গের প্রয়োগ দেখা যায়—

"তোমরা দূরে থাকো, দৈত্য অপদেবতা
জিন, প্রেত, আর প্রেতের মতো
দুঃস্বপ্ন, আর ঠাণ্ডা অন্ধ ভয় /
পিশাচের মতো নিষ্ঠুর"!

আবার 'অন্বেষণ' কবিতায় এই জাদু অনুষঙ্গ যেন শিহরণ তুলছে "প্রেতের মতো আমি ঘুরে বেড়াই, প্রেতে পাওয়া এই বাড়ি বোবা হয়ে আছে"।

মনীন্দ্র রায় অপেক্ষাকৃত সমসাময়িক কালের কবি হলেও তাঁর কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় ডাইনী মায়া ডাকিনী মায়া, ভুতুড়ে ছায়া, কবন্ধ, ডইনীর মারণ, পিশাচ সিদ্ধের মারণ ইত্যাদি জাদু বিশ্বাস ও অলৌকিকতার অনুষঙ্গগুলি বারবার কাব্যদেহের সর্বত্র অনুরণিত হয়েছে চিত্রকল্পে, উপমা, রূপকে, ভাষা ব্যবহারে এবং কবিতার ভাব সৃষ্টির গভীরতায়। 'মোহিনী আড়াল' কাব্যগ্রন্থে ডাকিনীতন্ত্রের অনুষঙ্গ এসেছে—

"এড়াতে ডাকিনী মায়া সাধো যদি,
তুমি / পরিণামে তুমিই পাথর"

—আবার 'মোহিনী আড়াল' কবিতাটিতে জাদু অনুষঙ্গ এসেছে এই পংক্তিটিতে—

"ভুতুড়ে পাণ্ডুর ছায়া কবন্ধের
মতো খেলা করে"--

আর একটি উল্লেখযোগ্য পংক্তি --

পাতাল থেকে উঠে আসা শত শত
ডাইনির মারণ-ফুৎকার উপেক্ষা করে

কবির 'ভিয়েতনাম' কাব্যগ্রন্থে দেখি জাদু প্রসঙ্গে এসেছে—

"যেন দূর মধ্যযুগে অন্ধকার গুহার
ভিতর / বিকৃত পিশাচ সিদ্ধ মারণের
গবেষণাগার / প্রতিদিন ক্রূরতর
খোঁজি উপাচার।"

—প্রসঙ্গক্রমে ঐ কবিতায় এসেছে জাদু বর্ণনা :

"মানুষের শরীরের শেষ সহনতা /
কতোদূরে মেশে তার পিশাচ উল্লাস"।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মার্ক্সীয় ভাবনা-চিন্তার কবি হলেও জাদুবিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসাবে প্রেতাত্মা, প্রেত ইত্যাদি উপমাগুলি বহু জায়গায় ব্যবহার করেছেন। 'বোধন' কবিতায় তিনি মারণ মন্ত্রের কথা বলেছেন—'মারণ মন্ত্র বলে শোন তা কি'। অথবা 'পরিশিষ্ট' কবিতায় বার্ধক্যের প্রতীক হিসাবে প্রেতাত্মার চিত্র কল্পটি তাঁর কাছে বেশী গ্রহনীয় বলে মনে হয়েছে 'প্রেতাত্মার প্রতিবিম্ব বার্ধক্যের প্রকম্পনে লীন'।

অমিয় চক্রবর্তীর 'যুদ্ধের খবর' কবিতায় নরবলির প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক চাতুর্যের রূপকল্প হিসাবে—'নয় রক্ত পূজো কালীর অথবা কলির / বিবিধ আধুনিক চাতুরী নরবলির'। অজিত দত্তের কবিতায় জাদু মন্ত্রের উল্লেখ দেখি—'অকস্মাৎ জাদু মন্ত্রে সে-র্মিছিল স্তব্ধ করি দিয়া'। পশ্চাতের আমি ও গণ্ডী কবিতায় প্রেত ও প্রেতমন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। কবির কথায় 'পশ্চাতে যা জীবন মৃত, সম্মুখে সে আসে প্রেত প্রায়' কিম্বা 'প্রেতমন্ত্রে বেঁচে হয় বিক্রমের স্কন্দে গুরুভার'। 'প্রেত চরিত' কবিতায় প্রেত শরীর ভুতুড়ে ছায়া অশরীরি ইত্যাদির ইমেজ এসেছে বারবার—'প্রেতের মতন শরীর', 'ভুতুড়ে ছায়ারা মিলে ভয়ংকর জটলা জমায়', 'ভুতিনীরে চুলের মুঠোয় ধরে নিয়ে এসে খেলাঘর পাতে অন্ধকারে অন্তরালে অশরীরি মস্তিষ্কেরা করে মহাভীড়, 'হাজার কি নয় বছরের ইতিহাস ধরে এরা—অলৌকিক, অবাঞ্ছিত, অনিকেত, এ-সব প্রেতেরা চেপে আছে সিন্ধাবাদ—পৃথিবীর ঘাড়ে', আবার কবি প্রেত বিশ্বাসের জাদু-পরিবেশ থেকে জাদুমন্ত্রের জগতে চলে এসেছেন প্রেমের কবিতায়। সেখানে পরীরা যে জাদু জানে সেই বিশ্বাসে লেখক তাঁর প্রেয়সীকে পরীর জাদুমন্ত্র বলে সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। সেখানে কবি পরীর সূত্রে জাদুমন্ত্রের কথাই এনেছেন—

তবে সেই পরীর মতন জাদুমন্ত্রে
আমি তোমাকে পৃথিবীর সমস্ত
ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে দেব।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নীল নির্জন' কাব্যগ্রন্থে 'কাঁচা রোদ্দুর ছায়া অরণ্য' কবিতায় তাজা রক্ত শয়তানের অব্যর্থ প্রয়াসের মাঝখানে প্রশ্ন করেছেন ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে? 'তৈমুর' কবিতায় ভৌতিক স্তব্ধতা দেখেছেন 'শূন্য মসজিদে গম্বুজে খিলানে'। 'শিয়রে মৃত্যুর হাত' কবিতায় আড়াল আবছা সারাক্ষণ দণ্ডায়মান মূর্তির নিষ্পলক চোখে নিরুচ্চার মায়ামন্ত্রে দ্যোতনা প্রত্যক্ষ করেছেন। সমগ্র কবিতাটির মধ্যে একটি অসাধারণ লোকায়ত ছায়াময় রহস্য কুহেলিকারা জাদুমন্ত্রে মায়াবীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

"আড়ালে আবছায়া মূর্তি সারাক্ষণ
যে আছে দাঁড়ায়ে, নিষ্পলক চোখ
তার। নিরুচ্চার মায়াদণ্ডে
বাঁধা ক্লান্তির করুণ জ্যোৎস্না

নেমেছে শয্যার পাশ দিয়ে শিয়রে
মৃত্যুর হাত।"

অতি আধুনিক যুগের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থেও এই জাদু বিশ্বাসের অলৌকিক পরিবেশটি তৈরী হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কখনও তা অশরীরীরূপে এসেছে, কখনও বা তা প্রেতিনীর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। 'আমার স্বপ্ন' কাব্যগ্রন্থের 'দেরি' কবিতায় কবি শুনতে পেয়েছেন অশরীর অট্টহাস্য—,

শুনতে পাই অনেক অশরীর
অট্টহাস্য যাদের জন্য একদা
সোনার রথ নেমে এসেছিল।'

'চন্দন কাঠের বোতাম' কবিতায় জ্যোৎস্না আলোয় গন্ধরাজ ফুলগাছের পাশে বোবা কালা প্রেত দেখেছিলেন কবি—

'যেমন জ্যোৎস্নার মধ্যে গন্ধরাজ
ফুল গাছের পাশে দেখেছিলাম এক
বোবা কালা প্রেত।'

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'জন্ম এবং পুরুষ' কবিতায় মায়ের রূপকে প্রেতিনীর কথা এনেছেন—

'প্রেতিনী মায়ের মুখসরে যায়
বালুচরে তালুচবে জ্বলে'—

প্রেতের অনুষঙ্গ তাঁকে তাড়া করেছে বারবার। 'আজও উত্তর জানালা' কবিতায় তিনি বলেছেন—'তবু প্রেত এক আমার নিয়েছে পিছু' আবার তিনি যখন বলেন—'আমার বন্ধুরা সব ছায়াহীন হেঁটে অন্যদেশে চলে গেল' তখন বেশ বোঝা যায় লোকায়ত চেতনার অন্তস্থলে প্রেত বিশ্বাসটি তাঁর কবিসত্তাকে আচ্ছন্ন করে কাব্যদেহে তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যখন একটি কবিতায় লেখেন —

'একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে
মাঝারি শিরীষ গাছ একটা
অকারণে বিনা হাওয়ায় ভেঙে
পড়লো পিঠের কাছে মাথাটা
সরিয়ে নিয়েছে পৃথিবী বুঝলাম
সবই অনেক দূরে দিয়ে উড়ে উড়ে
আমার এক বন্ধু চলে গেল।'

তখন জাদুবিশ্বাসের অলৌকিক জগৎটাকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। 'নিহিত পাতাল ছায়া' কাব্যগ্রন্থে শঙ্খ ঘোষের—'ঘেরা জাল' কবিতায় প্রেতের অনুষঙ্গটি এসেছে রহস্যের মায়াজালে—

মধ্যবর্তী প্রেতকুল সেই মুহূর্তে
চোখে চোখে কানে কানে

সব কথা বলে দিয়ে ত্রিযামের
আগেই মিলাল ।'

টাইলারের মতে সর্ব প্রাণবাদ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে 'প্রাকৃতিক ধর্মের (Natural Religion) দর্শন সম্পূর্ণতা লাভ করে। কার্যকারণ সম্পর্কের একটা সহজ ব্যাখ্যা আদিম মানুষ করেছিলো বটে। ঘটনা যখন ঘটে, তখন নিশ্চয়ই তার কারণ আছে। টাইলর বলেন যে, এই সত্যটি আদিম মানুষের কাছে একটি যুক্তিপূর্ণ অনুমান হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত নদী-নালা ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে একটা না একটা শক্তি যে বাস করে, এ সম্পর্কে আদিম মানুষের কোনো সন্দেহ ছিল না। যখন প্রচণ্ড বেগে বাতাস বয়, ঝড় আসে, সমুদ্রের বুকে শুরু হয় প্রবল বাত্যা, যখন উর্ধ্বাকাশে বিপুল গর্জন করতে করতে মেঘরাশি বিদ্যুতের চাবুক হানে, সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত ঘটে, যখন ভূমিকম্পে পৃথিবী হয় থর থর কম্পিত, যখন আগ্নেয়গিরি অগ্নুদগার করে – তখন মানুষ এ-সব ঘটনার পেছনে যে বিশেষ শক্তি ক্রিয়াশীল সে-সম্পর্কে হয় অবহিত আর, এসব শক্তিই ঘটনার কারণ. ছাড়া কিছু নয়। আদিম মানুষ মনে করতো যে ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়-- ব্যক্তির দেহ মধ্যস্থ আত্মার জন্য। তেমনি তারা চিন্তা করতো যে বস্তু বিশেষ ঘটনাবলীর জন্য দায়ী আত্মা-সংযুক্ত দেবদেবী বা কোন বিশেষ শক্তি। তাই দেখা যায় সর্ব প্রাণবাদের প্রথম ভূমিকাটি নিঃশেষিত হয় আত্মা আবিষ্কারে। দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয় বহির্বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিশেষ শক্তি সন্ধানে (soul like beings)। তাই আদিম মানুষ যে বিশ্বাসগুলি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছিল সেই ধারা আজও প্রবহমান লোকায়ত জাদুক্রিয়া, প্রেত বিশ্বাস, অপদেবতা, অলৌকিকতার প্রতি আস্থায়। তাই কবি যখন বলেন, 'এড়াতে ডাকিনী মায়া সাধো যদি তুমি পরিণামে তুমিই পাথর।' [মণীন্দ্র রায়ঃ মোহিনী আড়াল]। তখন কি উপরোক্ত বক্তব্যটি আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না? কবি বলতে চেয়েছেন ডাকিনী মায়াকে যদি তুমি সাধনা করে এড়াতে যাও তাহলে পরিণামে তুমি পাথরে পরিণত হবে। সর্বপ্রাণবাদে দ্বিতীয় পর্যায়টি অর্থাৎ আত্মার পাথরে রূপান্তর ব্যাপারটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। জীবনানন্দ দাশ যখন বলেন--'নেচেছে তাহারা মায়াবীর জাদু জালে', 'কোন ডাকিনীর বুকের চিতায়', কিংবা 'দানোয় পাওয়া', 'প্রেতপুর', 'ভুতের জাহাজ' ইত্যাদি শব্দ বা চিত্রকল্প ব্যবহার করেন তখন আদিম মানুষের প্রেতাত্মা ভূত-বিশ্বাস, অপদেবতা সম্পর্কিত অলৌকিক জাদু বিশ্বাসগুলি কিভাবে আদিম স্তর থেকে উৎসারিত হয়ে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লোকায়ত সংস্কারের মধ্য দিয়ে আধুনিক চেতনার মধ্যেও স্থান করে নিয়েছে—তা জানা যায়।

সর্বপ্রাণবাদের শেষ পর্যায়ে টাইলরের মতে হয়েছে দেবতার আবিষ্কার। ব্যক্তির জীবন ও বস্তু বিশেষের মধ্যে আত্মার আবিষ্কারই শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রাণবাদকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় (বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য): আব্দুল হাফিজ)। সেখানে বায়ুর শক্তিতে দেবতার বিশ্বাস আসে. অগ্নির তেজে দেবতার ঐশ্বর্য দেখতে পায়,

সৃষ্টি হয় বায়ুর দেবতা, বজ্রের-দেবতা, অগ্নির-দেবতা, পৃথিবীর-দেবতা ইত্যাদি। তাই কবি যখন বলেন—'বায় ঘোড়ার খুরে যে পরায় অগ্নির মত লাল' - [মনোবীজ ঃ জীবনানন্দ] তখন একথা আমাদের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে কবি বায়ুর বেগে, অশ্বের ধাবমানতাতে এবং বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গে যে অগ্নির ছটাময় দীপ্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তার পিছনে আছে কিন্তু আদিম দেবতা বিশ্বাসের লোকায়ত প্রতিফলন —কবিতার ইমেজ সৃষ্টিতে। কবি যখন বলেন 'কাল আত্মার রহস্যময় ভুলের বুনানি ঘিরে' জীবননানন্দ ঃ সূর্যসাগর তীরে) তখন শুভ আত্মা ও অশুভ আত্মার আদিম জাদু বিশ্বাসটি কিভাবে লোকসংস্কারের মধ্য দিয়ে আধুনিক কবি মননের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা ভাবলে বিস্মৃত হতে হয়।

লোক-বিশ্বাস ঃ ভৌতিক বিশ্বাস ঃ অলৌকিকতা

আব্দুল হাফিজ তাঁর 'লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ' গ্রন্থে লোকবিশ্বাস প্রসঙ্গে বলেছেন—, একটি বিশ্বাস একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মনে যতক্ষণ অবস্থান করে ততক্ষণ তা লোক বিশ্বাসই বটে। কিন্তু একথা ঠিক নয় যে বিচার শক্তি শূন্য অযৌক্তিক অথবা সাধারণ অমূলক বিশ্বাসই হলো সংস্কার। তাই এ. ই হীথ যেকথা 'বিশ্বাস প্রসঙ্গে' বলেছেন, -তা হচ্ছে -"বিশ্বাসের পেছনে যদি কোন প্রমাণ থাকে, যদি বিশ্বাসের সম্ভাবনাগুলি গণনসাধ্য হয় এবং সেগুলির পরিমাণও যদি হয় উল্লেখযোগ্য, তবে সেক্ষেত্রে বিশ্বাস করার ব্যাপারে তেমন কোন অযৌক্তিকতা থাকে না। কিন্তু যদি বৈষম্যগুলি নিরূপমের অতীত হয় অথবা যা বিশ্বাস করা হয়ে আসছে তুলনায় যদি সেগুলি অমার্জিত ভাবে গুরুত্ব সম্পন্ন হয় তবে সেই বিশ্বাসই হল সংস্কার।" [A. E. Heath : Probablity, Science and Superstition] ইংরাজীতে যাকে Folk belief বলা হয় বাংলায় তাকে নাম দেওয়া হয়েছে লোকবিশ্বাস, আর Superstition-এর প্রতি শব্দ হিসাবে আমরা লোকসংস্কার কথাটি ব্যবহার করেছি। আমাদের দেশে সংস্কার শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয় culture-এর প্রতি শব্দ হিসাবে। সুসংহত একজ সমষ্টির যে সব বিশেষ বিশেষ আচার আচরণ ক্রিয়া কর্মাদিকে কর্তব্য-অকর্তব্য বিবেচনা করে এবং যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত, তাই হলো লোকবিশ্বাস। কিন্তু লোকসংস্কার হলো সেই সব আচার আচরণ ক্রিয়া-কলাপ যেগুলি পালন এবং সৃজন সম্পর্কিত ধারণাগুলি ঐ জনসমষ্টি শুধু তা বিশ্বাসই করে না বর্ণে বর্ণে মেনেই চলে। এগুলি যেহেতু ঐতিহ্যানুসারী, সেই হেতু আদিম স্তর থেকে এইসব বিশ্বাস ও সংস্কারের ধারাগুলি লোকায়ত জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আধুনিক, অত্যাধুনিক মানসিকতার মধ্যেও বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল।

জীবন মৃত্যু সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসটি জীবনানন্দ দাশের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন—'জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার'—অথবা 'ভুতুড়ে পাতার মত ভিড়ে যেন কোন মায়াবীর নষ্ট ইন্দ্রজাল'—এখানে ভৌতিক বিশ্বাস, মৃত্যু

লোক, মায়াবীর ইন্দ্রজাল ইত্যাদি লৌকিক বিশ্বাসের অনুষঙ্গগুলি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। তাই কবি যখন বলেন— 'মড়ার খুলির মত ধরে আছাড় মারিতে চাই'— কিংবা 'অবসরের গানের কবিতায়' যেখানে কবি চারিদিকে নুয়ে পড়া ফসলের মধ্যে রূপসী শরীরের ঘ্রাণ পেয়েছেন সেখানে যখন তিনি মনে করেন 'জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি'— তখন খুলির অট্টহাসির মধ্যে অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টিতে লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন আমাদের অত্যন্ত আগ্রহান্বিত করে তোলে। আবার যখন দেখি লোকসংস্কারের গহন গভীর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি কাব্যের শরীর তৈরীতে অব্যর্থ প্রয়োগ করেন, তখন একথা আমাদের মনে না হয়ে পারে না যে রূপসী বাংলার লোকায়ত সংস্কারের ও বিশ্বাসের ধারাটি তাঁর কাব্যচেতনায় কত সজীব ও সুদূর প্রসারী। তাই 'নক্ষত্রের দোষ' সংস্কারটি তাঁর কাব্যে লোকসংস্কারের ভিত্তিমূল থেকে উঠে এসেছে বারবার ইমেজ সৃষ্টির দ্যোতনায়—

(ক) যে নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ আমার
প্রেমের পথে বার বার দিয়ে গেছে ব্যথা (বোধ)

খ) অবহেলা করে করে কিংবা তার নক্ষত্রের
দোষের ধ্যানের সময় আসে তার পর

ভৌতিক বিশাসের অনুষঙ্গটি লোকায়ত সংস্কারের পথ বেয়ে কবির জীবনমূল থেকে উঠে এসেছে বারে বারে। উপমা রূপকের সাহায্যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে বার বার। যেমন 'জীবন' কবিতায় অসংখ্য বার ভূত নামক লৌকিক বিশ্বাসটি প্রতিফলিত হয়েছে বার বার।

(ক) আমরাও চলি ফিরে কবরের ভূতের মতন
(খ) বাসি পাতা ভূতের মতন উড়ে আসে।
(গ) পুবের হাওয়ার মত ভূত হয়ে মন তার ঘোরে
নদীর ধারে সে ভূত একদিন দেখেছে নিশ্চয়।
(ঘ) পাহাড় নদীর পারে হাওয়া ভূত হয়ে মন
(ঙ) আবার পিপাসা সব ভূত হয়ে পৃথিবীর
মাঠে অথবা গ্রহের পরে – ছায়া হয়ে
ভূত হয়ে ভাসে।

অলৌকিক পরিবেশ সৃজনে লৌকিক সংস্কার কিভাবে উপমা, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্পে গভীর ব্যঞ্জনা সৃজিত হতে পারে উপরোক্ত পংক্তিগুলি তার স্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে আমাদের নিকটে উপস্থিত হয়। কবরের ভূতের মতন বাসিপাতা গুলোই যে ভূতের মতন ওড়ে, পুবের হাওয়ার মত ভূত মোম হয়ে ঘোরে ইত্যাদি থেকে যখন কবি হাওয়া ভূত, পিপাসাকে ভূতরূপে দেখেন এবং সমস্ত পৃথিবীর মাঠ, অথবা পৃথিবীর সমস্ত গ্রহের উপর ব্যপ্ত হয়ে ভূত ছায়ারূপে ভাসছে—এই চিত্রকল্প গুলি কবির লোকায়ত বিশ্বাসের গভীর ব্যঞ্জনাকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে।

জন্মান্তর একটি লৌকিক বিশ্বাস। ঠিক তেমনি সাত সংখ্যাটিও লোকবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। পিপাসার গান কবিতায় কবি বলেছেন—কোন এক অন্ধকারে আমি যখন যাইব চলে—আবার আসিব কি আমি? 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে—আবার এসেছে সেই জন্মান্তর বিশ্বাস—

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে
যায় আবার কি ফিরে আসিব না আমি
পৃথিবীতে আবার যেন ফিরে আসি। [কমলা লেবু]

'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যগ্রন্থে দেখি সেই জন্মান্তর বাদের বিশ্বাস—

জন্ম তারকার ডাকে বার বার পৃথিবীতে
ফিরে এসে আমি। [অনেক নদীর জল]

তার কারণ কবি জানেন, বা বলা চলে কবির একটি ধ্রুববিশ্বাস যে আমরা এই পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকাল থেকে বারবার ফিরে ফিরে এসেছি যেমন বীজ থেকে মহীরূহ জন্ম নেয় অরণ্য, জলের কণা থেকে জন্ম নেয় মহাসাগরের। তাই কবির ভাষায়—

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর
আজকের মুহূর্তে এসেছি, বীজের ভেতর
থেকে কি করে অরণ্য জন্ম নেয়, জলের
কনার থেকে জেগে ওঠে নভ নীল মহান
সাগর [অন্ধকার থেকে]

সাত সংখ্যাটির মধ্যে অলৌকিকতার লোক-সংস্কর আছে। কবি বৈতরণী কবিতায় বলেছেন এই সাত সম্পর্কিত সংস্কারের ব্যাপারগুলি—

(ক) সাত দিন সাত রাত উড়ে গেলে
(খ) তারপর সাত-দিন সাত-রাত কেটে
গেল পৃথিবীর আলো অন্ধকারে
(গ) সাত-দিন সাত-রাত তাহাদের জানালায় পর্দায়
(ঘ) সাত-রাত সাত-দিন পৃথিবীতে [বৈতরণী]

মৃত ও মৃতের পুনর্জন্মলাভ একটি আদিম বিশ্বাস যা লোকায়ত ধারার মধ্য দিয়ে যা আজও আধুনিক মননের সর্বত্র গহিন গহনস্তলে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাই কবি যখন বলেন—

দুই হাত চুপে চুপে নাড়ে তাই
আমার চোখের পরে আমার মুখের
পরে মৃত মেয়ে আমিও তাহার
মুখে দু-হাত বুলাই তবু তার
মুখ নাই · চোখ চুল নাই

তখন মৃতের মধ্যে শূন্যতা ও অবয়বহীনতা লোকবিশ্বাসটির ব্যঞ্জনা কন্যাহীন পিতার

মানসিক শূন্যতা এবং মর্মবেদনার এক আশ্চর্য প্রকাশ দেখা যায় উপরোক্ত কবিতাটির মধ্যে। তাই কবি যখন আবার বলে ওঠেন কবিতায় অন্যত্র—

নতুন জীবন তাই পেয়ে হঠাৎ
দাঁড়াল কাছে সেই মৃত মেয়ে
বলিল তারপর ধোঁয়া—

তখন মৃতের পুনর্জীবন সম্পর্কিত লৌকিক বিশ্বাসটির সুদৃঢ় প্রভাব প্রত্যক্ষ করি।

আদিম দেবতা বিশ্বাস কবি জীবনানন্দকে বারবার আকর্ষণ করেছে সেখানে দেবতার সন্ধানে কিভাবে সর্ব প্রাণবাদ প্রকৃতির অমেয় শক্তির বিশ্বাসে প্রতিফলন ঘটে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় তিনি বলছেন—

(ক) আগুন বাতাস জল আদিম দেবতারা
তাদের সর্পিল পরিহাসে তোমাকে
দিল রূপ।

(খ) আদিম দেবতারা হো-হো করে হেসে উঠলো।
[আদিম দেবতারা]

(গ) গুহ দেবতাকে দেখে শৃঙ্গশিলায় [বিভিন্ন কোরাস]

(ঘ) কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো [গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্য]

লোক বিশ্বাসের আধারে এসেছে 'স্বর্গের সিঁড়ি'—

একটি অমিয় সিঁড়ি মাটির ওপর থেকে
নক্ষত্রের আকাশে উঠেছে [রাত্রির কোরাস]

পাতাল নরক বিশ্বাসটি প্রতিফলিত হয়েছে উপমার সৃষ্টি প্রকরণে—

পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মত শহরে [নাবিকী]

প্রেত বিশ্বাসের অলৌকিক প্রতীক বিষয়টি ব্যবহার করেছেন আন্তর্জাতিক ভৌগলিক পরিক্রমায়—

সলিটারের অনন্ত নক্ষত্রে পশ্চিমে
প্রেতের মতন ইউ রোপ পূর্বদিকে
প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা আফ্রিকার
দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনবটাক্ষে-নতা [রাত্রির কোরাস]

'পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে' কবিতায় বহু ক্ষেত্রেই লোকসংস্কার ও বিশ্বাসের অনুষঙ্গ গুলিকে কবিতার ইমেজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা—(ক) স্বর্গের সিঁড়ির মতন, (খ) মাঘ সংক্রান্তির রাত্রি আজ, (গ) নিশির ডাকের শব্দ শুনে 'ইতিহাস মন' কবিতায় ডাইনী বিশ্বাস ও প্রেত সংস্কারটিকে কাজে লাগিয়েছেন চিত্রকল্প রচনায়। আবার পাশাপাশি লোকায়ত সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যম ও নচিকেতার কাহিনীটি প্রতীকি অর্থে কাব্যদেহে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) কোথাও সুন্দর প্রেত সত্য আছে জেনে
তবু পৃথিবীর মাটির কাঁকালে

(খ) ভয়াবহ ডাইনীর মতন নাচে।

(গ) নচিকেতা ধর্ম বনে উপবাসী হয়ে গেলে যম
প্রীত হয়।

তারপর কবি যখন 'মহাগোধূলি' কবিতায় বলেন—

সোনালী খড়ের ভারে অলস গরুর গাড়ি
বিকেলের রোদ পড়ে আসে কালনীল
হলদে পাখীরা ডানা ঝাপটায় ক্ষেতের ভাঁড়ারে
শাদাপথ ধুলো-মাছি-ঘুম মিলছে
আকাশে অস্ত সূর্য গা এলিয়ে অড়র
ক্ষেতের পারে পারে—

তখন বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, কোন লোক জীবনের স্তরে জন্মগ্রহণ করে চেতনার স্তরে স্তরে লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের উপাদানগুলি সুগ্রথিত হয়ে গেছে তাঁর অন্তরে যা প্রতিফলিত হয়েছে এই কাব্যদেহে সর্বত্র।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্যচিন্তায় ক্ল্যাসিক্যাল পথে অনুগামী হলেও লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের ক্ষেত্র থেকে বহির্গত হতে পারেন নি। 'কস্মৈ দেবায়' কবিতায় তার প্রতিফলন—

(ক) কস্মৈ দেবায়

(খ) দানবিক আত্মারে যে অনির্বাণ

(গ) রাবণের চিতা ভস্মান্ত নাকরে
দহে হৃদয় সৈকতে।
প্রেত সঞ্চারিত ধ্বংসে উৎসবের
অচির দীপালী।

সুতরাং বেশ বোঝা যায় দেব ও দানব বিশ্বাস, প্রবচনের ব্যবহার 'রাবণের চিতা', প্রেত লোকের সংস্কার ইত্যাদি থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন ভাষা ব্যবহারে, চিত্রকল্প সৃষ্টিতে ও পরিবেশ রচনায়। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থে 'পুনর্জন্ম' কবিতাটির নামকরণে তাঁর জন্মান্তর বিশ্বাসের কেবল প্রতিফলনই ঘটেনি ঐ কবিতাটির সর্বত্রই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের উপাদানে সমৃদ্ধ।

গৌরী কাপালিকা দাঁড়াল
সম্মুখে আসি নরমেধ প্রলয়ের
শিখা
শান্ত শিব পদতলে খড়
মুর্কারত সৃজনের প্রথম ভাস্কর
তার ইষ্ট দেবতাও পুরাণ বর্বর

সন্ধানে যে তপ্ত রক্তে বলি মোর
কণ্ঠনালী বন্ধযেন অগোচর
মুখে
নিঙাড়ে সে আয়ুর সার ত্রিকালের
স্বামী
মহাকাল হস্তচ্যুত
বিস্মৃতির অতল পাতালে
ক্ষণিকের আত্মবলিদানে
রুদ্রমূর্তি বিপাশার জল
বৈতরণী পুনর্বার ডাকিবে আমারে
অবিরত

নরবলি বিশ্বাস, মহাকাল, ত্রিকাল সম্পর্কিত ধারণা, পাতাল ও বলিদান সম্পর্কিত ধারণা, রুদ্রমূর্তি ও বৈতরণী সম্পর্কিত বিশ্বাস—লোকসংস্কারের অনুষঙ্গ হিসাবে এসেছে কবিতাটির মধ্যে, প্রতীক, চিত্রকল্প, রূপকে, অলঙ্কারে। 'সর্বনাশ' কবিতায় কবি যখন বলেন—

'তোমার সাহস কাড়ে বৈধব্যের প্রেতাত্ম শ্মশান' অথবা
'গতানু আলোর প্রেত বিচলিছে স্তবকে স্তবকে'।

তখন বিধবা নারীর অন্তহীন শূন্যতাকে এবং একাকীত্বকে রূপকে ব্যাপ্ত করা হয়েছে 'প্রেতাত্ম শ্মশানের' লোকায়ত বিশ্বাসের রূপকে সেভাবেই প্রেতরূপেই আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে কবির চোখে জন্মান্তর সম্পর্কিত বিশ্বাসটি কবি সুধীন্দ্র দত্তকেও আকর্ষিত করেছে—'জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও চুম্বনে' [অর্কেস্ট্রা কবিতা] কিংবা কবি যখন বলেন 'শান্ত দোলপূর্ণিমার শশী / জাতিস্মর উদ্বেগে মসী' [প্রতিপদ কবিতা] —তখন জন্মান্তরবাদের লৌকিক বিশ্বাসটি কবি কিভাবে ব্যবহার করেছেন তা আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। 'ভূমা' কবিতায় দেখি সেই জাতিস্মরের লৌকিক বিশ্বাসের রূপকে 'দায়ভাগী জাতিস্মর স্নায়ু'। দৈববাণীর লৌকিক বিশ্বাসটি তাঁর কবিতায় বারবার এসেছে।

(ক) অমোঘ দৈববাণী রটায়না [প্রত্যুত্তর]
(খ) আবদ্ধ কি আবার দৈবাবনী [অসঙ্গতি]
(গ) একত্রে তুই নরক ও কৈবল্য
দৈবদয়া অচিন্ত্য সাফল্য [প্রায়শ্চিত্ত]

অপদেবতা সম্পর্কিত বিশ্বাসটিও নানাভাবে এসেছে কেবলমাত্র ভৌতিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নয়। 'প্রাক্তনী' কাব্যগ্রন্থে 'পথ' কবিতায় অপদেবতার লীলা দেখেছেন—

'আমেরু বিস্তারে ইতস্তত
অপদেবতার লীলা'—

কিংবা অশ্লেষা-মঘা লোকসংস্কারটি দূরে যাত্রা অথবা অজানার অভিসারের প্রসঙ্গে এসে যায়—

'অশ্লেষা-মঘা কতিপয় মরীয়া
মানুষ অজানার অভিসারে
বদ্ধ পরিকর [পথ]

মন্ত্র-বিশ্বাস, মন্ত্রবল, মরে-বেঁচে-ওঠা ইত্যাদি লোকবিশ্বাসের অনুষঙ্গগুলি এসেছে 'প্রতিধ্বনি' কাব্যগ্রন্থের 'বাতায়ন' কবিতায়—

নিজেকে দেবতারূপে চিনি আম
সে মায়া মুকুরে হোক কলা—
কৌশলে বা মন্ত্রবলে, মরে, বেঁচে
উঠি

কিংবা এই একই লৌকিক সংস্কারগুলির প্রতিফলন 'দশমী' কাব্যগ্রন্থের শুভাশুভ বিশ্বাস, অগস্ত্য-যাত্রা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। কবির ভাষায়—

ধর্মে কর্মে শুভাশুভ নিত্য নিরন্তর
তা আমার সমবয়সীরা মানেনি,
মানিনি আমি ফলে আমানের নিয়তি অগস্ত্য যাত্রা

—এই যে নিয়তির অগস্ত্য যাত্রার মধ্যে কবি নেতিবাচক জীবন চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, তার পেছনে শুভাশুভর ওপর লৌকিক বিশ্বাসের আস্থাহীনতার কারণটি প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতি চিন্তার মধ্যেও লোকায়ত জীবন চেতনার উপমা, রূপকগুলি বারবার এসেছে—

"শেফালী রঞ্জিত হস্তে নবান্নের
নৈবেদ্য এনেছে"—

তখন পৃথিবীর হস্ত রঞ্জিত হয়েছে শেফালী দ্বারা এবং সেখানে নবান্নরূপ নৈবেদ্যের আবির্ভাবে অলংকারে লোকজীবন চেতনা কবিতাটি ব্যঞ্জিত হয়েছে [অকৃতজ্ঞ]। প্রেত বিশ্বাস, ভাগ্য-গণনা, অশরীরী বিশ্বাস বারবার এসেছে ক্রন্দসী কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় রূপকে, অলংকারে, প্রতীকে, চিত্রকল্পে—

(ক) "প্রেত সঞ্চারিত কক্ষে চিত্রার্পিত সারিকা
বাচাল" [কুক্ কুট]

(খ) "প্রেত মুক্ত হল বিভাবরী" (কুক্ কুট)

(গ) "শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে
শনির দশার ঘোর পঞ্চবর্ষ আরও
বাকি আছে
অকৃপণ বৃহস্পতি গূঢ় আশীর্বাদে" (ভাগ্য গণনা)

(ঘ) "গায়ত্রী জপেছি কিন্তু শোনা গেছে
নিরর্থ নিনাদ" (অকৃতজ্ঞ)

(ঙ) "পণে এ অশেষ রন্ধ্রে অশরীরী মানুষের
দল" (মৃত্যু)

(চ) "রুদ্রের নয়নদগ্ধ মদনের প্রেত বারে
বারে" (পরাবর্ত)

(ছ) "নিশ্চিত স্বার্থের হাস্যে অতিষ্ঠ
ত্রিশঙ্কু অমর ?" (পরাবর্ত) ।

বিষ্ণু দে ইংরেজী সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র ও অধ্যাপক হয়েও পাশ্চাত্য প্রভাবে কাব্য ধারাকে সম্পূর্ণভাবে প্রবাহিত করলেও তাঁর কাব্য চেতনা, লোকবিশ্বাস ও লোক সংস্কারের অনুষঙ্গগুলি বারবার এসেছে কাব্যদেহের সাজ-সজ্জা ও ভাবসৃষ্টির প্রয়োজনে। সেখানেও আমরা দেখেছি আদিম ও লোকবিশ্বাসের অনুগঙ্গগুলি যা গ্রথিত হয়ে আছে যে কোন মানুষের চিন্তার গহনতম প্রদেশে। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'বাইশে শ্রাবণ' কবিতায় বীটোফেনীর সিম্ফনির সঙ্গে গন্ধর্বকে মিলিয়ে তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন জীবনকে দেখেছেন পঞ্চাগ্নির আলোয়। কমলে কামিনী কিংবা কালীয় দমনের লৌকিক পুরাণ কথায় বাঙালী জীবনের মূলের গভীরে যাবার চেষ্টা করেছেন, বলেছেন -

"বাতাস মুখর, কীর্তনীয়ার কলি
মেঘে মেঘে হল, বৃন্দাবনের গলি" --

এর মধ্য দিয়ে কবি লোকয়ত জীবনবোধের চেতনাটি, ভারতীয় পুরাণ মহাকাব্যের আকর্ষণটি চিনে নিতে অসুবিধা হয়নি। লোকায়ত সংস্কার ও বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসাবে তাঁর কবিতায় এসেছে - 'নিশি পাওয়ার নেশা'—এই নিশি পাওয়া ব্যাপারটি নিশির-ডাক লৌকিক সংস্কারের অন্ধ ধারণা থেকে উদ্ভূত। সেই নিশির ডাকে যে সাড়া দেয় তার মৃত্যু অবধারিত। পিশাচ সিদ্ধ ও ডাকিনী বিশ্বাসের বিষয়টি এসেছে 'বারমাস্যা' কবিতায় লোকসংস্কারের অনুষঙ্গ হিসাবে। কবি সেখানে বলেছেন—

"পিশাচ সিদ্ধের ভিড়ে ডাকিনীর
মেতেছে গাজনে"

অশরীরীদের বিদ্রোহ দেখেছেন স্বপ্নে—"এদিকে স্বপ্নে অশরীরী বিদ্রোহ" নরক সম্পর্কিত লৌকিক ধারণাটি বিষ্ণু দে-র কাব্যে বারবার এসেছে —

(ক) "নরকের এক বৃত্তেই ঘোরে লেখা
নরকেরই লোক দশদিকে গদিয়ান" (আষাঢ়েরই জয়)

(খ) "তীক্ষ্ন, স্তব্ধ, স্বর্গ-নরকের চেয়ে"

(গ) "অথচ রাজার মেয়ে রানার ছেলে" (স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত)

(ঘ) "এ নরকে মনে হয় আশা নেই
জীবনের ভাষা নেই" (ঐ)

(ঙ) "এ কোন কবির নরক জীবন যাত্রা" ? (আয়্নরিতিকে)

(চ) "নানারূপে তাই নরকের দিন রাত্রি" (ঐ)

(ছ) নরকের পথে গান করে করে চলি
মৃত্যুঞ্জয় যাত্রা (ঐ)

(জ) "তবুও বলেন প্রাজ্ঞ
নরকের ধাপে ধাপে" (জন্মাষ্টমী তেরশ পঞ্চাশ)

(ঝ) "নরকে আমারও যাত্রা অলকার অন্ধ গায়" (অন্বিষ্ট)

(ঞ) "পিছনে নরক যাত্রা দীর্ঘ পটভূমি" (ঐ)

প্রেত সম্পর্কিত বিশ্বাসটি খুব স্বাভাবিক ভাবে এসেগেছে অলৌকিকতার বিশ্বাসে—

তেপান্তরে জমে ওঠে ও কাদের
প্রেত স্ফীত লোকাতুর কবন্ধ মেদের
স্তূপ ?—

—ভৌতিক বিশ্বাসেরও ব্যাপারটি সেখানেই এসে যায় যখন তিনি কবিতার নাম 'পান্তু ভূতের স্মৃতি'-র কথা তাঁর মনে ভীড় করে আসে। প্রেতের বিশ্বাস তাঁর কাব্যে বারবার ভীড় করে এসেছে তাই যখন তিনি বলেন—

"প্রেত কবে, তুমি বলো, ভাঙ্গে—
গড়ে প্রেমের ত্রিভুজ" (জন তিনেক ভগ্ন হৃদয়)

'গান' কবিতায় এসেছে অশরীরী বিশ্বাসের প্রতিফলন, এসেছে অলৌকিক রহস্যের মায়াজালে—

"আধেয় আবায় একাকার শরীরও
অশরীরী প্রাণ"

অর্ধ নারীশ্বরের চিন্তাটি একটি অলৌকিক বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসাবে কবিতায় রূপকল্প রচনা করেছে—

(ক) আকাশে যেমন মাতে অর্ধ নারীশ্বর নৃত্যে (গান)

(খ) জীবনের মহামৃদংগে নাচে অর্ধ নারীশ্বর (এলসিমোরে)

পিশাচ আর প্রেতলোকের লৌকিক সংস্কারের অনুষঙ্গ দুটি কবিকে বারবার কেবল লৌকিক অনুষঙ্গের প্রেরণা জুগিয়েছে তাই নয়, কবি স্বপ্নলোকে প্রেতলোকের দুর্গন্ধে দিশেহারা হয়েছেন, কখনও পিশাচ পিশাচিনীর সন্ত্রাসে সন্ত্রস্ত হয়েছেন বারবার, প্রেতলোক স্বপ্নের হলাহলে পরিপূর্ণ হয়েছে—তাই কাব্যে তারই প্রতিফলন।

(ক) এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে কি আমি শুধু
দিশাহারা [এলসিনোর]

(খ) পিশাচেরা আর পিশাচ সিদ্ধ দলে
উদ্বায়ু সন্ত্রাসে। [ঐ]

(গ) এই প্রেতলোক জীয়াসেতো হবে স্বপ্নের
হলাহলে [ঐ]

সমর সেনের কবিতায় 'যম ও নরকের' রূপকের রূপকটি এসেছে লৌকিক বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসাবে। কবির ভাষায়—

"আর মাঝে মাঝে উদ্যত যমদূতে ক্লান্ত হতাশা থাকে
দিন রাত্রির নরকের সিংহদ্বারে।" [ঘরে বাইরে]

অলৌকিকতার বিশ্বাসটি যে তাঁর মনের গভীরে কতটা ক্রিয়াশীল তা উপলব্ধি করা যায় যখন তিনি বিশাল শূন্যে কার যেন করতালি শুনতে পান, আর কানে আসে অদৃশ্যের অট্টহাসি। কবির ভাষায়—

বিশালশূন্যে কার যেন করতালি বাজে
অদৃশ্যে অটহাসি। [ঘরে বাইরে]

—এই অলৌকিকতার মায়াময় পরিবেশটি তার মনের ওপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা বুঝতে পারা যায়, যখন তিনি বলে ওঠেন আর্তনাদ সহকারে—

দিন নেই রাত নেই, বারে বারে চমকে উঠি
শুধু মনে পড়ে
কঠিন অন্ধকারে অবরুদ্ধ বাতাস
দেওয়ালের উপর বিষন্ন ছায়া

তাই তিনি পূর্ব-পুরুষের স্তব্ধ প্রেতকে অলংকার ব্যবহার করেন কবিতার অবয়ব সৃষ্টিতে - যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধ প্রেত [পলাতক] টাওয়ার অব সাইলেন্সে মৃতদেহ সৎকারের চিত্রটি এসে যায় একটি বিদেশী লোকসংস্কার ও লোকচারের অনুষঙ্গ হিসাবে—

নিঃসঙ্গ, শেষমিনারে সূর্য
পূজারীর শবের উপরে যেমন শূন্য
থেকে আজ / এক চক্ষু, ছিন্নপাখা
জিজ্ঞাসার পাখি নামে নামে। গ্রহণ]

নরক আর প্রেতলোকের বিশ্বাসটি এর পরেই এসে গেছে তাঁর কবিতায় লোক-বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসাবে। কবির কাব্যে তারই প্রতিফলন—

(ক) নরকের ধিক্কারের পর
(খ) দিনশেষে নিমেষের সোনার ঝাঁঝরে [শেষ সন্ধ্যা]
(খ) তারপর তুমি চলে গেলে যমলোকে [কয়েকটি মৃত্যু [
(গ) অন্ধকার প্রেতলোকে ভাবে ভগবান [স্তোত্র]

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় লোকায়ত বিশ্বাসগুলির প্রতিফলন ঘটেছে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই। 'শাপভ্রষ্ট' কবিতার নামকরণেই কেবল লৌকিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে তাই নয় সেখানে কল্যাণ অকল্যাণ, শাপ অভিশাপ রূপ লোকসংস্কার ও বিশ্বাসগুলি উপমা প্রতীকের রূপকে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যদেহের অবয়ব তৈরীতে—

(ক) নিত্যনব অমঙ্গলে করে জন্মদান [শাপভ্রষ্ট]
(খ) অমঙ্গল বায়ুবহি প্রাণের মন্দিরে [ঐ]
(গ) শাপভ্রষ্ট দেব আমি [ঐ]
(ঘ) শাপভ্রষ্ট দেব তুমি [ঐ]

(ঙ) অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিনয়ে
আমি পুরোহিত
শাপভ্রষ্ট আমি [ঐ]

'কালস্রোত' কবিতায় কেবল প্রেতের নিঃশব্দ আসা যাওয়াই যে দেখেছেন তাই নয়, মহান মন্ত্রের সন্ধান করেছেন—"প্রেতের নিঃশব্দ যাওয়া-আসা", অথবা "এমন মহান মন্ত্র কিছুই কি নাই, হে দেবতা" [ঐ] 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান' কবিতায় পৌরাণিক পরিবেশে লোকায়ত আচার ও লৌকিক সংস্কারের অনুষঙ্গ গুলি এসে গেছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই—

তুমি মোরে চেয়েছিলে নবার্ক—
রঞ্জিত পট্টবাসে বধূবেশে করিতে
বরন, / চেয়েছিল ভালে মোর
পরাইতে সিন্দুরের বিন্দুর বন্ধন, /
করে শঙ্খ বলয়ের অচল শৃঙ্খল।

কবিতাটির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে লোকাচার লোকসংস্কারের অজস্র চিহ্ন—যেমন 'পট্টবাস 'বধূবেশ', 'বরণ', 'সিদুরের টিপ', 'সিঁথির সিঁদুর', 'শঙ্খবলয়' ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর অন্য কবিতার মধ্যেও অলৌকিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে নানা লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের মাধ্যমে। 'আপনার শত্রু'-কবিতায় নানা ধরনের প্রেত বিশ্বাস সম্পর্কিত অনুষঙ্গ গুলি এসেছে—

অদেহী প্রেতের মতো আসিয়া
বসিবো তব পাশে,
হৃদয়ের রক্ত তব ক্ষণে ক্ষণে
কবিব শোষণ / কায়াহীন বুভুক্ষু
অধরে / অতৃপ্ত আত্মার মতো অজানিত
অন্ধকার হতে / শত শত অমঙ্গল—
বীজ বহি আনি / সঞ্চারিয়া দিবো
তব বসন্ত ভুবনে / ফুল তব ভস্ম হবে,
শীর্ণ হবে শস্যের সম্ভার, / তোমার
জ্ঞান দস্যুরা বিষ হয়ে যাবে মোব তিক্ত
অমিশাতে / তিলে তিলে আমি তব
মৃত্যু হবো, [অপর্ণার শত্রু]

কবিতাটিতে সারা অঙ্গে অদেহী প্রেত, রক্তশোষণ, কায়াহীন বুভুক্ষু অধর, অতৃপ্ত আত্মা, অজানিত অন্ধকার, ভস্ম হওয়া, শস্যহীন হওয়া, বিষ হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি শব্দ চিত্রকল্প অলঙ্কার ভাবসৃষ্টি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের গভীর অন্তঃস্তল থেকে উম্ঘাটিত করে। আসলে কোন মানুষই সে কবিই হোন আর শিল্পীই হোন সদা সর্বদাই জীবনের গভীরে মূলের জগৎ থেকে এগুলি বিভিন্ন মুহূর্তেই

প্রকাশিত হয় কবির কবিতায় শিল্পীর শিল্প চেতনায়। পাপ পুণ্যের-জন্মান্তর বিশ্বাসটি সহজেই এসে যায় যখন কবি বলেন—কিন্তু যেই আত্মার আলোক বহু

জন্ম-পুণ্যফলে জ্বলেছিলো
আমাদের চোখে [কোন বন্ধুর প্রতি]

আবার প্রেতবিশ্বাস কবির উপমাকে এতই নিগূঢ় করেছে যে তা প্রকাশ মাত্র বুঝতে পারা যায়—(ক) 'তেমনি তোমার প্রেম কোন প্রেতে করিছে গোপন' [প্রেমিক] (খ) "প্রেতদল মোর শীর্ণ বাহু সাগ্রহে বাড়ায়" [প্রেম ও প্রাণ] (গ) 'গুপ্ত মৃত্যু পুরী হতে এসেছিলো' ফিরায়ে প্রিয়ারে' [অমিতার প্রেম] (ঘ) 'পৃথিবীর পিশাচ শক্তির নিষ্ঠুরতায় দ্বিখন্ডিত' [তবুও কোকিল ডাকে]—এই লৌকিক অনুষঙ্গগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে অলৌকিক কথার পরিবেশ সৃজনে দৈত্য, অপদেবতা, জিন, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি লৌকিক বিশ্বাসের অনুষঙ্গগুলি ব্যবহার করেছেন। পর পর কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে—

(১) "যত ছায়া অন্ধকারে লুকিয়ে আছে,
যত মৃত্যু আসছে হাওয়ায়"— (কথোপকথন)

(২) "তোমরা দূরে থাকো, দৈত্য, অপদেবতা,
জিন, প্রেত, আর প্রেতের মতো
দুঃস্বপ্ন, আর ঠান্ডা, অন্ধভয়,
পিশাচের মতো নিষ্ঠুর" (জন্ম)

(৩) "অন্ধকারে কিসের ছায়ার মতো অকারন
ভয়" (ঐ)

(৪) "শূন্য থেকে অন্ধকার ঝুলে আছে
বাদুড়ের ডানার মতো" (বিরহ)

(৫) "প্রেতের মতো আমি ঘুরে বেড়াই'
প্রেতে-পাওয়া এই বাড়ি বোবা
হয়ে আছে:" (অন্বেষণ)

(৬) "বাদুড়ের দুই অন্ধ
ডানার মতো মেলে দিয়ে" (কোন সমালোচকের)

(৭) "বাদুড়ের মতো তুমি মুখ
ঢেকে থাকো আলোর
ভয়ে" (ঐ)

ছায়া অন্ধকার যে মৃত্যুর প্রতীক, সেখানেই যদি মৃত্যু লুকিয়ে থাকে একথা কবি মনে করেন তার প্রচলিত সংস্কারবোধ থেকে। সেই বিশ্বাসের স্তর থেকেই দুঃস্বপ্নকে প্রেতের সংগে উপমিত করে ভয়কে ঠান্ডা অন্ধরূপে দেখেন। ভয়টা যে অন্ধকারের ছায়ার মতো আমাদের অকারণ আবৃত করে রাখে, তাকেই আবার অনেক সময় কবির মনে হয় অন্ধকারটা ঝুলে আছে বাদুড়ের ডানার মতো। আর সেই অনুষঙ্গই বাড়ী,

প্রেতে পাওয়ার মতো হয়ে যায় বোবা। কারণ যা কিছু অন্ধকার তা-তো অপদেবতার চিহ্ন স্বরূপ বলে তা আলোর থেকে সর্বদাই দূরত্বে অবস্থান করে।

মণীন্দ্রনাথ রায়ের 'ভিয়েতনাম' কবিতায় দেওয়ালে ভূতের ছায়া দেখেছেন— 'কয়েকটি ভূতুড়ে ছায়া মানচিত্রে আঁটে'। আবার জন্মান্তর বিশ্বাসে বলে উঠেছেন— 'আমার চোখের সামনে ভাসছে / সেই আমার আগামী জন্মের সংসার।"

সুনীল গাঙ্গুলীর 'অসুখের ছড়া' কবিতায় জন্মান্তর বিশ্বাসের সংস্কারটি এসেছে খুব সহজ ভঙ্গীতে। সেখানে তিনি বলেছেন—'এস আমার গত জন্ম / তোমায় চেনা যায় কি না'। তীর্থ যাত্রায় পুণ্যের বিশ্বাস এসেছে 'হঠাৎ নীরার জন্যে' কবিতায় লোকায়ত সংস্কারের মধ্য থেকে প্রতীক হিসাবে একটি অতি সাধারণ শারীরিক লালসাকে প্রকাশ করার জন্য —'বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও শরীর ভ্রমণে পুণ্যবান হবো।' যাদু বিশ্বাসের চেতনাটি প্রকাশিত হয়েছে 'নীরার জন্য' কবিতায়, সেখানে কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষরেকে গুণীনের বাণের সংগে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন—

'এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর
গুণীনের বাণের মতো শুধু'

একশো আট নীলপদ্মের লোকবিশ্বাসটি এসেছে 'কেউ কথা রাখেনি কবিতায়— 'বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে / এনেছি ১০৮টা নীল পদ্ম।" প্রেত বিশ্বাস সম্পর্কিত ধারণাটি 'তুমি' কবিতায় এসেছে 'সবল তোমার বুকে বসি প্রেত সাধনায়।' অশরীরী প্রতীকটি এসেছে 'স্মৃতির শহর' কবিতায় –সেখানে হেঁতালের দণ্ডটি জাদু বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

আমাকে যেতে হবে এখনো যেতে
হবে রয়েছে অশরীরী অপেক্ষায়

*   *   *   *

পথের রাজা এক মগ্ন মহাকাল
ধরেছে সুদারায় ডাগর গান
হেঁতাল দণ্ডটি আকাশে তুলে ধরে
সে যেন নিতে চায় সাগর-ঘ্রাণ

॥ আট ॥

রূপকথা : উপকথা : কিম্বদন্তী : পরী-কাহিনী

লোককথার অনুষঙ্গ গুলি প্রকাশিত হয় রূপকথা, উপকথা, কিম্বদন্তী, পরী কাহিনীর রূপ ধরে। কোন কবি, কোন লেখক, শিশুমনের এই জগৎটিকে কোন মতেই পরিত্যাগ করতে পারে না। কোন শৈশবে শোনা কাহিনী, কোন বাল্যে অপরাহ্নে মায়াবী আলোয় নেশা, সেই অজানা দেশ তেপান্তরের মাঠ, পক্ষীরাজ ঘোড়া, জ্যোৎস্নারাতে স্বপ্নের প্রান্তরে নাচতে নামা শ্বেতশুভ্র পরীর দল, সোনার পালঙ্কে শোয়া গভীর ঘুমে অতলতলে তালিয়ে যাওয়া রাজকন্যা, সোনার কাঠি রূপোর কাঠির মায়াবী স্পর্শ, প্রাণ ভোমরা, যাদু দণ্ড, দৈত্য, জিনের আবির্ভাব সব জড়িয়ে শৈশবের সেই রহস্যে ঘেরা কুহেলীময় রূপকথার জগৎ প্রত্যেক সৃষ্টিশীল মানুষকে বারবার স্মৃতির গভীর থেকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই এইসব লোকায়ত অনুষঙ্গুলি লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের মতোই মনের গভীর থেকে বারবার উঠে আসে, কবিতার অবয়ব রচনায় রূপকে, উপমায় ও অন্যান্য নানা অলঙ্কারে, প্রতীকে, চিত্রকল্পে, ব্যঞ্জনায় মোহময় পরিবেশ সৃষ্টিতে বারবার ব্যবহৃত হয়। অতি আধুনিক যুগের কবি জীবনানন্দ পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁর কাব্যে যেমন পাশ্চাত্যের রূপকথার অনুষঙ্গুলি আসে, ঠিক তেমনি আসে বাংলার একান্ত নিজস্ব লোকসংস্কৃতির ধারা থেকে উঠে আসা রূপকথা, উপকথা, কিংম্বদন্তী। দুটি উদাহরণ পাশাপাশি উপস্থাপিত করলে ব্যাপারটি আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হবে। পাশ্চাত্য রূপকথার অনুষঙ্গটি পরিস্ফুট হয়েছে 'অস্তচাঁদে' কবিতায়—

> "স্পেইনের 'সিয়েরা'য় ছিনু আমি দস্যু
> অশ্বারোহী, —নির্মম কৃতান্ত-কাল, তবু
> কি যে কাতর বিরহী কোন্ রাজ নন্দিনীর
> ঠোঁটে আমি এঁকে ছিনু চুম্বন
> অন্দরে পশিয়াছিনু অবেলার ঝড়ের মতন।"

আবার 'শংখমালা' কবিতায় বাংলার নিজস্বরূপ প্রকাশে তার পারঙ্গমত্ব অতুলনীয় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে—

> "সন্ধ্যার আঁধারে সে কে এক নারী
> এসে ডাকিল আমারে বলিল তোমারে
> চাই" —

আবার পাশ্চাত্য প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত আরব্য দেশীয় জিন-পরী অনুষঙ্গটি 'মরীচিকার পিছে' কবিতায় দেখা যায়—

"কে যেন ডাকিছে আকুল অলস উদাস
বাঁশীর সুরে কোন দিগন্তে নির্জন
কোন মৌন মায়াবী-পুরে ·· কোন
যেন এক জিন সর্দার সেজেছে তাহার
সাথী কোন যেন পরী চেয়ে আছে
দুটি চঞ্চল চোখ তুলে মরুভূর প্রেত
চমকিয়া তার চক্ষের পানে চায়"—

তবে দেশ-দেশান্তরে উপমা-রূপকের সন্ধানে কবি খুঁজে বেড়ালেও বাংলার নিজস্ব রূপ-কথায় তা যেন জীবন্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'শংখমালা'—নামটি কেবল রূপকথা থেকেই নেওয়া হয়নি, শঙ্খমালার রূপবর্ণনায় রূপকথার মায়াময় পরিবেশটি সার্থক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

"কড়ির মতন শাদা মুখ তার, দুই
খানা হাত তার হিম চোখে তার
হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে
দখিন শিয়রে মাথা শংখমালা যেন
পুড়ে যায় সে আগুনে হায়"—

রূপকথা, লোক কথার নানা অনুষঙ্গ জীবনানন্দের কাব্যে বারবার উপমা-রূপকে-চিত্র কল্পে- প্রতীকে ব্যবহৃত হয়েছে। নাগেদের রাজ্য পাতালপুরী, প্রবালদ্বীপ, মৎস্য-কন্যা ইত্যাদি লোক কথার অনুষঙ্গগুলি এসেছে 'নাবিক' কবিতায়—

লক্ষ লক্ষ ঊর্মি-নাগ বালা তোমারে
নিতেছে ডেকে রহস্য পাতালে ·· প্রবাল
পালঙ্ক—পাশে মীননারী ঢুলায় চামর

'সাগর বলাকা' কবিতায় পাতালপুরী ও মৎস্য-কন্যা রূপকটি এসেছে—

"প্রয়ান তোমার প্রবাল দ্বীপে, গলার মালা
গলে বরুণ রাণী ফিরছে যেথা,—মুক্তা
প্রদীপ জ্বলে সেথা মৌন মীন কুমারীর
শংখ ওঠে ফুঁকে,"—

পরী-দেবতা-গন্ধর্ব-নাগ-তান্ত্রিক ইত্যাদি অনুষংগগুলি এসেছে 'পরস্পর' কবিতায়--

"পরীর মতন এক ঘুমান মেয়ে সে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষের "

মৎস্য-নারী, পরীদের সোনার চুল অনুষঙ্গগুলি আবার এসেছে 'এই নিদ্রা' কবিতায়—

(ক) মৎস্য নারীদের মাঝে সবচেয়ে রূপসী
সে না কি

(খ) পরীরও সোনার চুল হয় যাতে ম্লান
আমাদের পৃথিবীর পরীদের

'বনলতা সেন' কবিতায় লোককথা বিশেষ করে রূপকথার—বহু প্রভাব পড়েছে নারীরূপ বর্ণনায়, নারীর প্রতীক সৃষ্টির প্রেরণায়, নারীদেহের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা, বিশেষ করে চোখ, মুখ, চুল ইত্যাদি চিত্রকল্প সৃষ্টিতে রাজকন্যার ছায়াপাত ঘটেছে বারবার।

(১) "হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে
দিশা সবুজ ঘাসের দেশ যখন
সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের
ভিতর অতিদূরে সমুদ্রের পর সমস্ত
দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে।"

(২) "পৃথিবীর রাঙা রাজ কন্যাদের মতো
সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে
আবার তাহারে কেন ডেকে আন?"

(৩) "সোনার ডিমের মতো"

(৪) "হীরের প্রদীপ জেলে শেফালিকা বোস
যেন হাসে"—

(৫) "যে ঘোড়ায় চড়ে আমরা অতীত ঋষিদের
সঙ্গে আকাশে নক্ষত্র উড়ে যাবো সেই
সব শাদা ঘোড়ার ভিড়"—

(৬) "মাঝে মাঝে মনে হয় এজীবন হংসীর
মতন হয়তো-বা কোন এক কৃপনের
ঘরে প্রভাত সোনার ডিম রেখে যায়
খড়ের ভিতরে—"

(৭) "বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরসিতে
হয় শুধু দেখা রূপসীর সাথে এক"—

দারু চিনি দ্বীপ, অচেনা দেশে নাবিকের পথ অন্বেষণ, পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যা, সন্ধ্যার আঁধারে এক নারী, হীরের প্রদীপ জ্বালা নায়িকার হাসি, ঘোড়ায় চড়ে আকাশের নক্ষত্রে উড়ে যাওয়া, সাদা সাদা ঘোড়ার ভীড়, জীবনকে হংসীর ডিমের সঙ্গে উপমিত করা, এ-সমস্ত কিছুর মধ্যে নানারীতিতে রূপকথার অনুষঙ্গগুলি বারবার এসেছে কবি জীবনানন্দের কাব্যে। নায়িকার রূপ বর্ণনায় হংসের গ্রীবার মত নায়িকার রূপের মসৃনতা, পাখীর নীড়ের মতো চোখকে উপমিত করেন নায়িকার চক্ষুকে, কড়ির মতো সাদামুখ অথবা হীম-চোখে হিজল কাঠের রক্তিম-চিতার জ্বলন্ত রূপ প্রত্যক্ষ করা এ সবেই রূপ-কথার নায়িকার অনুষঙ্গ গুলি এসেছে। নায়িকার রূপ নির্ণয়ে কবি যখন বিস্ময়ে মুখর প্রশ্ন তোলেন 'মৎস্যনারীদের মাঝে সবচেয়ে রূপসী সেনা কি?' কবির স্বপ্নে

যেহেতু পরীরা সোনার চুল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় উড়ে বেড়ায় সেখানে কবির কাছে ম্লান বলে মনে হয়েছে পৃথিবীর পরিদের। কবির মাঝে মাঝে মনে হয়েছে পৃথিবীটা বুঝি রূপকথার দেশ তাই তার ভাষায় 'পৃথিবীটাকে মায়াবীর নদীর দেশে / বলে মনে হয়।' অথবা কবি যখন বলেন—সাতদিন সারারাত উড়ে গেলে তখন কি রূপকথার সেই রাজপুত্র কি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে দূরে দূরান্ত উড়ে চলেছে সপ্তদিবস সপ্তরাত্রি পার হয়ে —রূপকথার সেই চিত্রকল্পটি কি আমাদের মনে করিয়ে দেয় না। অথবা কবি যখন বলেন—সোনার বলের মতো সূর্য আর / রূপোর ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ 'দেখা—তখন রূপকথার জাদু আয়নার কথাটি মনে করিয়ে দেয় না।

অজিত দত্তের কাব্যজগতে রূপকথার সীমাহীন রাজত্ব। সেখানে রাজকন্যা, পাতাল কন্যা, পাশাবতীদের রূপ-অপরূপের অবাধ মেলা। কবির ভাষায় যেখানে রূপালী ঢেউয়ে দুলিয়ে / ময়ূর পঙ্খী নাও, যে-দেশে রাজার / ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে, / কুঁচের বরন কন্যা একাকী বসিয়া / বাতায়নে চুল এলায়েছে যেথা, / কালো আঁখি সুদূরে উধাও, যে দেশে পাষাণ পুরী, মানুষের / চোখের পাতাও অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে, হীরার / কুসুম দলে যে-দেশের সোনার / কাননে কখনো আমার পরে, তুমি / যদি সেই রাজ্যে যাও তাইলে, / তোমারে কহি, সে দেশে যে / পাশাবতী আছে, মায়ার পাশাতে যেই / জিনে লয় মানুষের প্রাণ, মোহিনী / সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে / কহিয়া আমার নাম শুধাই য়ো আমার / সন্ধান ; সাবধানে যেয়ো সেথা ; / চোখে তব মোহ নামে গাছে গাছ / তার মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান / [পাশাবতী পাতাল কন্যা, কাব্যকন্যা]—কবিতাটির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে বাংলার রূপকথার অজস্র অনুষঙ্গ। রূপালী ঢেউয়ের ময়ূরপঙ্খী নাও, রাজার ছেলে যেখানে দেখেছে কুমারীকে দেখেছে স্বপনে কুঁচবরণ রাজকন্যা এলায়িত চুলে বসে আছে সুদূরে উধাও। কবি পাষাণ পুরীর কথা বলেছেন যেখানে চোখের পাতাও পড়ে না অযুত বছরে, সোনার কাননে ফলে হীরার কুসুম, সেই দেশে থাকে রাজকন্যা পাশাবতী। যে মায়ার-পাশা খেলে জিনেলয় মানুষের প্রান। কবি সেইখানে তাঁর নাম শুধাবার কথা বলেছেন আবার সাবধানও করে দিয়েছেন—তোমার চোখে যেন মোহনা নামে। আধুনিক কবির কাব্যে ফুটে উঠেছে এক মায়াময় রূপকথার জগৎ লৌকিক উপাদানের অজস্র সম্ভার।

'পাতাল কন্যা' কবিতাটির মধ্যেও নানাভাবে পাতালকন্যার রূপ আর তার রূপকের সূত্রে এসেছে রূপকথার নানা অনুষঙ্গ কবিতাটির উপমায়, রূপকে, প্রতীকে, চিত্রকল্পে, ভাব সৃষ্টির অপরূপ ব্যঞ্জনায়। সাপের নিঃশ্বাসে হিম পাতালের কন্যার সোনার তনু কিংবা কবি যখন গরলের নীলিমায় নীল সেখানে এসেছে সাপের দেওয়াল—ছাদ, মনি-কোঠা সাপের মনি, সাপেদের শীতল বিছানা, কালনাগিনীর বিছানায় কালনাগিনীর চুনীর মতো লাল চোখ দেখেন, তখন সব কিছুর মধ্যে সর্পরাজ্য, পাতালপুরী, নাগিনীর রূপ একটি অপরূপ রূপকথার আমেজ সৃষ্টি করে আমাদের মোহময় করে তোলো। কবি অজিত দত্তের লেখনীতে সেই মোহময় রূপকথা, স্বপ্নময় রাজ্যটি অসাধারণভাবে প্রকাশিত

হয়েছে "কুমার শুনেছে রূপকথা ; সাপের / নিঃশ্বাসে হিম পাতালের অবশ প্রাসাদে / কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় . কাঁদে নীল সোনালতা। এর পরেই কবি সর্প-পুরীর পাতালরাজ্যের নাগকন্যার দেশের এক অপরূপ রূপকথার সৃষ্টি করেছেন কবিতার আকারে। সেখানে যেসব শব্দ, প্রতীক, চিত্রকল্প, অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে, যেভাবে সামগ্রিক পরিবেশটি সৃজন করা হয়েছে তার মধ্যে রূপকথার মায়াময় পরিবেশটি সার্থক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে কবি বলেছেন—

সাপের দেয়াল ছাদ, মনিকোঠা সাপের
মন্দির, লাল কালো ঝিলমিল সাপেদের
শীতল বিছানা, চুনির মনির মতো
লাল চোখ কালনাগিনীর, বাতাস
বিষাক্ত সেথা, মানুষের সেথা যেতে
মানা। কুমারের উদাসীন মন সেখানে
বেঁধেছে বাসা, তাহারে ফিরাবে কোন
জন ? কন্যার সোনার দেহে হাজার
ময়ূর কণ্ঠী সাপ, কন্যার বুকের পরে
নাগিনীর সোনার কাঁচুলি, সাপেরা
মেলিয়া ফণা দূরে করে গরলের তাপ,
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশলাখ ফণা উঠে
দুলি ; দশলাখ লাল-কালো ডোরা
কাটা সাপেদের মাঝে, সোনার কন্যার
শুধু মুখখানি বাহিরে বিরাজে।
কুমারের উদাসীন মন সেদেশে গিয়েছে
উড়ে, তাহারে ফিরাবে কোন জন ?
গভীর সমুদ্র-তলে প্রবাল-দ্বীপের সীমা
ছাড়ি তিমিরা যেখানে থাকে তারো
নীচে সাপের দালান সাত-ভিঙা
মধুকর যে-দূরে সাগরে দেয় পাড়ি,

কবি যে পাতালপুরীর রহস্যময় পরিবেশ সৃজন করেছন সেখানে আমরা পেয়েছি রূপ কথার নানা অনুষঙ্গে ভরপুর বাংলার লোককথার অজস্র উপাদান। পাতাল কন্যার যে রূপ বর্ণনা হয়েছে সেখানে দেখা যায় কন্যার সোনার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী নাগ যেন অলঙ্কারের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। কন্যার বুকের পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলী তাঁর রূপকে লক্ষগুণ বর্ধিত করে দিয়েছ। কোন অচিন দেশের রাজপুত্র এই পাতাল কন্যার জন্যে উদাসীন মনে সে দেশের পাতাল নগরীতে উড়ে গিয়েছে। কবি এই মায়াময় রহস্য কুহেলী ঘেরা পাতাল রাজ্যের বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি চলে গেছেন আরো গভীর সমুদ্রের অতলতলে প্রবাল দ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে

তিমিরা থাকে আর তার নীচে সাপের দালান। সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে যে দূরে সাগরে পাড়ি দেয় যেখানে সেখানে সমুদ্রতলে মরকত মানিকের স্থান। কবি জানেন আরো দূরে আরো ঢেউয়ের নীচে যেখানে লক্ষ-ফণায় নিশ্বাস দুলেছে, একলা সোনার কন্যা সেদেশে ঝিলমিল ফণার ছায়ায় অঘোরে ঘুমায়। কবি প্রশ্ন তুলেছেন সে অচিন রাজপুত্রের কাছে—

"কুমারের উদাসীন মন
সেখানে বেঁধেছে বাসা, তাহারে
ভুলাবে কোন জন"—

পরী কাহিনী হচ্ছে 'ফেয়ারী টেলস্'। রূপকথার লোককথার সুবিস্তীর্ণ এলাকায় পরী কাহিনীগুলি রহস্যে, রূপকে, মায়াময় পরিবেশ সৃজনে অলৌকিক রহস্যের দ্যোতনায় এক অপরূপ জগৎ সৃষ্টি করেছে। সেখানে যা-কিছু হয়, যা-কিছু ঘটে, তা জাদুবিশ্বাসের লোকাচারে এক প্রশ্নহীন বিশ্বাসের জগৎ সৃষ্টি করে রেখেছে। এই পরীদের কেউ দেখেনি অথচ মানুষ এই পরীদের বিশ্বাস করে। কবির ব্যঞ্জনায় তা অপরূপভাবে ধরা পড়েছে সেখানে প্রকৃত-অপ্রকৃত, লোক-অলৌকিক, বিশ্বাস-অবিশ্বাস একাকার হয়ে গিয়েছে—

পরীতে বিশ্বাস কর ? দেখেছ কি
মানুষ যখন আঁধারে একাকী চলে
পিছনে সে নাহি চায় ফিরে ?

পরীতে বিশ্বাস কর ? পরী, যারা
শীতল শিশিরে সাঁঝ হলে মুখ ধোয়
দিবসের ঘুম থেকে উঠে, আকাশের
সব তারা যে পরীরা নিয়ে যায় লুটে।

নিশাচরী এখানে বিহরে, অন্ধকারে
পদধ্বনি নৃত্যমত্ত সহস্র শরীর, এ-বনে
পরীর মায়া মানুষের প্রাণ লয় হরে।

এই পরীর বিশ্বাসটি অজিত দত্তের কাব্যে বারবার এসেছে প্রতীক ও চিত্রকল্প হিসাবে। 'আর এক রাত্রিতে' কবিতায় তিনি চাঁপা ফুলকে পরীরূপে প্রত্যক্ষ করে বলেছেন— 'চাঁপাফুল হয় পরী।' সাঁওতালী লোক জীবনের সংগে পরীদের একটা সম্পর্কের সন্ধান করেছেন লোক জীবনের স্বরূপ সন্ধানে। সেখানে ছন্দময়, প্রকৃতি-পালিতা, নৃত্যরতা, ফুলসাজে সজ্জিতা সাঁওতালী মেয়েদের সংগে রূপকথার পরীদের জগতের সংগে এক অনির্দেশ্য মিতালীর সন্ধান করেছেন। কবি তাদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

সাঁওতালি মেয়েরা বনের পথে নেচে
নেচে চলে যেন হরিণ-ছানা, সাঁও

তালি মেয়েরা কোন জগতে ভেসে চলে যেতে
চায় নেই ঠিকানা। চুলে তারা গোঁজে ফুল
হাসে খিল্‌খিল্‌ শুকনো পাতার পথে
চলে খুশিতে, মহুয়া বনের সাথে কী ওদের
মিল। বনের পরীরা যেন ওদের মিতে।

দুটি প্রেমের কবিতায় এই পরী বিশ্বাস সম্পর্কিত ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে কবিতাটির উপজীব্য বিষয় হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। পরী সম্পর্কিত লোকায়ত বিশ্বাসটি পরিপূর্ণ প্রতীকী রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে কবির প্রেমিকার রূপ বর্ণনায়। পরী যে স্বপ্ন রাজ্যের বাসিন্দা কেবল তাই নয়, তার অপরূপ রূপমাধুর্য, স্বপ্ন এবং কল্পনা দিয়ে তৈরী এক অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাময় প্রকাশ। পৃথিবীর সব মেয়েরাই পরী হতে চায়, যে পরী সোনা-হীরা-মনি-মুক্তায় নিজেকে মুড়ে রাখে সেই পরীর জগতে, সে পরী হতে চায়। তাই কবি বলেন—

'তবে সেই পরীর মতন জাদুমন্ত্রে
আমি তোমাকে পৃথিবীর সমস্ত
ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে দেব।'

কারণ পৃথিবীর সব মেয়ে– সব প্রেমিকারা তাই চায়– সে স্বপ্নের দেশে, সোনার পরী হবে, যার দাঁতগুলো হবে মুক্তোয় গড়া আর চোখ দুটো হবে কালোহীরের টুকরো আর অঙ্গ হবে সোনার প্রতিমা। তার কারণ, আর কেউ নয় সেই হবে জগতের পৃথিবীর 'শ্রেষ্ঠ সুন্দরী'। কবির ভাষায়—

'একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে হীরে
মুক্ত সোনা মানিক্য খুব ভালোবাসত
বলে কোন এক পরীর শাপে সোনার
প্রতিমা হয়ে গেল ? তার দাঁতগুলো
হল মুক্তোয় গড়া, আর চোখ
হল দুটি কালো হীরের টুকরো, তার
অঙ্গ হল সোনার প্রতিমা, সমস্ত
পৃথিবীতে সেই হল শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। শুধু
তার প্রাণ আর মন প্রেম আর আত্মা
আকাংখা আর স্বপ্ন, নিরেট পাথরের
মত স্তব্ধ মৃত্যুতে বিলীন হয়ে গেল।

রূপকথার অনুষঙ্গগুলি এসেছে বারবার প্রতীকে, চিত্রকল্পে, অলঙ্কারে, ভাব সৃষ্টির দ্যোতনায় কাব্যকে অধিকার করেছে বারবার। সেখানে সোনার কাঠি, দৈত্য, শয়তান, রাজ পুত্তুর, রাক্ষস-খোক্কস, ইত্যাদিব্যবহৃত হয়েছে কাব্যদেহে। সোনার কাঠি অনুষঙ্গটি ব্যবহার করে কবি বলেন—'বুলায় সোনার কাঠি ধরিত্রীর চোখে / মৃদু লঘু করে। 'বাড়ব' কবিতায় অনন্তনাগের উপমায় কবি বলেন—'অনন্ত নাগের মতন লক্ষ মুখে

নিতে চায় গ্রাসে।' 'আর এক রাত্রিতে'—কবিতায় দৈত্যকে ভাবনার সংগে উপমিত করে কবি বলেছেন—'দৈত্যের মত ভাবনার দল যেথা, খেলে প্রমত্ত মনে।' —এই দৈত্যই আবার কবির কাছে কখনও মেঘের রূপকে দেখা দিয়েছে। আবার মেঘই সোনালী রূপ ধরে কবির কাছে রাজ পুত্তুর হয়ে উঠেছে। 'রোদের গান'—কবিতায় তারই প্রতিফলন—

"কুণ্ঠিত বিদঘুটে মেঘ-দৈত্য, কাজ
নেই স্ফূর্তি মিয়ানো বইতো সোনালি
মেঘটা যেন রাজপুত্তুর মেঘ-দৈত্যটা
ওর মহাশত্তুর"—

'পাথর পুরী' কবিতায় নামকরণে যেমন রূপকথার পাষাণ পুরীর রূপকল্পটি ধরা পড়েছে ঠিক তেমনি এই কবিতায় সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি, রাক্ষসের মন্ত্র ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলি। এরই মধ্য দিয়ে কবি আধুনিক নাগরিক জীবনের শোষণের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন রূপকথার প্রতীকে—

"রাক্ষসেরা হানা দিলো মানুষের দেশে
সোনা-রুপো দুই কাঠি দিয়ে সকল
মানুষ তারা রেখে গেছে পাথর বানিয়ে
* * *
সেই যে রাক্ষস এসে কি মন্ত্র পড়েছে,
রাজা-প্রজা সবই আছে, শুধু তারা
কেউ নেই বেঁচে।"

কবি নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের মধ্যে স্তব্ধতাকে যেমন ভৌতিক রূপকে দেখেছেন, মাঠে মাঠে গ্রীষ্মের প্রেত সেনার হানাহানি যেমন অবলোকন করেছেন, আবার পূণ্য-পুকুর মাঘ-মণ্ডল এর মাঝে টিনের চালে হিমের ফোঁটার শব্দ শুনেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু তাঁর 'মানস ভ্রমণ' কবিতায় মনকে ছুটিয়ে দিয়েছেন লাল-সমুদ্র, নীল-মরুভূমি, অচেনা দেশের হলুদ-আকাশ সীমানায়। তাই 'সহজ' কবিতায় মন্ত্র-শক্তির বলে হঠাৎ খুব সহজে করে ফেলার মধ্যে রূপকথার জাদুকরের ইমেজটি নিজের কবি প্রতীকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"কেমন সহজ আমি ফোটালাম এক
লক্ষ ফুল হঠাৎ দিলাম জেলে
কয়েকটা সূর্য চাঁদ তারা আবার
খেয়াল হলে এক ফুঁয়ে নেভালাম
সেই জ্যোৎস্না"—

লোককথার চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায়—

"তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল
দেখতে নিয়ে যাবো সেখানে

পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর
ভ্রমর খেলা করে"।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় কোন কোন ক্ষেত্রে রূপকথা, কিম্বদন্তীয় অনুষঙ্গগুলি এসেছে। 'যৌবন থাকে বাসে'— কবিতায় নীলকমল, লালকমলের প্রসংগটি এসেছে আদর্শ ভ্রাতৃত্বের উদাহরণ হিসাবে। সেখানে কবি বলেছেন 'আহা নীলকমল লালকমল ভাই'। আবার 'জ্যেষ্ঠ, ৬০'-এর কবিতায় কবি বলেছেন তেপান্তরের মাঠের কথা – 'অগ্নিজোড়া তেপান্তরে ধু ধু বালুর মাঠ'। একটি পুরানো পরিত্যক্ত অট্টালিকার পরিবেশটিকে কিম্বদন্তীর আকারে ফুটিয়ে তুলেছেন নানা অলৌকিক অনুষঙ্গের দ্বারা / কবিতাটির নাম 'আছে আছে সে এখানে আছে'—

"বাজে বন্ধ ঘরে অর্গান জড়ানো
এলোমেলো অন্ধকারে বিড়ালেরা
থাবা করে বেলো·· ····ভূপতিত
নিষ্প্রাণ করোটি বাজে বন্ধ ঘরে
সমস্বরে

* * *

জানালার আর্চ হতে বাদুড়ের হাতে
এ রাত্রি ভরেছে অকস্মাতে"।

পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতায় রূপকথা অনুষঙ্গগুলি বারবার এসেছে কাব্যদেহের নির্মাণ প্রচেষ্টায়। এই প্রচেষ্টা কখনও ব্যাঙ্গার্থে কখনও শিশুমনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে রূপকে-প্রতীকে-অলঙ্কারে কবি এক রূপকথার আশ্চর্য বাস্তব জগৎ তৈরী করেছেন। উদাহরণ হিসাবে দুটি কবিতা উপস্থিত করা যেতে পারে—

"খোলামকুচি ধুলোর তেপান্তরে
ছুটছে তার পক্ষীরাজ ছটুক
রাজার ছেলে ময়লা পেন্টুলুন
তলতা বাঁশের কণ্ঠ ধনুর্গুণ
ধুলোয় তার বিপুল রাজ্য পাট
বুকের মধ্যে রাজকুমারীর খাট
(আত্মচরিত-৩)

একবার আঁকছিলুম রাজাবাড়ি
আঁকতে আঁকতে হয়ে উঠলো
আলকাতরা-মাখা দৈত্য কাগজ
থেকে লাফ দিয়ে উঠলো আলকাতরা
মাখা দৈত্য,— খাবো, খাবো,
খাবো"— (এখনো)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার বিভিন্ন কবিতায় রূপকথার অনুষঙ্গগুলি ব্যবহার করেছেন বাস্তব জীবনচর্যার প্রেক্ষাপটে। সেখানে তিনি চেয়েছেন, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, কারণ এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা, তাই দুর্যোগে পথ যদি দুর্বোধ্যত্ত হয় তবে সেই পথকে চিনে নেবে যৌবন আত্মা। রূপকথা রূপকে তিনি বহুক্ষেত্রে জনগণের নিভৃত বেদনার বাণীকে তুলে ধরেছেন মানুষের অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টায় অতি আধুনিক কবিতার ব্যঞ্জনায়। 'ঠাকুরমার ঝুলি' কবিতায় তিনি সেই কল্পলোকের গল্প কথাকে নাবিয়ে আনতে পেরেছেন অতি রুক্ষ অতি কঠোর দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানিময় প্রতিদিনের সংসারে—

"এ-দুয়োরে যায় ঃ দুর-দুর !
ও-দুয়োরে যায় ঃ ছেই-ছেই

* * *

সুয়োরাণী লো সুয়োরাণী তোর
রাজ্যে দিল হানা
পাথর চাপা কপাল যার সেই
ঘুঁটে কুড়ুনির ছানা

* * *

ঘেন্নায় মরি, ছি !

* * *

মন্ত্রী বলল, দেখছি
কোটাল বলল, দেখছি

* * *

ঢোল ডগরে পড়ে কাঠি
রক্তে হয় রাঙা মাটি

* * *

কাড়ে না কেউ রা
ভালোমানুষের ছা

* * *

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
পারুল বোন রইলো কাছে

* * *

দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার
কলের ডুলি
এই গল্পে ভর্তি ক'রে
ঠাকুরমার ঝুলি ॥"

বাংলার রূপকথা সাত ভাই এক পারুল বোনের রূপকে শোষণের শেষে নব জীবনের রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সাত ভাই যদি জনগণের সম্মিলিত শক্তি হয়, পারুল বোন তার আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। সাত ভাই অর্থাৎ জনগণের সম্মিলিত শক্তি যদি একত্রিত থাকে তাহলে জয় তাদের সুনিশ্চিত। 'পারুল বোন' কবিতায় রূপকথার রূপকে সেই নবজীবনের আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়—

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার—
দেখি তো কে তোমার পায়
বেড়ি পরায় আবার?

* * *

শুয়ে শুয়ে দিন গুনেছে
পারুল বোন আমার।

* * *

সোনার ধানের সিংহাসনে
কবে বসবে রাখাল
কবে সুখের বান ডাকবে
কবে হবে সকাল।

* * *

শিয়রে জেগে সাতটি ভাই
মৃত্যুকে আজ তাড়ায়
ফুটিয়ে ফুল লক্ষ আশার
জীবন হাত বাড়ায়।

* * *

শিকলে বাঁধে স্পর্ধা কার?
পারুল বোন আমার।
ককিয়ে-ওঠা যন্ত্রণা নীল
আগুনে যাক পুড়ে
বাতাসে সব দুঃস্বপ্ন
আকাশে যাক উড়ে—

* * *

শুয়ে শুয়ে দিন গুনেছে
পারুল বোন আমার।"

বর্তমান রাজনীতি ও শাসনকার্যে যে স্বৈরতন্ত্রের চেহারা প্রতিদিন যেভাবে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে রূপকথার রাজা-মন্ত্রী ইত্যাদি রূপকে সে বিষয়ে একটি অসাধারণ কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন 'এক যে ছিল রাজা' কবিতা—

এক যে ছিল রাজা—
রাজত্বটা মস্ত
উঠত বললে উঠত লোকে
বসতে বললে বসত।

*　　*　　*

একদিন সেই রাজার
রাজ্য গেল উল্টে
শূলে চড়ার আগেই রাজা
গেলেন পটল তুলতে।

*　　*　　*

রাজত্বটা কে চালবে ?
গণক দেখেন কুষ্ঠি।
রাজা হয়ে উজির করেন
সবার মন স্তুষ্টি।

*　　*　　*

সিংহাসনে চোখ পড়তেই
ওঠে সবাই আঁৎকে
রাজা না থাক, কিন্তু রাজার
গোঁফ রয়েছে আটকে।

*　　*　　*

ভিড়ের মধ্যে কেউ খুলছে
পুঁথি বা কেউ পঞ্জী
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে রাজার
ভাইপো এবং বোনঝি ॥"

॥ নয় ॥

লোকায়ত বাংলা ঃ বাংলাদেশের কবিতা ও লৌকিক ঐতিহ্য

ওপার বাংলার কাব্যজগতেও বারবার এসেছে লোকসংস্কৃতির নানা প্রভাব। কবি অরুণাভ সরকারের একটি কবিতায় রূপকথার নীলকমলের অনুষঙ্গটি এসেছে একটি হারিয়ে যাওয়া মেঘনা-তীরবর্তী গ্রামের বেদনার আর্তিতে। কবি সেখানে বলেছেন—

"মেঘনার এপারে দাঁড়ালে
ওপারের নীলকমল দৃশ্যের আড়ালে থেকে যায়
যেন নীলকমল গ্রাম আর নেই ;
যেন সৈকতে দাঁড়ানো ব্যগ্র তজ নীর আলো
মদিরা দ্বীপের ভূমি ব্যর্থ খুঁজে মরে।"

'কেউ কিছুই জানে না' বাংলা দেশের কবিতা ঃ দাউদ হায়দার

কবি আল মাহমুদ তাঁর 'তিতাস' নামের কবিতায় তাঁর শৈশবের নদীকে দেখেছেন এক মায়াবী নদীর মতো ; যেখানে অসংখ্য পালের প্রবাহে আছে নদীর প্রবাহ, সলিমের বৌ তার ভিজে পায়ে মাটির কলসী ভরে জল আনে, যেখানে অদূরের বিল থেকে পানকৌড়ি, মাছরাঙা বক, পাখায় জলের ফোঁটা ফেলে দিয়ে উড়ে যায় দূরে দিগন্তে। কবি সেই তিতাসের বুকে অলৌকিক এক রূপকথার জগৎ প্রত্যক্ষ করেছেন সোনার বৈঠার ঘায়ে, পবনের নায়ে চড়ে চলে গেছেন এক অলৌকিক রূপকথার দেশে। কবির ভাষায় ঃ

"অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শর্বরী তিতাস
কি গভীর জলধারা ছড়ালো হৃদয়ে আমার।
সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি
বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে।"

'তিতাস' ঃ "বাংলা দেশের কবিতা" ঃ সম্পাদনা দাউদ হায়দার

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ যিনি কিম্বদন্তীর জগতে পূর্ব পুরুষের কাহিনীর সন্ধান করেন যে পূর্বপুরুষ কর্ষণের কথা বলতেন, পরিচ্ছন্ন বীজ বপনের কথা বলতেন, সবৎসা গাভীর মতো দুগ্ধবতী শস্যের পরিচর্যার কথা বলতেন। তার কারণ তিনি জানতেন আমাদের রক্তের গভীরে মাটির অতল তলে আমাদের অস্তিত্বের আমাদের শিকড়ের সন্ধান করতে হবে। সেখানেই লোকসংস্কৃতির প্রকৃত ক্ষেত্রভূমি। তাই কবির চিন্তায় মা-মাটি-ঘাস-ফুল-শালিখ পাখী-শেফালী ফুল, মায়ের খয়েরী শাড়ীতে হলুদের

ছোপ সব একাকার হয়ে গেছে। আবু জাফরের 'মা তুমি' কবিতায় মাটির গভীরে মূলের অনুসন্ধানে কবির অন্বেষণ ঃ

॥ এক ॥

মা তুমি
সোঁদা গন্ধ মাটি
মাটি ফলবতী
মা তুমি
আমাকে এনেছ।
মা তুমি
কোলে সাজিয়েছ
সহোদর ঘাস ঘাসফুল
মা তুমি
আমাকে ভুলেছ।

॥ দুই ॥

মা কি শালিখ পাখী?
খয়েরী শাড়ীতে তাঁর
হলুদের ছোপ
তারপর একদিন তিনি
শুভ্র কাফন পরে
শেফালীর ফুল।

'মা তুমি' ঃ "বাংলা দেশের কবিতা" মহফিল হক্ সম্পাদিত

কবি আসাদ চৌধুরী একটি লৌকিক ছড়ার মধ্যে একটি স্বীকারোক্তির সম্মুখীন হয়েছেন, যেখানে তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছে লোকায়ত জীবন চেতনার মাঝখানে ঘাস বনস্পতি ভরা মাটিতে আমাদের শিকড় সন্ধান। ছড়াটি এই ঃ

তোদের হলুদ মাখা গা
তোরা রথ দেখতে যা
আমরা হলুদ কোথায় পাব?
আমরা উল্টোরথে যাব।

এই ছড়ার সূত্রেই কবি আমাদের লোকায়ত জীবন চেতনার মূল কেন্দ্রে পেঁৗছে গিয়ে সন্ধান করছেন আমাদের মাটির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক আমাদের শিকড়ের সন্ধান ঃ

বটের মূলে করুণ গাঁথা স্মৃতির গীতি
প্রাচ্য দেশের অন্তরঙ্গ আহ্বান যেন
ফলবতী গাছের মত বিনয়নত
দলামথা সহিষ্ণু ঘাস
সার্বজনীন সূর্য কিরণ, জলের প্রপাত

রোগের গতি ···বনস্পতি ··
আশৈশব সে ভ্রান্ত বৃক্ষ, যাহার গোড়ায়

'স্বীকারোক্তি'—ঐ

বটের মূলে করুণ গাঁথা স্মৃতির গীত, দলমথা সহিষ্ণুঘাস বনস্পতি কবিকে ডাক দেয় সেই চেনা জায়গায়—আমাদের লোকায়ত গ্রামীণ জীবনের আশৈশব লীলাময় ক্ষেত্রে। তাই আশরাফ সিদ্দিকীর কবিমন যত দূরেই থাক না কেন দু-পাশের সেই চির চেনা মাঠ-প্রান্তর ও নদী, পথের প্রতিটি ধূলিকনা, তৃণ লতাগাছ আর পাখ-পাখালী কবির নাম ধরে ডাকে, বলে কেমন আছ ; বড় দেরীতে এলে, তোমার বাবা-মা, দাদা-দাদীদের কত যত্নে শুইয়ে রেখেছি 'মা-টির মত মাটির বুকে'। বাতাসে পাতার মর্মরে সেই যে চির আহ্বান। তাই কবির কলম দিয়ে উৎসারিত হয়েছে লোকায়ত জীবন চর্যার বাংলাদেশের লোকজীবনের চিরকালীন কথা—

"আমি কথা বলেছি ওদের সাথে
এরা পূর্ব পুরুষদের মত কাজ চায়
আনন্দের উপকরণ চায়—খেলা-ধূলা চায়—
জারি-সারি কবি-কথকতা পাঁচালীর আসর চায়
খাঁটি দুধের স্বাদ চায়,
সর্বোপরি সর্ব উন্নয়নে শরীফ হতে চায়
কিন্তু আমি কি বলতে পারি কি দিতে পারি
এ দায়িত্ব তো একা আমার নয়।"

'যতদূর যাই' : "ঝড় তুফান"

—আসলে জীবন তো একটি ধারা ও প্রবাহ। পূর্বপুরুষের মধ্য দিয়ে মাটি আকাশ ঘাস বনস্পতি নদী জল সব কিছুর মধ্য দিয়ে তা প্রবাহিত হয়ে চলে। সারি-জারি-কবির কথকতা-পাঁচালীর আসর থেকে আরম্ভ করে খাঁটি দুধের স্বাদ নিয়েই এই লোকায়ত জীবনধারা। তাই মাহমুদের কবিতায় যিনি বলেন—আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকারের পাখী বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে। তিনিই তো 'তিতাস' নামক শৈশবের নদীকে মায়াবী নদীর মতো নিয়ে চলে যেতে পারেন অলৌকিক যৌবনের দেশে। তিনি সত্যিকারের পাখীর সবুজ অরণ্যের এক চন্দনের ডালে বসে ভারতবর্ষে এক বর্ণময় লোকায়ত জীবন—মাঠ, সবুজ শস্য, বীজধান, গাভী-বাছুর নিয়ে সুখী গৃহকোণে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষকে দেখতে পান এবং তার এক মনোরম চালচিত্র আঁকেন—

এই গাঁয়ে আছে এক গো-পালক, সদাহাস্য চাষী
ধনিয় কিষাণ বলে ডাকে লোকে, গোপী তার নারী
বহু পুত্রে ফলবতী মনোরমা পরিতৃপ্ত মাতা—
গাভী ও বাছুর নিয়ে সুখী পুত্রগণ, জানে শুধু

বৃষ্টির বিলাপ মানে ধরণীর কামের ক্রন্দন।
তাই বীজ বুনে যায়—ডেকে আনে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ
সবুজ চামড়া-অলা ঘায়ে ভরা উপমহাদেশে।

'ভারতবর্ষ' ঃ "বাংলাদেশের কবিতা"

—তাই কবি ভারতবর্ষের লোকায়ত ঐতিহ্যের এই চিরায়ত প্রবাহকে অনুভব করেন, চক্রাকারে আত্মার গভীরে, মাটির অভ্যন্তরে শিকড়ে-শিকড়ে। কারণ তাঁর কাছে রূপান্তর হচ্ছে মূল থেকে মূলে ফিরে আসা, লোকায়ত জীবন থেকে বারবার লোকায়ত জীবনের চক্রাকারে শুধু ঘোরা-ফেরা। তাই কবি একটি মহা লোকায়ত দর্শনের উপলব্ধিতে উপনীত হয়ে বলে ওঠেন—

"দিব্য চোখে চেয়ে থাকি, জন্মাবর্ত ঘোরে চক্রাকার
এক গর্ত থেকে জল অন্য গর্তে যেভাবে গড়ায়
তেমনি মাংসের দেনা শুষে নেয় নির্বিকার মাটি।
আমি শুধু চেয়ে থাকি আর বলি, বৃষ্টি হোক তবে।"

'ভারতবর্ষ'— ঐ

তাই তিনি 'সোনালী কাবিন' কবিতায় বলছেন—

"তোমার টিকুলি হয়ে হৃদপিন্ড নড়ে দুরু দুরু
মঙ্গলকুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী
উঠোনে বিন্নীর খই, বিছানায় আতর অগুরু।
শুভ এই ধানদূর্বা শিরোধার্য করে মহিয়সী"

বাংলাদেশের কবিতা

আমরা যতই মঙ্গল-গোলায় ধান ধরে রাখি, উঠানে বিন্নীর খৈ, বিছানায় আতর অগুরু—একথা কিন্তু সত্য যে আমাদের লোকায়ত জীবন মানেই হচ্ছে দুঃখের জীবন—যে দুঃখ হয়তো সব সময়ে বেদনাময় না-ও হতে পারে, হয়তো এ-দুঃখ আমাদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম বলেই কবি সামসুর রহমান বলেন, আমার বারাণ্ডার ঘরের চৌ-কাঠে কড়িকাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে দুঃখ তার লেখে নাম। কিন্তু কবি আবার যখন বলেন—

"পায়ে-পায়ে ঘোরা পুষি বেড়ালের মসৃণ শরীরে
ছাগলের খুঁটি আর স্বপ্নের জোনাকিদের ভিড়ে
বৃষ্টি ভেজা নিভন্ত উনুনে আর পুরানো বাড়ির
রাত্রি মাখা গন্ধে আর উপোসী হাঁড়ির
শূন্যতায় দুঃখ তার লেখে নাম।"

'দুঃখ' ঃ বাংলা দেশের কবিতা ঃ মহফিল হক সম্পাদিত

কবি জিল্লুর রহমন সিদ্দিকী রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে এই দুঃখের মাঝে হয়তো

এই সান্ত্বনাই চেয়েছিলেন— আমার সান্ত্বনা এই, তুমি আছ বাঙ্গালীর ঘরে/ আছো তার দুঃখ শোকে। আছো তার আনন্দে-মিলনে। —এই আনন্দ মিলন নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকা। তাই জসীমুদ্দীনের কবিতায় সেই লোকায়ত বাংলা—

কৃষাণী কি বসি সাঁঝের বেলায়
মিহি চাল ঝাড়ে মেঘের কুলায়,
ফাগের মতন কুড়া উড়ে যায়
আলোক ধারে,
কচি ঘাসে তারা জড়াজড়ি করে
গাঙের পারে।

উজানীর চর

জলীর বিলে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন একদিকে লোকায়ত বাংলার জলা জমির প্রকৃতিকে অন্যদিকে লৌকিক কিম্বদন্তীর গল্প কাহিনীকে—

"এই খানেতে এসে তারা পথ হারিয়ে হায়,
জলীর বিলে ঘুমিয়ে আছে জল কুমুদীর গায়।
কেই বা জানে হয়ত তাদের মাল্য হতেই খসি,
শাপলা-লতা মেলছে পরাগ জলের উপর বসি।"

নক্সী কাঁথার মাঠ

কবি জিয়া হায়দার লোকায়ত জীবনের সন্ধানে চলে গেছেন চর্যাপদের ডোমনী, যোগিনীদের লৌকিক ক্রিয়াকান্ড আচারের জগতে। নির্বাণ গাঁথায় হাজার বছর আগেকার লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের এক মায়াময় পরিবেশকে এক অসাধারণ ধ্রুপদী বাংলায় এঁকে দিয়েছেন তাঁর 'নির্বাণ গাঁথা' কবিতায়—

"দশমী দুয়োরে তুই যতোই রাখিস ছাপ উলঙ্গ বাহুর,
কিংবা তুই চিক্কন বাকলে ডোমনী বাঁধিস বারুণী
থুতনি কেটে বেয়াড়া বুকের দলা পাকাস,
অথবা
নিজেই চটকাস শুধু আনতে কাপালিকে,
চৌষট ঘড়ার মদ, তোর বিনা-কড়িতেই লোভনীয় স্নেহ
গ্রাহকের পদদ্বয় নিষ্ক্রমণে তবু সে উৎসাহী।"

'বাংলাদেশের কবিতা' সঃ দাঃ হায়দার

লখিন্দরের লোকায়ত কাব্যকাহিনীর প্রতীকে প্রেম ও জীবনের আস্বাদ খুঁজেছেন—

"কোনো শব্দ নেই, কোনো ধ্বনি ;
কেমন নিঃসাড় যেন পৃথিবীর নাটমঞ্চ বত,
বেহুলা, আমার প্রেম, কথা বলো, প্রেম ;

কোনো ধ্বনি, শব্দের অস্ফুট উচ্চারণে
হীরের ছুরির মতো কেটে দাও এই
ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ; প্রেম আনো আমাদের প্রথম রাত্রিতে।"

'লখিন্দর' ঃ " বাঃ দেঃ কবিতা" ঃ দাযুদ হায়দার

দেবী দুর্গার প্রতীকে লোকায়ত বাংলার রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। জিজ্ঞাসা করেছেন দেবী দুর্গাকে অর্থাৎ লোকায়ত বাংলাকে কি থাকে তোমার যদি বাংলার মাটি জলে বোনা / সোনার প্রতিমা থেকে গত শরতের খড়গুলি / ক্রমান্বয়ে খুলে ফেলি তবে ?

রূপহীন ঐশ্বর্যহীন বাংলাদেশ যদি ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণুতার পথে অগ্রসর হয়, তার মাঠ-ভরা ফসল, শিল্পের সম্ভার যদি বিনষ্ট হয় তাহলে তার মহা ঐশ্বর্যশালিনী শক্তি রূপিনী দেবী দুর্গার অঙ্গ থেকে সবকিছু খুলে নেওয়া, আশপাশ থেকে সব কিছু নেড়ে নেওয়া—একেবারে রিক্ততার শেষ পর্যায়ে যাওয়ার মতো হবে। তাই কবির প্রশ্ন—

"তোমার উড়ন্ত পদতল যদি না মৃত্তিকা পায় কোনো,
কোথায় দাঁড়াবে তবে ? কুমার কার্তিক যদি শরক্ষেপে
শুধু ব্যর্থ হয়, যদি ব্যর্থ গণেশের লোকশ্রুত মেধার মাধুরী
যদি শূন্য লক্ষ্মীভাণ্ড সম্পদবিহীন ফাঁকা পড়ে থাকে,
যদি শুভ্র বসনা দেবী বীণাপাণি গান ভুলে যান
কী থাকে তোমার তবে, দুর্গা ?"

'বিসর্জনের আগে দুর্গার প্রতি'

কবি ফররুখ আহমদ ময়নামতী মাঠে লোকায়ত জীবনের প্রতীক সন্ধান করেছেন। অঘ্রাণে হিমের রাতে, কাক-জ্যোৎস্নার সাদা কাফনে শরীর ঢেকে রেখে শান্ত সেই মুসাফিরকে সন্ধান করেছেন কবি ময়নামতীর মাঠে। কবির ভাষায়—

"রাতের দু'চোখে ঝরে শবনান অশ্রুকণা তার,
পাশ দিয়ে বয়ে যায়, মধুমতী নদী এঁকে বেঁকে
বয়ে যায় বহু দূরে, যায়না স্মৃতির চিহ্ন রেখে ;
যে পথ এসেছে ফেলে তাকায় না সেই পথে আর।"

'ময়নামতীর মাঠে'— ঐ

শিলাই দহের সন্ধ্যায় কবি মযহারুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধান করেছেন লোকায়ত বাংলার নিসর্গ প্রকৃতিতে—

"পুকুরের পারগুলো ঢেকে গেছে কালো শৈবালে
ঘাটগুলো ছেয়ে গেছে কাটালতায় বাহুর আড়ালে
আমবনে একটানা ঘুঘুদের হিমশান্ত ডাক
ঝাউ শাখে বাসা বাঁধে খরচঞ্চু দাঁড়কাক।"

'শিলাইদহে সন্ধ্যা' বাংলাদেশের কবিতা

কবি এখানে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবির কাছে। যেখানে সন্ধ্যা নেমেছে শিলাইদহের আশে পাশে, যেখানে বুনো মশকের গানে সব কথা সুরে হয়ে ঘাসে ঘাসে বাজছে, সেখানে তাঁর প্রার্থনা, হিংসার বহ্নিশিখা এ মাটিতে আর জ্বালাবোনা। ফরহাদ মজহার তাঁর মাতৃভাষা / মাতৃভূমি কবিতায় লোকায়ত বাংলার মাটি-মাতৃত্ব এবং মাতৃভাষার জন্যে যে সংগ্রাম তাকে সেলাম জানালেন লোকায়ত বাংলার প্রতীকে –

"কেউ কি এমন রক্ত ঢালে! রেখো মা এই দাসেরে মনে,
তোমার পদ্ম ফুটুক এবং আমায় পরিপার্শ্বে রাখো
আম্মা আমার আম্মা-আপা আম্মাময়ী প্রিয়তমা
তোমার পতিত জমি এবার আবাদ করবো ফলবে সোনা।"

'মাতৃভাষা / মাতৃভূমি' "বাংলাদেশের কবিতা"

—মানুষ তখনই রক্ত ঢালতে পারে যখনই সে মনে করে এ দেশ আমার, এ মাটি আমার, এই মাটিতেই আমার জীবন শিকড় গাঁথে। তাইতো আমরা রক্ত ঢালি, পদ্ম ফোটাই, স্বপ্ন দেখি পতিত জমি করবো আবাদ ফলবে সোনা। তাই কবি বেলাল চৌধুরী এই উপলব্ধির কথাটিই আমাদের জানিয়ে দেন – আমি আছি ব্যস্ত হয়ে তোমার রৌদ্র ছায়ায় / এইতো তোমার ঘামের গন্ধে তোমার পাশাপাশি / তোমার ছায়ার মতো তোমার শরীর জুড়ে / তোমার নদীর কুলুকুলু স্রোতে। - কারণ কবি জানেন যে আমাদের প্রতিটি সত্তা আমার দেশের আলো-বাতাস, নদ-নদী, আকাশ-নক্ষত্র, সব কিছুর সঙ্গেই তা যুক্ত। তাই কবি বলেন – তোমার যেমন ইচ্ছে, আছি আমি-/ ঝিরি ঝিরি পাতার ভেতর ভেতর হাওয়া নাচে / রাত্রি দিন তোমার ধানের ক্ষেতে / উদাসী বাউল ; ভাঁটিয়ালী গান ভেসে / যায় কোন নিরুদ্দেশে। —কবি বলেন আমরা প্রতিটি মানুষই লোকায়ত প্রকৃতির সঙ্গে এই ভাবেই যুক্ত—তার কারণ আমার শিকড় আছে মাটির গভীরে। তাইতো কবি বলে ওঠেন—

"আছি আমি তোমার ধানের দুধে
তোমার আঁচল ছোঁয়া নীলাম্বরি মেঘে
আছি আমি এই তো তোমার
নাক ছবিটির মুক্তো যেমন
জ্বলছে কেবল জ্বলছে কেবল।"

'স্বদেশ ঃ "বাংলা দেশের কবিতা"

—বর্তমানে কবি এইসব গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে দেখেছেন যে সে স্বপ্নের বাংলাদেশ আজ আর নেই। কেবল ভাঁট ফুল আর আকন্দের ঝোপঝাপ আর মাছ রাঙাদের অকারণ খিটিমিটি। গ্রামীণ ছবিতে তিনি আর দেখতে পাননি সেই কিম্বদন্তী খ্যাত মসলিন আর নক্সী-কাঁথার দিন। তাঁর কাছে আজ গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ এ-জাতীয় কথা স্রেফ্ কথার কথামালা। চারিদিকে লিক্‌লিকে

সরু পা আর রোগা-কাঠাম আর ডিগডিগে পেট মানুষের চোখে-মুখে ঘোলাটে নির্বোধ শূন্যতা। তাঁর বর্ণনায় আজকের লোকায়ত বাংলা—

"বরং দেখলুম বাঁশের খুটিতে আড়াআড়ি টানা
দড়ির ওপর শুকোতে দেওয়া ঝুলন্ত জালের গায়ে
লেগে থাকা মৃত কিছু মাছের সাদা পেট, আঁশ ;—
তার অন্য পাশে ছিল পথের লাগোয়া একটি প্রাচীন মসজিদ
আগাছা শ্যাওলা ও খরখরে গন্ধের জরাজীর্ণ
দেওয়ালের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা অশ্বত্থের একটি ডাগর চারা।"

'আত্ম প্রতিকৃতি'— ঐ

তাই কবি মহাদেব সাহা জিজ্ঞাসা করেছেন এই বাংলার প্রেক্ষাপটে—আমি আর কত নতজানু হবো দাঁতে ছোঁবো মাটি ! / আমার জনক সেকি জনম থেকে নিয়েছেন এই ভিক্ষা এই শিশু পালনের ব্রত। —তাই কবি সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন আকাশের দিকে মুখ তুলে, কারণ এ মাটি আমার মাটি, এ দেশ আমার দেশ—তাই কবির বিস্ময়বোধ আর জনম জিজ্ঞাসা

"আমি তাই জনম নতজানু, নতমুখ
মাথাতুলে বুক খাড়া করে কোনদিন দাঁড়ানো হলো না
বুক ভাঙা বাঁকানো কোমর আমি নতজানু লোক
কতো আর নতজানু হবো কতো দাঁতে ছোঁবো মাটি।"

'কতো নতজানু হবো, দাঁতে ছোঁবো মাটি' : ঐ

তাই কবি শামসুর রহমান স্বাধীনতাকে চেয়েছেন রবিঠাকুরের অজর কবিতা ও অবিনাশী গানের মধ্যে, কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরী দোলানো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা মত্ত বিদ্রোহে। আবার স্বাধীনতাকে তিনি দেখেছেন—স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি / স্বাধীনতা তুমি মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী। তারপরে তিনি চলে যান সেই লোকায়ত জীবনে—স্বাধীনতা তুমি উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ীর কাঁপন / স্বাধীনতা তুমি বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।